১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৯ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

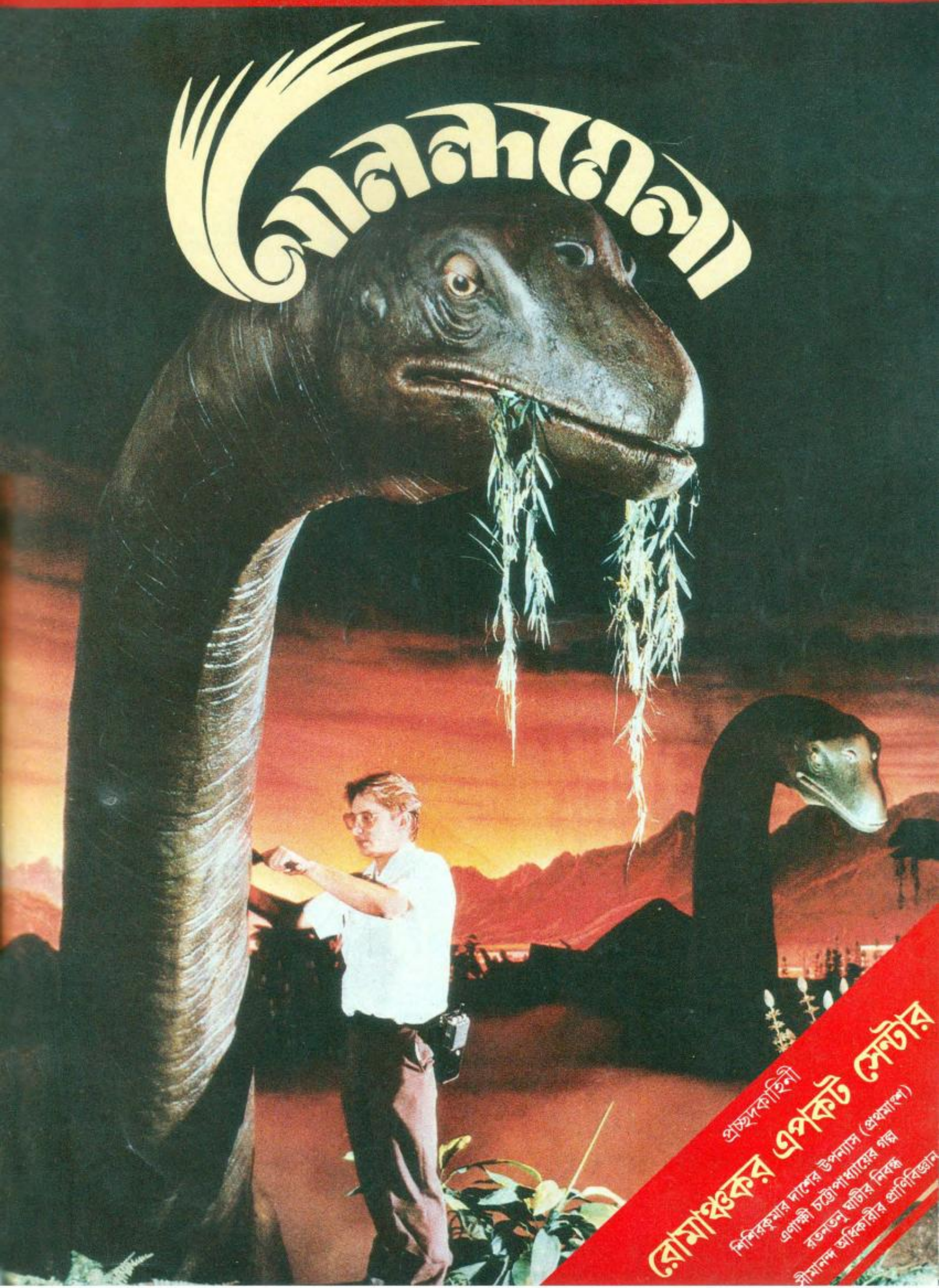

প্রচ্ছদকাহিনী

রোমাঞ্চকর এপকট সেন্টার

শিশিরকুমার দাশের উপন্যাস (প্রথমাংশ)
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের গল্প
রতনতনু ঘাটীর নিবন্ধ
সীমানন্দ অধিকারীর প্রাণিবিজ্ঞান

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বুকলাভার

স্ক্যান করেছেন - বুকলাভার

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

আপনার রঙরূপের বয়েস কি আপনার
আসল বয়েসের চেয়েও বেশী দেখাচ্ছে?
আপনার রঙরূপের জৌলুষ কাল কেমন থাকবে, তা নির্ভর করে, আজ আপনি তার কিভাবে দেখাশোনা করছেন, তার ওপর। কারণ, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে, ত্বকের আর্দ্রতা কমে যেতে থাকে—তাই, দরকার, জনসন্স বেবী লোশন-এর ময়েশ্চারাইজিং-এর গুণ।
এ পাবেন আপনার বেছে নেওয়ার মত দুটি ফর্মুলেশনে—লোশনটি ত্বকের গভীরে ঢুকে কাজ করে, আর এর বিশেষ ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বকে পুষ্টি যোগায়—আর, আপনার ত্বক অপূর্ব কোমল ও তরতাজা ক'রে রাখে, ফলে আপনার রঙরূপেও যেন চির-বসন্তের ছোঁওয়া লাগে!
রেগুলার
শুষ্ক ত্বকের জন্যে এক বিশেষ ময়েশ্চারাইজারযুক্ত উপাদানের মিশ্রণ
REGULAR FORMUL
Johnson's baby lotion
LOW OIL FORMULA
Johnson's baby lotion
Johnson & Johnson
লো অয়েল
তেলতেলে ত্বকের জন্যে হাল্কা, সূক্ষ্ম ফর্মুলা
জনসন্স বেবী লোশন
কারণ, নরম ও মোলায়েম ত্বক আপনার বয়স গোপন রাখে।
জনসন অ্যান্ড জনসন
OBM/4573 BEN

দেখো যাক্ কত বুদ্ধিমান তুমি...

এক কৌতুক-অভিনেতা মুখে মজার হাসি ফুটিয়ে, চাকরীর সন্ধানে এক হোটেলে গেলেন।

হোটেল ম্যানেজার ছিলেন বোবা, কমেডিয়ান্‌দের তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন না।

তাঁর টেবিলের উপর ১৫টী ক্যামলিন পেন্সিল সাজিয়ে HOTEL শব্দটী লেখা ছিল।

যখন কৌতুক-অভিনেতা তাঁকে চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ম্যানেজার শুধু ঐ পেন্সিলগুলির মধ্যে থেকে ৩টী পেন্সিল সরিয়ে দিয়ে, অন্যভাবে সাজিয়ে দিলেন আর তাইতেই তাঁর জবাব পাওয়া গেল।

অভিনেতাকে আর কোনও কারণ জিজ্ঞাসা করবার দরকার পড়ল না।

শুধু সেই কৌতুক-হাসি মিটিয়ে তিনি বিষণ্নমুখে ফিরে চলে গেলেন...

ম্যানেজার কি জবাব দিয়েছিলেন — সেটা এবার আন্দাজ কর দেখি!

(যদি হাতের কাছে ১৫টী ক্যামলিন পেন্সিল না থাকে, তাহলে, তার বদলে ১৫টী দেশলাই কাঠি ব্যবহার করা যায়)।

ক্যামলিন ফ্লোরা পেন্সিলস্

বুদ্ধিমান শিশুদের জন্যে

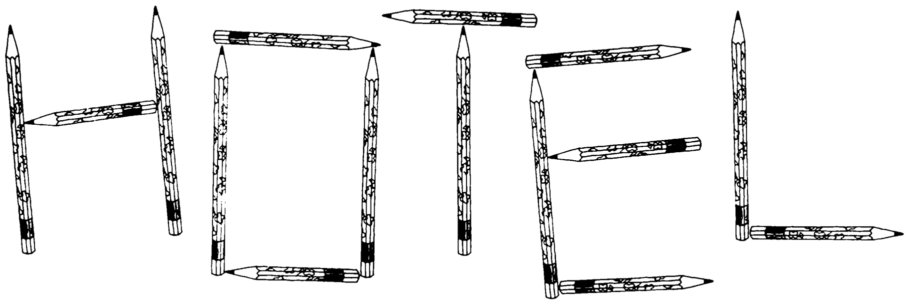

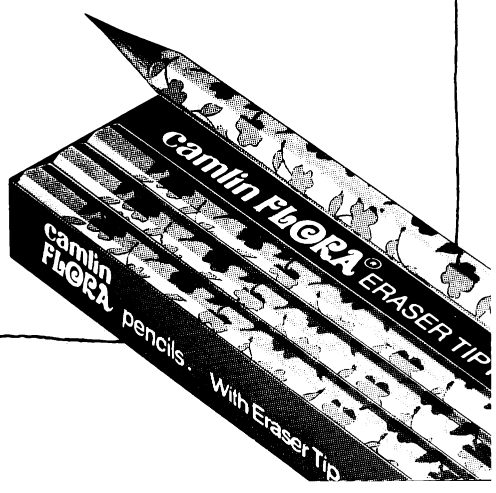

উত্তর : জবাব হ'ল NOT FIT — আর এই শব্দদুটি তুমি কেবল ৩টী পেন্সিল অন্যভাবে সাজিয়ে লিখে দিতে পার ! চেষ্টা করে দেখো।

সূচীপত্র ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ □ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৯ □ ১৫ বর্ষ ১৭ সংখ্যা

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

আর্গোস শিশিরকুমার দাশ ৭০

গল্প

অনসূয়া এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ৩৬
দেবপুত্র কণিষ্কের কথা চিত্রা দেব ৬০

প্রচ্ছদকাহিনী

রোমাঞ্চকর এপকট সেন্টার সন্তোষকুমার দে ১৩

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ২৭

দেশ কাল সংস্কৃতি

সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে রতনতনু ঘাটী ১১

কমিকস

টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৬৩, গাবলু ৬৯, টিনটিন ৮৭, ব্যাটম্যান ৮৯

কবিতা

অন্ধকারের নদী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭
শীতের বুড়ির ছেঁড়া কাঁথা পরেশ সরকার ৭

বিজ্ঞানবিচিত্রা

দাঁত দিয়ে যায় চেনা সীমানন্দ অধিকারী ২২
জোনাকিগাছ কল্যাণকুমার দে ৩২
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে অনুসন্ধানী ৩৫
বিজ্ঞানে নোবেল : ১৯৮৯ বিমল বসু ৫৫
হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড চঞ্চল পাল ৫৮

বিদ্যালয়-পরিচিতি

কাঁথি হাই স্কুল গৌতম ঘোষদস্তিদার ৮৪

কেরিয়ার গাইড

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা··· অমর দাশ ৬৫

খেলাধুলো

উষার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী···রূপক সাহা ৪১
গ্যালারি থেকে দর্শক ৪২
আমি বুলা চৌধুরী ৪৩
কপিল এখন যা করবেন··· অরূপ রায় ৪৪
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৬
খেলার খবর ৪৭, ক্রিকেটের প্রশ্নোত্তর ৪৮, কথায়-কথায় ৪৮ সলিল আঙ্কোলা ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, শব্দসন্ধান ৩৯, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫৩, ডাকটিকিট ৫৭, নিজের হাতে বানাও ৬৮, আকাশে ওড়ার কথা ৮০, হাতে-কলমে ৮২, চেনা না-চেনা ৯১, কুইজ ৯৩, নানারকম ৯৬, বইয়ের খবর ৯৮

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত

২২

হাতির দাঁতের মূল্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছে। রাজা সলোমানের হাতির দাঁতের সিংহাসন, মিশরে ঘরের মেঝে তৈরির জন্য আইভরির ব্যবহার,

১৩

দু-দুটি ডিজনিল্যান্ড তৈরি করবার পরেও ওয়াল্ট ডিজনির উৎসাহে ভাটা পড়েনি। বরং তিনি চাইছিলেন নতুন একটি কেন্দ্র স্থাপন করে আরও বড় আকারের আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে সবাইকে মানবসভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে। ডিজনি সারা জীবন যা ভেবেছিলেন, য করেছিলেন তার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে এপকট সেন্টারে। ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে তেতাল্লিশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে পড়ে থাকা বনজঙ্গল আর জলাভূমি তিনি বেছে নিয়েছিলেন। সেখানেই গড়ে তুলেছিলেন এপকট সেন্টার, যা দেখে মুগ্ধ হয়েছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও

আসিরীয় রাজত্বে হাতির দাঁতের ওপর খোদাই-করা কারুকার্য এই সত্যকে প্রমাণ করে। হাতির দাঁত নিয়ে এই ধরনের শিল্পকর্ম করার জন্য এতদিন নির্বিচারে হাতি মারা হত। এখন মানুষ কিছুটা সচেতন হয়েছে।

৫৫

রসায়নশাস্ত্রে ১৯৮৯ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আমেরিকার দুই বিজ্ঞানী। আমেরিকার আরও দুই বিজ্ঞানী পেয়েছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল। পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন মার্কিন ও জার্মান দুই বিজ্ঞানী। এঁদের গবেষণার বিষয়ে একটি নিবন্ধ।

৭০

ছোট্ট কুকুরটির নাম আর্গোস। তাকে নিয়েই শিশিরকুমার দাশের উপন্যাস। এই সংখ্যায় উপন্যাসের প্রথমাংশ প্রকাশিত হল।

৪১

অ্যাথলিট পি টি উষা একক কৃতিত্বে ভারতকে প্রচুর পদক এনে দিয়েছেন। তাঁকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলার মতো মহিলা অ্যাথলিট সারা এশিয়ায় প্রায় নেই বললেই চলে। এশিয়ার কারা উষাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে আলোচনা করা হল একটি নিবন্ধে।

আগামী সংখ্যায়

সিদ্ধার্থ ঘোষ ও সমীর সাহার
ছবিতে মহাকাশ অভিযান

শিশিরকুমার দাশের সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
আর্গোস

দেবব্রত মৈত্রর গল্প
প্রতিবন্ধী হরিণ

মহাকাশ নিয়ে সিদ্ধার্থ ঘোষের মজার খেলা
কাউন্টডাউন

২৬ জুলাই 'আনন্দমেলা কুইজ প্রতিযোগিতা'র ফল

Disproportionate Returns for
SMALL INVESTMENTS
&
What more &
Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:
1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?
ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

বিষয়-বৈচিত্র্যে এবারের পূজাবার্ষিকী অসাধারণ

গত কয়েক বছর ধরে আমি 'আনন্দমেলা'র সব সংখ্যাই পড়ছি। এবারের পূজাবার্ষিকী পড়লাম। এবারে আমি আরও কয়েকটি কিশোর পুজোস'খ্যাও পড়লাম। এর মধ্যে আনন্দমেলাই সব সেরা পূজাবার্ষিকী। যেমন বিশাল আয়তন তেমনই রংচঙে, বিষয়-বৈচিত্র্যেও অসাধারণ। এবার আবার বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দাদের উদয় হয়েছে। প্রত্যেকবার যেন এই

গোয়েন্দাদের পুজোসংখ্যায় পাই। সাতটি উপন্যাসের মধ্যে দুটি উপন্যাস অসাধারণ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বনি' এবং বিমল করের 'শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ ও কিকিরা'। গত বছরের মতো এবারেও এরকম অসাধারণ একটি উপন্যাস উপহার দেওয়ার জন্য বিমল করকে ধন্যবাদ। গল্পগুলির মধ্যে 'থর মরুর রহস্য-ঝিল', 'মুশকিল আসানের কলকাঠি,' 'চারাগাছ'— দারুণ। প্রায় সবক'টি গল্পই সমান মনোগ্রাহী। জেমস বন্ডের কমিকস রঙিন হলে ভাল হত।

শুভেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
হরিনাভি, ২৪ পরগনা

এবারের পূজাবার্ষিকী 'আনন্দমেলা'র সঙ্গে অন্য কোনও কিশোর পূজাবার্ষিকীর তুলনা চলে না। আমাদের কোনও চাহিদাই আনন্দমেলা অপূর্ণ রাখেনি। সত্যজিৎ রায় তাঁর শ্রেষ্ঠ শঙ্কুকাহিনী উপহার দিয়েছেন। কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'বনি' ও কঠোর সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে লেখা

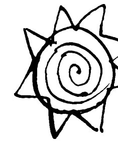

শৈলেন ঘোষের 'নতুন দিনের নায়ক' দারুণ ভাল লেগেছে। যাই হোক, খেলোয়াড়দের সাতটি রঙিন ছবির অ্যালবাম পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। অন্য বিষয়গুলিতেও সমান ভাল লাগার পরিচয় রয়েছে এবারের আনন্দমেলায়।

নীরাজনা ঘোষ
লেকটাউন, কলকাতা-৪৮

আমি পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ছি। এবারের পূজাবার্ষিকীতে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পাণ্ডবগোয়েন্দা', সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কুকাহিনী' 'ডন ক্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যদ্বাণী', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু ও বজ্রলামা' এবং ভ্রমণকাহিনী দুটি পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। এত বড় পূজাবার্ষিকীর

তুলায় ভ্রমণকাহিনী আপনারা খুব কম দিয়েছেন। ভবিষ্যতে ভ্রমণকাহিনীর জন্য আরও কিছুটা জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

জয়দীপ সরকার
মোকো, ধানবাদ

আমি নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ছি পাঁচ বছর। এবার পূজাবার্ষিকীতে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটি পড়ে মনে কৌতূহল জেগেছে যে, 'ভারতভূমি' কবিতাটি কার লেখা? আমি অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের একটি লেখা পড়েছি, 'ভারতভূমি কবিতা রবীন্দ্রনাথের নয়, জ্যোতিশচন্দ্রের', তাতে বেশ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, ভারতভূমি জ্যোতিশচন্দ্রের লেখা। কিন্তু পূর্ণানন্দবাবুর 'বালক রবির হারিয়ে যাওয়া অমুদ্রিত কবিতা' লেখাটিতে পূর্ণানন্দবাবু প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন যে,ওই

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। তা হলে প্রকৃতপক্ষে ওই কবিতাটি কার লেখা?

শুভ্রজ্যোতি দলুই
চিন্তামণি দে রোড, হাওড়া-১

লেখকের উত্তর : পূজাবার্ষিকী 'আনন্দমেলা'য় আমার 'বালক রবির হারিয়ে যাওয়া অমুদ্রিত কবিতা' শীর্ষক রচনায় 'ভারতভূমি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ-রচিত— এই তথ্য ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড এবং প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী' প্রথম খণ্ড থেকে সংগ্রহ করেছি। এ-প্রসঙ্গে অন্য একটি তথ্যও আছে। 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়'-এর লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নয়— বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।

এবারের পূজাসংখ্যা 'আনন্দমেলা' খুব ভাল হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ই চিত্তাকর্ষক। ছড়া, মজা, কুইজ ও শব্দসন্ধান এক কথায় দারুণ। শঙ্কুকাহিনী বিস্ময়কর। প্রতিটি গল্পই মন জয় করে নিয়েছে। বড়গল্প তিনটি খুব ভাল হয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞান ও খেলাধুলো খুবই আকর্ষক। চিত্রকাহিনী ও ভ্রমণকাহিনী পড়ে ভাল লেগেছে। এবার পূজাবার্ষিকীতে যে সাতটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটি উপন্যাস আমার খুব ভাল লেগেছে। এই পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস 'বনি' আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছে। সত্যি, কল্পবিজ্ঞানের এই আশ্চর্য অসাধারণ প্রতিভাবান লেখক এবারের পূজাসংখ্যায় আমাদের একটি বিস্ময়কর চিত্তবিজয়ী উপন্যাস উপহার দিলেন। সন্দেহ নেই, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আজ কল্পবিজ্ঞান-সাহিত্যের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছেন। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' আমাকে প্রবলভাবে রোমাঞ্চিত করেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেছি।

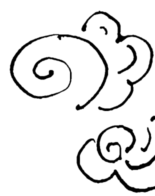

'কাকাবাবু ও বজ্রলামা' খুব ভাল হয়েছে। শৈলেন ঘোষের 'নতুন দিনের নায়ক' ভারী সুন্দর। বিমল করের 'শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ ও কিকিরা' ভাল হয়েছে। দারুণ প্রচ্ছদ আঁকার জন্য বিমল দাসকে আন্তরিক অভিনন্দন।

অভিবর্ষা রায়
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর এবার প্রত্যেকটি উপন্যাসই দুর্দান্ত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু ও বজ্রলামা'র জবাব নেই। পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা সব দিক থেকেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। তবে গোগোল নেই বলে ফাঁকা লাগছে।

শিউলি মজুমদার
কাটোয়া, বর্ধমান

অন্ধকারের নদী

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো আছে দূরের আকাশে
পাতা তার ধারে-কাছে ভাসে
গান গায় বাউলেরা কি ?
ভুল কবি খঞ্জনা পাখি !

নদী আসে পৃথিবীর ঘাসে
ফুল হয়ে ফোটে কাশে কাশে
মেঘ হয়ে ছায়া দেয় ভাল
সাঝে বলি, "মা পিদিম জ্বালো !"

২

গঞ্জের ঘাট থেকে
বাবা হেঁকে কন,
"আঁধারে এভাবে ভয়
পেয়ো না খোকন।"

নৌকোয় সারারাত
উনি দেন পাড়ি,
ওপারে খেয়ার ঘাটে
পাটের ব্যাপারি।

গাঁট গাঁট পাট আসে
লণ্ঠন জ্বেলে
বাবা দেন পার করে
নদী হেসেখেলে।

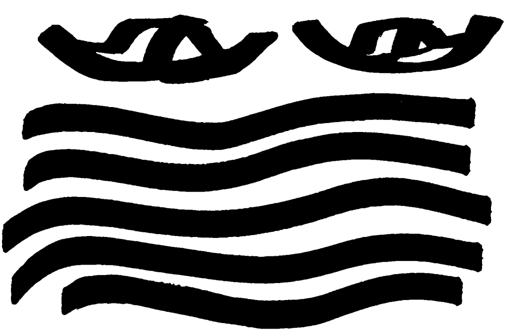

শীতের বুড়ির ছেঁড়া কাঁথা

পরেশ সরকার

শীতের বুড়ির ছেঁড়া কাঁথা সন্ধে হলেই নাকটি ডাকে
ঠাণ্ডা হাওয়া কোন পাহাড়ের জলে বরফ সবাই হাঁকে
খুড়োর বুড়োর ঠক্ ঠকা ঠক্ লেপেও জড়ো কাঁপন কাসি
মাঙ্কি টুপি গায়ে সোয়েটার খোকা-খুকুর মুচকি হাসি।

শীতের ভোরের কুয়াশা চাদর জড়িয়ে গায়ে গাছ-গাছালি
খেজুর রসের মতোই ঝরে শিশির পাতায় ধান-বিচালি
আল্‌সে সূর্য নাচায় আলো মুক্তো যেন দূর্বাঘাসে
আমের মুকুল সজনে ফুল শিমুল পলাশ ফুটেই হাসে।

রক্ত হলুদ রঙের গাঁদা গোলাপ কুঁড়ি পদ্ম ফোটে
খালে বিলের অঢেল শালুক শীতের ছড়া ফোটায় ঠোঁটে
রঙ-বেরঙের প্রজাপতির চলছে মিছিল ফুলের মেলায়
সূর্যমুখীর সরষে ফুলের হলুদ লাগে রঙের খেলায়।

মল্লিকা আর ডালিয়া চাঁপা পেয়েছে সবাই শীতের খবর
সোনালি ধান খামারে জড়ো পোষ-পার্বণ জমছে জবর
পাড়ায় পাড়ায় নবান্ন ভোজ চাষির ঘরে শীতের পিঠে
বাউনি পুজো খুশির মাদল ধুমধাড়াক্কা নলেন মিঠে।

আমলকী গাছ আমড়া ন্যাড়া খসে পড়ে হলুদপাতা
দার্জিলিঙে কাশ্মিরে শীত তুষার ঝালর বরফ ছাতা
খড়ে কুটোয় কুণ্ডলী সেই কান যে খাড়া সজাগ ভুলো
শহর ঘুমোয় লেপ-তোশকে শীতের চোখে দিয়ে ধুলো।

শীতের ভয়েই পোকামাকড় গর্তে ঘুমোয় কুম্ভকরন
আল্‌সে সকাল মিষ্টি দুপুর শীতে ভূতের রাতে মরণ
পোষের শীত সব নগরে মাঘের শীতে পালায় বাঘে
শীতের বুড়ির ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে গায়ে ভালই লাগে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশে ঘনিয়ে এসেছে মেঘ, শনশন করে বইছে বাতাস। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক ঝলক বিদ্যুৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল।

গ্রামের সব লোক ঘর ছেড়ে বাইরে এসে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

একটু আগে তারা যাঁকে ভেবেছিল বনদেবী, তিনি হয়ে গেলেন এ-রাজ্যের মহারানি। আবার সেই মহারানিকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে সৈন্যবাহিনী। এসব কী যে ব্যাপার হচ্ছে, তারা বুঝতেই পারছে না।

কয়েকজন সৈন্যের হাতে দাউ-দাউ করে জ্বলছে মশাল, তারা কিছু-কিছু বাড়িতে আগুন লাগাতে যাচ্ছিল, এখন সেই মশালগুলো তারা ফেলে দিল মাটিতে।

চম্পক সৈন্যদের একটু দূরে সরে যাবার হুকুম দিয়ে এগিয়ে এল তলতাদেবীর কাছে। তারপর বলল, "তোমার জন্য একটা সাদা ঘোড়া এনেছি। তুমি সাদা ঘোড়া পছন্দ করো। এখন আমার সঙ্গে রাজধানীতে চলো।"

তলতাদেবী কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন চম্পকের মুখের দিকে। চম্পক আগে তাঁকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করত, এখন 'তুমি' বলছে। তার মুখে কোনও দুশ্চিন্তার ছাপ নেই, বরং বেশ খুশি-খুশি ভাব।

তলতাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সত্যিই আমায় রাজধানীতে ফিরে যেতে দেবে?"

চম্পক বলল, "অবশ্যই। আমি নিজে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

তলতাদেবী আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, "তুমিও রাজধানীতে যাবে?"

চম্পক কৌতুক করে বলল, "হ্যাঁ। রাজধানী আমাকে ডাকছে!"

তারপর সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "তুমি পালিয়ে গিয়ে আমাদের খুব মুশকিলে ফেলেছিলে। মহারানিকে সঙ্গে না নিয়ে তো রাজধানীতে ফেরা যায় না। অনেক সময় নষ্ট হল। যাই হোক, আর দেরি করা নয়, চলো, এখনই যাত্রা করা যাক।"

তলতাদেবী ঘোড়ায় উঠে বসলেন।

চম্পক তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "এটাও তোমার হাতে রাখো। তুমি তো আর বন্দিনী নও, রাজধানীতে তুমি ঢুকবে বিজয়িনীর বেশে।"

চম্পক নিজের ঘোড়ায় চেপে তলতাদেবীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সৈন্যরা চেঁচিয়ে উঠল, "জয়, মহারাজ চম্পকের জয়! জয় মহারানির — জয়!"

তলতাদেবী মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এর মধ্যেই মহারাজ হয়ে গেছ নাকি?"

চম্পক কৌতুকের সুরে বলল, "সবাই তো তাই বলছে। সেই জন্যই তো রাজধানীতে গিয়ে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছি।"

তলতাদেবী বললেন, "এক দেশে দু'জন মহারাজ কি থাকতে পারে? মহারাজ মহাচূড়ামণির কথা কি তুমি ভুলে গেছ? তিনি হয়তো এখনও ঘুমিয়ে আছেন, কিছুই জানেন না, কিন্তু কোনও একসময় তো জেগে উঠবেন!"

চম্পক বলল, "ওঃ হো, তুমি জানো না? মহাচূড়ামণি আমার নাম শুনেই ভয় পেয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেছে!"

তলতাদেবী ভুরু তুলে বললেন, "তাই নাকি? মহারাজ ভয় পেয়েছেন?"

চম্পক বলল, "শুধু তাই নয়! সে কাপুরুষটা এখন কাকুতি-মিনতি করছে, যাতে তাকে আমি প্রাণে না মারি। ভাবছি, ওকে নিয়ে কী করা যায়!"

তলতাদেবী বললেন, "যুদ্ধ না করেই মহারাজ সিংহাসন ছেড়ে দিলেন?"

চম্পক বলল, "আমি পাহাড়ি সৈন্যদের নিয়ে রাজধানী আক্রমণ

করব শুনেই তো তার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল! চেহারাটাই বিরাট। বুদ্ধি তো কিছু নেই। এবার গিয়ে ওকে দিয়ে আমার পা টেপাব।"

তলতাদেবী চুপ করে গিয়ে দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। মহাচূড়ামণি মহাবীর, বিনা যুদ্ধে তিনি সিংহাসন ছেড়ে দেবেন, এটা বিশ্বাসই করা যায় না। চম্পক এসব বানাচ্ছে। কিন্তু চম্পক কোন্ সাহসে রাজধানীতে যাচ্ছে সঙ্গে এই ক'টা সামান্য সৈন্য নিয়ে? বিদ্রোহের কথা জেনেও মহাচূড়ামণি কেন ছুটে আসেননি এদিকে?

একটু পরে তলতাদেবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তা হলে এ-রাজ্যের মহারাজ হয়েছ! তা হলে তো আমি আর এখানকার মহারানি থাকতে পারি না!"

চম্পক বলল, "কেন থাকবে না? রাজা বদল হলেই যে রানি বদল হবে, তার কি মানে আছে? তোমার মতন রানি কি আর পাওয়া যাবে? এ-রাজ্যের রানি হিসেবে তোমাকেই মানায়। তুমিই হবে আমার রানি!"

তলতাদেবী বললেন, "এসব তুমিই নিজে-নিজে ঠিক করেছ? আমি রাজি হব কি না, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই!"

চম্পক বলল, "তুমি রাজি হবে না কেন? তোমার তো কোনও ক্ষতি হচ্ছে না! তুমি যেমন মহারানি ছিলে তেমনই থাকবে। শুধু তোমার স্বামী বদলে যাবে। ওই হুঁতকো মহাচূড়ামণিটার চেয়ে আমাকে তোমার বেশি পছন্দ হবে না? আমি জানি, তুমি এতে রাজি হবে।"

তলতাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "যদি রাজি না হই?"

চম্পক বলল, "তা হলে অবশ্য তোমার খানিকটা মুশকিল হবে। তুমি রাজি না হলে প্রথমেই মেরে ফেলা হবে তোমার ছেলে দুটিকে। তোমাকে মত বদলাবার জন্য সময় দেওয়া হবে তিন মাস। ততদিন তুমি থাকবে কারাগারের অন্ধকারে। তারপর তুমি যদি আবার রাজি হও...."

তলতাদেবী মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। ক্রোধে তাঁর দু'চোখ জ্বলছে। তবু তিনি ভাবছেন, এখন আর চম্পককে কোনও কথা বলে লাভ নেই। আগে রাজধানীতে পৌঁছনো যাক, তখন জানা যাবে আসলে কী ঘটেছে।

তলতাদেবী আর চম্পকের পেছনে-পেছনে ধুলো উড়িয়ে আসছে পাহাড়ি সৈন্যবাহিনী। এরা ভাল করে যুদ্ধ বিদ্যা শেখেনি, এদের কাছে বেশি অস্ত্র-শস্ত্রও নেই। মহাচূড়ামণির সৈন্যদের সামনে এরা দাঁড়াতেই পারত না। তবু কোন্ সাহসে চম্পক এদের নিয়ে বিদ্রোহ করেছিল?

চম্পক আরও কিছু বলবার চেষ্টা করলেও তলতাদেবী শুনলেন না। চম্পকের দিকে তাকাতেও তাঁর ঘৃণা হচ্ছে।

খানিকবাদে দেখা গেল দূরে রাজধানীর প্রাচীর। সেখানে বহু লোকের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। নগরীর প্রধান সিংহদ্বারটি খোলা। উঁচু একটা বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ, স্থিরভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে। তার গায়ে একটি রেশমের উত্তরীয়

জড়ানো।

চম্পক বলল, "এই দ্যাখো মহারানি। রাজধানীর মানুষ আমাকে রাজা হিসেবে বরণ করার জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে।"

তলতাদেবী কোনও উত্তর দিলেন না।

চম্পক আবার বলল, "আমাদের নামে ওরা জয়ধ্বনি দিচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ?"

তলতাদেবী তবু চুপ করে রইলেন।

চম্পক আবার বলল, "আগেকার রাজা মহাচূড়ামণিকে ওরা বন্দী করেছে!"

তলতাদেবী এবার আর কথা না বলে পারলেন না। মুখ ফিরিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখবর তুমি কোথায় পেলে? মহারাজ মহাচূড়ামণিকে যে বন্দী করা হয়েছে, তা তুমি কী করে জানলে?"

চম্পক বলল, "আজ খুব ভোরেই দূতের মুখে সব সংবাদ পেয়েছি। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা ছিল। আমাকে কি কাঁচা লোক পেয়েছ। আগে থেকে সব ব্যবস্থা পাকা না করে কি আমি এমনি-এমনি রাজধানীতে আসছি! এই যে উঁচু বেদীর ওপর দাঁড়ানো মানুষটিকে কি চিনতে পারছ? উনি হচ্ছেন রাজপুরোহিত ছন্তী। উনি আমাকে চিঠি লিখেছেন, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত রাজধানীতে চলে আসার জন্য। ছন্তী নিজে রাজধানীর সব প্রজাদের সামনে আমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবেন।"

শেষের কথাটা শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না তলতাদেবী, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললে? ছন্তী কী করবেন?"

চম্পক আবার জোর দিয়ে বলল, "ছন্তী নিজে আমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবেন!"

এবার তলতাদেবী অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন। ছন্তী মহাবীর মহাচূড়ামণিকে বন্দী করেছেন, এও কি সম্ভব? মহাচূড়ামণিকে প্রজারা যেমন ভয় করে, তেমন ভালও বাসে। তবে সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু অশুভ ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে। ছন্তী চম্পককে কখনও পছন্দ করতেন না, আজ তিনিই চম্পককে সিংহাসনে বসাতে চান, এ কি সম্ভব?

তলতাদেবী বললেন, "মূর্খ, ছন্তী তোমার মাথায় রাজমুকুট পরাবেন, তুমি এটা বিশ্বাস করেছ?"

চম্পক সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, "ছন্তীর সঙ্গে আমার গোপন চুক্তি হয়ে আছে অনেক আগেই। তোমরা তার কিছুই জানো না। ছন্তীর পরামর্শেই তো আমি বিদ্রোহ করেছি। মহাচূড়ামণি ফাঁদে পড়েছে, এখন আমিই রাজা। ছন্তী আমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবেন, তার বদলে আমি ছন্তীর ভাই দেবককে সেনাপতির পদ দেব। ছন্তীও সারাজীবন থাকবেন মহা সুখে।"

তলতাদেবী বললেন, "মহাচূড়ামণি যদি ধরা পড়ে থাকেন, তা হলে রাজধানীতে আমি এখন কিছুতেই যাব না।"

তিনি ঘোড়ার মুখটা ফিরিয়ে খুব জোরে ছুটিয়ে দিলেন। চম্পক তাঁকে ধরতে গিয়েও কিছুটা গিয়ে ফিরে এল, অন্য কয়েকজন অশ্বারোহী ধেয়ে গেল তলতাদেবীর দিকে।

এদিকে রাজ পুরোহিত ছন্তী সকাল থেকেই দাঁড়িয়ে আছেন চৌরাস্তার মাঝখানে এই উঁচু বেদীটার ওপর। তাঁর পাশে রয়েছে ছোট রাজকুমার তীক্ষ্ণ। এ-রাজ্যের অশ্বারোহীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বেদীটা ঘিরে। কয়েকজন সৈন্য সারা রাজধানীতে ডঙ্কা বাজিয়ে ঘুরছে। সেই ডঙ্কাধ্বনির অর্থ হল, সমস্ত প্রজাদের জমায়েত হতে বলা হচ্ছে এই চৌরাস্তায়।

দলে-দলে প্রজারা এসে মিলিত হচ্ছে সেখানে। কী ব্যাপারে তাদের ডাকা হচ্ছে, তা তারা কিছুই জানে না। এখন দুর্ভিক্ষ কিংবা দাবানলের ভয় নেই। বিদেশী সৈন্যদের রাজধানী আক্রমণের কোনও আশঙ্কা নেই, কারণ বর্ষাকালে যুদ্ধ হয় না। তা হলে কিসের জন্য এই জরুরি ডাক?

প্রজারা সবাই রাজপুরোহিত ছন্তীর দিকে উৎসুক ভাবে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ছন্তী কোনও কথাই বলছেন না। প্রজারা প্রথম-প্রথম ছন্তীর প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়ে চুপ করে ছিল। তারপর ফিসফিস করে কথাবার্তা শুরু করল। তারপর গুঞ্জন। তারপর কোলাহল।

ছন্তী তবু চুপ করে চেয়ে আছেন। যেন তিনি ধ্যান করছেন। রাজকুমার তীক্ষ্ণও ছটফট করছে না। ওই বয়েসের অন্য যে-কোনও ছেলে এতক্ষণ এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত না, কিংবা রাজবংশের ছেলেরা অতি অল্প বয়েস থেকেই অনেক কিছু শিখে যায়।

এক সময় প্রজারা দেখল, বাইরের দিক থেকে এক সৈন্যবাহিনী আসছে নগরের দিকে। এরা কারা? এদের সামনে রয়েছে দুই অশ্বপৃষ্ঠে এক পুরুষ ও এক রমণী। দূর থেকে তাদের ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

বাইরের সৈন্যবাহিনীটি আর-একটু কাছে আসতেই ছন্তী তাঁর ডান হাতটি উঁচু করে তুললেন। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত কোলাহল থেমে গেল।

ছন্তী এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উদাত্ত গলায় বললেন, "প্রিয় প্রজাগণ, তোমাদের আজ ডেকেছি এক বিশেষ কারণে। এ-রাজ্যে এক মহা সঙ্কট উপস্থিত। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দাবানলের চেয়েও আরও বড় বিপদ।"

এবার তিনি একটু থেমে প্রজাদের মুখের দিকে তাকালেন। সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে, অনেকের মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে।

ছন্তী আবার বললেন, "এই দুঃসংবাদ দেবার ভার আমার ওপর পড়েছে। অন্য সময় এ-দেশের রাজা, পরমবীর মহাচূড়ামণিই এই বেদী থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেন। কিংবা উদ্যান-বাটি থেকে তোমাদের দর্শন দেন। আজ তোমাদের মনে হতে পারে, মহারাজের পরিবর্তে আমি তোমাদের সামনে এসেছি কেন? তার কারণ, এই মুহূর্তে এই রাজ্যের কোনও রাজা নেই। এ-সংবাদ দিতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি অতিকষ্টে চক্ষের জল আটকে রেখেছি, কারণ, আমার ওপরে এখন খুবই গুরু দায়িত্ব! তোমাদের পরমপ্রিয় মহারাজ মহাচূড়ামণি আর বেঁচে নেই। তাঁকে খুন করা হয়েছে। এক কুৎসিত ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হয়েছেন।"

সমস্ত প্রজারা হাহাকার করে উঠল। সেই মুহূর্তে সেখানে নেমে এল শোকের ছায়া। কেউ-কেউ বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। কেউ-কেউ চিৎকার করে বলল, "মহারানি? আমাদের প্রিয় মহারানি কোথায়? তাঁর কিছু হয়নি তো?"

ছন্তী বললেন, "মহারাজকে কারা হত্যা করেছে তা আগে শোনো। এই ষড়যন্ত্রের মূলে আছে দু'জন। তোমাদের প্রাক্তন সেনাপতি চম্পক আর মহারাজের প্রিয় মহিষী তলতাদেবী। মহারাজকে সরিয়ে তলতাদেবী সিংহাসনে বসতে চান। সেই জন্য তিনি চম্পককে দিয়ে বিদ্রোহ করিয়েছেন। এই দ্যাখো, সেই চম্পক আর তলতাদেবী বিদ্রোহী সৈন্যদের নিয়ে রাজধানী দখল করতে আসছে। এখন তোমরাই ঠিক করো, তোমরা কি এই দুই ষড়যন্ত্রীকে ক্ষমা করবে?"

প্রজারা বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, "না, না, না!" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে

রতনতনু ঘাটী

আমাদের গ্রাম-বাংলার একটি কিশোর যখন আপনমনে কোনও মূর্তি বানাতে বসে তখন সে তুলে আনে একতাল মাটি। কারণ, তার মূর্তি তৈরির উপকরণ হিসেবে সে অন্য কিছুই ভাবতে পারে না। আসলে যে-কোনও দেশের আঞ্চলিক স্থাপত্যরীতিই সেই অঞ্চলে সহজে সংগ্রহ করা যায় এমন নির্মাণ-উপকরণের উপরেই নির্ভর করে। তাই ভারতের অন্যান্য অংশে পাথরের তৈরি বড়-বড় সৌধ চোখে পড়লেও বাংলায় পাথরের অভাবের জন্য স্থপতিরা নির্ভর করতেন পোড়ামাটির ইটের ওপর। পাথরে তৈরি মন্দিরের সংখ্যা এই অঞ্চলে ভীষণ কম। তাই দেবসৌধের নির্মাণ ও অলঙ্করণের জন্য তৈরি হয়েছিল পোড়ামাটির শিল্প টেরাকোটার।

এই পোড়ামাটির শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় সভ্যতার শৈশব থেকেই। মাটির পাত্র ও ভাস্কর্যই আদি মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রধান নিদর্শন। ভারতবর্ষ ছাড়াও মিশর, চিন, গ্রিস, ইতালি, ব্যাবিলন, দক্ষিণ আমেরিকায় একসময় এই শিল্পের প্রচলন ছিল। গ্রিসে উন্নতমানের টেরাকোটার প্রচলন ছিল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। তারপর যখন রোম সাম্রাজ্যের পতন হল, তখন টেরাকোটা শিল্পেও ভাটা পড়ল। এর পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালিতে টেরাকোটা শিল্পের উন্নতি ঘটে। পরে এই শিল্পের স্রোত ফ্রান্স, স্পেন ও ইউরোপে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

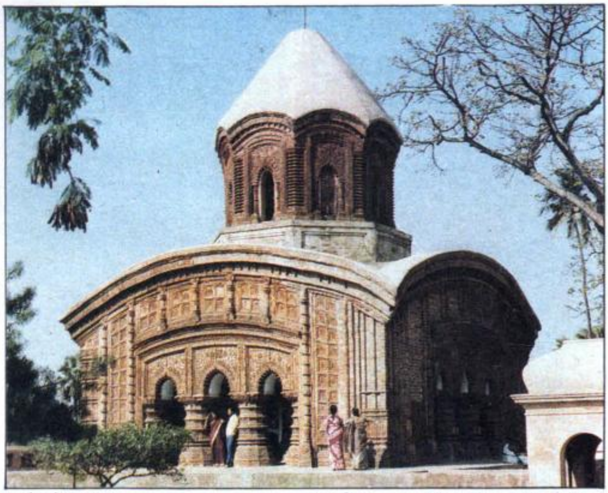

ফোটো : শৈলেন কুণ্ডু

বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির : টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন

পোড়ামাটির হাতি

অসমের গৌরীপুরের পোড়ামাটির পুতুল ফোটো : সত্যপ্রিয় সরকার

সিন্ধু সভ্যতা থেকে টেরাকোটার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। তক্ষশিলা, বক্সার, মথুরা, পাটনায় অনেক টেরাকোটার জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এইসব টেরাকোটা সিন্ধুসভ্যতার পরের এবং মৌর্য যুগের পূর্বের।

এর পরের যুগে ভারতের গ্রামে-গ্রামে হাতে তৈরি লোকশিল্পের মূর্তি তৈরি হত। এই সময়ের টেরাকোটা ছিল সমস্তই ছাঁচে গড়া। তক্ষশিলা থেকে চন্দ্রকেতুগড়—এই বিশাল এলাকা থেকে শুঙ্গ, কাণ্ব, ও আন্ধ্রযুগের অনেক টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গেছে।

এই সময়কার মাটির তৈরি মূর্তিতে বিদেশী প্রভাবও চোখে পড়ে। বসর বা তমলুকে ডানাওলা নারীমূর্তি পাওয়া গেছে, এর মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব দেখা যায়। তক্ষশিলার মূর্তিগুলিতে গান্ধাররীতির প্রভাব থাকলেও বেশির ভাগ টেরাকোটাই ভারতীয় শিল্পরীতির। টেরাকোটা শিল্পে লোকসংস্কৃতি এবং লোকধর্মের ছাপ স্পষ্ট। গুপ্ত যুগেও চমৎকার মাটির মূর্তি তৈরি হত। দেবালয় ছাড়াও গৃহসজ্জায় টেরাকোটা শিল্পের ব্যবহার ছিল। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ রাজ্যশ্রীর বিয়ের উৎসবে অনেক মাটির মূর্তি তৈরির ভাস্কর এসে ছিলেন।

পোড়ামাটির আধুনিক শিল্পসামগ্রী

বাংলায় পোড়ামাটির ইটের মন্দির দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া গ্রামে। খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর নিদর্শন এটি। তুর্কি বিজয়ের পর মন্দির নির্মাণে ভাটা পড়েছিল। পরে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে আবার টেরাকোটা শিল্পের ব্যবহার দেখা যায়। এই সময় নানারকম ছাঁচে গড়া টেরাকোটার টালি পলস্তারা দিয়ে মন্দিরের গায়ে এঁটে দেওয়া হত। চুন, সুরকি ও বালি দিয়ে পলস্তারা তৈরি করা হত। টেরাকোটা শিল্পে এসময় বিচিত্র ফুল, লতাপাতা, পদ্ম, গোলাপ এবং নানারকম জ্যামিতিক নকশা তৈরি হত। বিষ্ণুপুরের বেশির ভাগ মন্দিরে টেরাকোটার কাজ দেখা যায়—শ্যামরাই মন্দির, রাধাগোবিন্দ মন্দির, জোড়বাংলা মন্দির ও মদনমোহনের মন্দির। চাকদহের পালপাড়া মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির, বড় নগরের চার বাংলা মন্দিরেও সুন্দর টেরাকোটার কাজ রয়েছে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বাংলায় টেরাকোটা শিল্পের ধারা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন নানাভাবে ভারতের অনেক জায়গায় টেরাকোটা শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে। কলকাতায় 'টেরা-কোটাল' নামে একটি সংস্থা টেরাকোটার শিল্পে ঘর সাজানোর উপকরণ তৈরি করছেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন বিভিন্ন জীবিকার মানুষ গড়ে তুলেছেন এই সংস্থাটি। এঁরা দক্ষিণবঙ্গ থেকে অর্থাৎ ডায়মন্ডহারবার অঞ্চল থেকে খেতের মাটি সংগ্রহ করে আনেন। তারপর কেমিক্যাল মিশিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে-থাকা লবণ বের করে নেন। মাটিতে লবণ থাকলে খুব তাড়াতাড়ি টেরাকোটা শিল্পসামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। বাঁকুড়ায় যেসব টেরাকোটার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়—সেগুলি রোদে শুকোবার সময় ও পরে ভাটিতে পোড়াবার সময় যাতে না ফেটে যায়, তাই ব্যবহার করা হত ভাল এঁটেল মাটি। ভাগীরথীর তীরের গঙ্গামাটিই টেরাকোটার জন্য ব্যবহার করা হত। এই সংস্থা মাটিকে প্রসেস করার পর সূর্যের আলোয় শক্ত করে নেন প্রয়োজন মতো। তারপর ছাঁচের সাহায্যে ছাপ তোলার পর ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নেন। এবার আগুনে পোড়ানোর পালা। ৮০০-৯০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পোড়ানো হয়। এঁদের ইলেকট্রিক এবং কয়লার ফার্নেস আছে। পোড়াতে সময় লাগে সাত ঘণ্টা। এঁরা কোনও রং ব্যবহার করেন না। এঁদের টেরাকোটা ইংল্যান্ডে পাঠানো হচ্ছে। এঁরা তৈরি করছেন ওয়াল মিউরাল টাইল, জ্যামিতিক নকশা, ওয়াল হ্যাংগিং, বিভিন্ন মুখোশ, ষাঁড়, হাতি, ময়ূর, ছাইদানি, ধূপদানি ইত্যাদি। কলকাতায় লেক গার্ডেনস, ক্রাফট বাজার-ময়দান, ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনীতে এঁরা টেরাকোটা শিল্পসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। দৃষ্টিনন্দন এইসব টেরাকোটা দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে। জয়নগর-মজিলপুরের পোড়ামাটির পুতুল, বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া গ্রামের পোড়ামাটির ঘোড়ার মতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে 'টেরা-কোটাল'-এর পোড়ামাটির শিল্প।

ডিজনি সারাজীবন যা ভেবেছিলেন, যা কিছু করতে চেয়েছিলেন তারই সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে এপকট সেন্টারে। ভবিষ্যতের মানুষের জন্য ডিজনির এই সৃষ্টি অমরত্ব দাবি করতে পারে।

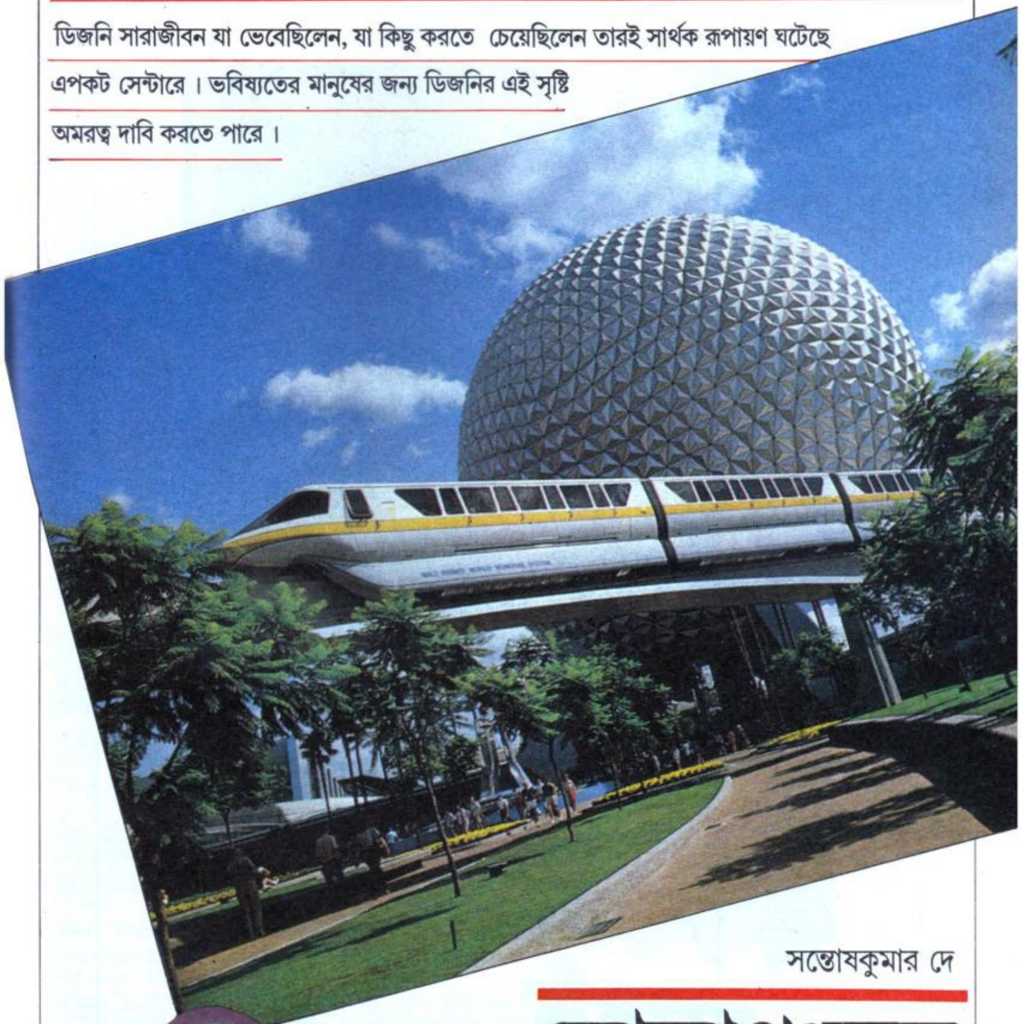

সন্তোষকুমার দে

রোমাঞ্চকর এপকট সেন্টার

এপকট সেন্টারের প্রতীক বিশাল আকারের এই গোলক যেন পৃথিবীরই একটি ছোট সংস্করণ

একমাত্র সার্ফ

"হ্যাঁ", ললিতা দেবী বলেন, "সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে, সবচেয়ে ভাল ক'রে, তাই আমার তো আর অন্য কিছু নয়, শুধু সার্ফই চাই !"

একমাত্র সার্ফই সবচেয়ে সাদা ক'রে ধোয়।

LINTAS SU 402 2416 BG

হিন্দুস্তান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আমেরিকায় গিয়ে ডিজনি ওয়ার্ল্ড যাওয়ার ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বছর দুয়েক আগের কথা। ডিজনিল্যান্ড আছে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় আর জাপানের টোকিওতে। সতেরো বছর আগে আমেরিকার ফ্লোরিডায় ডিজনির আর-একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে—তার নাম 'ডিজনি ওয়ার্ল্ড'। জানলাম, ডিজনি ওয়ার্ল্ড দেখতে গেলে শুধু যে তাদের পনেরো বছর পূর্তির উৎসব দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে তাই নয়, ফ্লোরিডাতে গড়ে-ওঠা ডিজনির এক বিস্ময়কর নতুন কেন্দ্র, 'এপকট সেন্টার'ও দেখা হয়ে যাবে।

কিন্তু এপকট সেন্টারের নতুনত্ব কী? একজন ওয়াকিবহাল ব্যক্তির কাছ থেকে শুনলাম, ডিজনিল্যান্ডের আর ডিজনি ওয়ার্ল্ডের দর্শনীয় বস্তু মোটামুটি প্রায় এক। সেই আমোদপ্রমোদের পার্ক ঘিরে নানা চিত্তাকর্ষক দর্শনীয় বিষয়ের সমাবেশ, অ্যাডভেঞ্চার ল্যান্ড, ফ্রন্টিয়ার ল্যান্ড। ফ্যানটাসি ল্যান্ড, টুমরো ল্যান্ড। এক কথায় ডিজনির ম্যাজিক কিংডমের অগুনতি ম্যাজিক। ভূতের বাড়ি, জলদস্যুর ডেরা, গেছো বাবার বাড়ি, উড়ন্ত হাতি, ঘুরন্ত কাপ-ডিশ, ডুবন্ত সাবমেরিনে বসে সাগরতলের দৃশ্য দেখা, আকাশপথে রোপওয়ে দিয়ে ভ্রমণ, স্টিমার বা প্রাচীনদিনের ট্রেনে চেপে বনজঙ্গল ভেদ করে যাওয়ার সময় কুমির, হাতি, সাপ প্রভৃতির মডেল—যা দেখলে মনে হবে অবিকল জীবন্ত। কিন্তু এপকট সেন্টার একেবারে নতুন চিন্তার ফসল, বলতে গেলে সারা জীবন ডিজনি যা ভেবেছেন, করেছেন—সব কিছুর সার্থক রূপায়ণ এটি। সুতরাং একদিন বেরিয়ে পড়া গেল ফ্লোরিডার পথে।

'এপকট' বা 'Epcot' শব্দটিও ডিজনির তৈরি। Experimental Prototype Community Of Tomorrow শব্দগুলির প্রথম অক্ষর নিয়ে হয়েছে Epcot শব্দটি, যার দ্বারা ডিজনি ভবিষ্যতের মানুষের জন্য তাঁর কিছু পরীক্ষামূলক নির্দশনকে বোঝাতে চেয়েছেন।

দু-দুটি ডিজনিল্যান্ড তৈরি করবার পরেও ডিজনির উৎসাহে ভাটা পড়েনি, বরং তিনি তখন চাইছিলেন নতুন একটি কেন্দ্র স্থাপন করে আরও বড় আকারে আমোদপ্রমোদের মধ্য দিয়েই মানবসভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে দিতে পারবেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভবিষ্যতের মানুষ কীভাবে আরও উন্নত ও আরামপ্রদ জীবনযাপন করতে

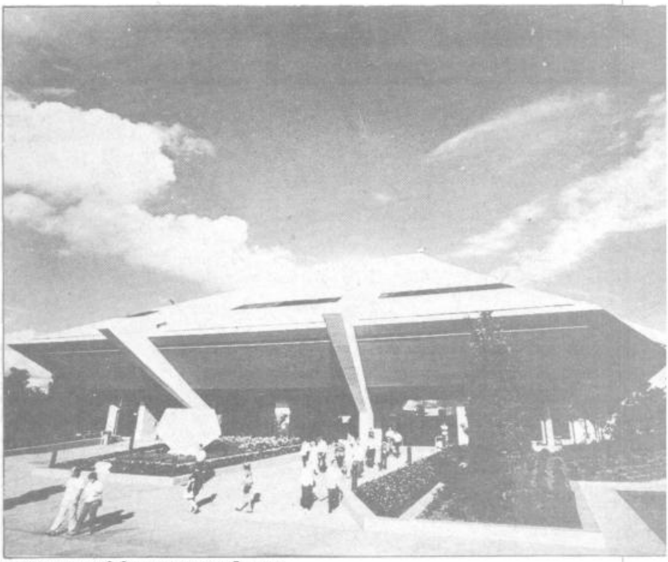

হোরাইজন-এর প্যাভিলিয়ন যেন বৃহৎ এক হীরকখণ্ড

পারবে তার একটা বাস্তব রূপ চোখের সামনে তুলে ধরতে পারবেন। শহরের নানা সমস্যার কীভাবে সমাধান হতে পারে তা নিয়েও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর সেই নতুন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি বেছে নিলেন আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল—ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে তেতাল্লিশ বর্গমাইল জুড়ে পড়ে থাকা বনজঙ্গল আর জলাভূমির এক বিরাট অংশ।

সেখানে তিনি কী গড়ে তুলতে চান তার একটা খসড়া তৈরি করে তার ফিল্ম তুললেন, যা দেখে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁর পরিকল্পনাটা বুঝতে পারেন। সেটা ১৯৬৬ সালের কথা। ওই বছরের ১৫ ডিসেম্বর মাত্র ৬৪ বছর বয়সে অকালে ডিজনি মারা যান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর কুশলী সহকর্মীরা উঠে পড়ে লাগলেন, ডিজনি ওয়ার্ল্ড গড়ে তুলতে। সে কাজটা তাঁদের মোটামুটি জানাই ছিল, কারণ আগেকার ডিজনিল্যান্ড তৈরির অভিজ্ঞতা ছিল তাঁদের। কিন্তু এপকট সেন্টারের গোটা পরিকল্পনাই নতুন এবং তা বাস্তবায়িত করতে গেলে কোটি-কোটি টাকা খরচ হবে। এজন্য দরকার আমেরিকার বড়-বড় কম্পানির সক্রিয় সহযোগিতা এবং পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশের ঐকান্তিক সহায়তা। সৌভাগ্যের বিষয়, ডিজনির উপর সকলের এত শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর পরিকল্পিত কাজ সবই দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৮২ সালের ১ অক্টোবর এপকট সেন্টার খোলা হয়। ২৫০ একর জমির এক অংশে আছে ভবিষ্যতের বিষয়, অন্য অংশে, 'ওয়ার্ল্ড শো-কেস'-এ নানা দেশের স্থায়ী প্রদর্শনী।

এপকট সেন্টারের প্রতীক চিহ্নটি একটি বিশাল আকারের গোলক, যেন পৃথিবীরই একটি ছোট সংস্করণ। আসলে এটির নাম কিন্তু 'স্পেসশিপ আর্থ'। পৃথিবীর মতো গোলাকৃতি একটি কাল্পনিক মহাকাশযান, যার ভিতর চড়ে যাত্রীরা 'টাইম মেশিন' নামের ছোট গাড়িতে করে ঘুরে-ঘুরে অতীত ও বর্তমানের অনেক দর্শনীয় বিষয় দেখতে পারে। মহাকাশযান থেকে নামলে পাওয়া যায় 'আর্থ স্টেশন', ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বিমানকেন্দ্র কেমন হবে তারই নমুনা।

এই দুটি দর্শনীয় বিষয় উপহার দিয়েছেন 'আমেরিকান টেলিগ্রাফ' নামের টেলিফোন কম্পানি (এ· টি· অ্যান্ড টি)।'বেল সিসটেম' হল টেলিফোন আবিষ্কারক গ্রাহাম বেলের নামে ওই কম্পানির গবেষণাবিভাগ। একসময় এ· টি· অ্যান্ড টি ছিল সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করত। ১৯৮৪ সালের ১

জানুয়ারি সেই কম্পানিটি ভেঙে আটটি আঞ্চলিক কম্পানিতে ভাগ করা হলেও 'বেল ল্যাবরেটরি' এখনও এই বিষয়ে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ গবেষণা-কেন্দ্র।

এপকট সেন্টারে আরও কয়েকটি বিরাট দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান আছে—ইউনিভার্স অব এনার্জি, হরাইজন, ওয়ার্ল্ড অব মোশন, জার্নি ইন-টু ইমাজিনেশন, দি ল্যান্ড, দি লিভিং সিজ, কমিউনিকোর এবং আমেরিকান অ্যাডভেঞ্চার। আরও আছে—আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ইতালি, চিন, ইংল্যান্ড, আফ্রিকা এবং মেক্সিকোর আলাদা আলাদা স্থায়ী প্রদর্শনী। এ ছাড়াও আছে পলিনেশিয়ান ভিলেজ, ডিসকভারি ল্যান্ড, ফোর্ট উইলডারনেস, রিভার কানট্রি, ডিজনি ইন, ডিজনি ভিলেজ, লেক বুয়েরা ভিস্টা প্রভৃতি দেখার জায়গা।

১৯৭১ সালের ২৩ অক্টোবর ডিজনি ওয়ার্ল্ডের দরজা জনসাধারণের জন্য খোলা হয় এবং মাত্র দশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮১-এর শেষ অবধি সাড়ে বারো কোটিরও বেশি দর্শক এখানে এসেছেন। দর্শকদের থাকবার জন্য এখানে বড়-বড় হোটেল আছে। তাতেও সব সময় কুলিয়ে ওঠে না। গরমের ছুটির সময় যাত্রীদের ভিড় এত বাড়ে যে, হাজার হাজার যাত্রী খোলা আকাশের নীচে রাত কাটায়। একবার প্রায় ষোলো হাজার যাত্রী সেইভাবে রাতে ওখানে ছিল। এখানে কী কী দ্রষ্টব্য বস্তু আছে তা জানাবার আগে প্রথম বলছি এখানকার চমৎকার পরিবহণ ব্যবস্থার কথা।

পরিবহণ

ডিজনি শুধু শোভা বাড়াবার দিকেই আগ্রহী ছিলেন না, যাতে কষ্ট না করে সহজে, আরামে, বসে-বসেই সব জায়গা ঘুরে দেখতে পারেন সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই অধিকাংশ দর্শনীয় জায়গায় যাওয়ার জন্য নানারকম যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। এমনকী, প্রতিটি প্যাভেলিয়নের মধ্যেও ছোট-ছোট গাড়িতে বসে, বা নৌকোয় চেপে, সাবমেরিনে বসে, সব ঘুরে ঘুরে দেখার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া গোটা ডিজনিল্যান্ড বা ডিজনি ওয়ার্ল্ডের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়ার জন্য স্কাইওয়েতে আকাশপথে তারে ঝোলানো রং-বেরঙের ছোট-ছোট ডুলি, সেকালের রেলগাড়ি, পুরনো দিনের স্টিমার—এসব তো আছেই, সবচেয়ে সুন্দর ডিজনি ওয়ার্ল্ডের মনোরেল—যা অনেক উঁচু দিয়ে বড়-বড় কংক্রিটের থামের উপর বসানো বিরাট সরু পুলের গা বেয়ে একটি রেলে চলে। বিদ্যুতে চলে, তাই ধুলো-ধোঁয়া নেই। অনেকটা প্লেনের মতো মুখের দিক। মনোরেল একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে চলে। অথচ স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটার কোনও ঝামেলা নেই। একবার সারাদিনের জন্য টিকিট কেটে ডিজনি ওয়ার্ল্ডে ঢুকলে ভিতরে সব যানবাহনে যতবার খুশি বিনা টিকিটে অর্থাৎ নিখরচায় চড়া যায়। এইভাবে চলে যাওয়া যায় ডিজনি ওয়ার্ল্ড থেকে কয়েক মাইল দূরে এপকট সেন্টারে। 'দি ল্যান্ড' প্যাভেলিয়নের ভিতর দিয়ে খাল ধরে চলে স্বয়ংক্রিয় নৌকো, আর ইউনিভার্স অব এনার্জি মণ্ডপে আদিম যুগের জঙ্গলের মুখোমুখি হওয়া যায় সিনেমার সিটে বসে। ঘরের মেজেটাই আসলে সরে সরে যায় যাত্রীদের চেয়ারসুদ্ধ নিয়ে।

তা ছাড়া যাত্রীরা দূরে নিজেদের গাড়ি পার্ক করে রাজপথে এলেই পাবে চলমান মোটর ট্রলি—যা যাত্রীদের বিনা ভাড়ায় একেবারে দর্শনীয় বস্তুর কাছে পৌঁছে দেয়। ডিজনি ওয়ার্ল্ডের পুরনো দিনের রেলগাড়ির সঙ্গে অতি আধুনিক মনোরেলের সহাবস্থান লক্ষ করবার মতো।

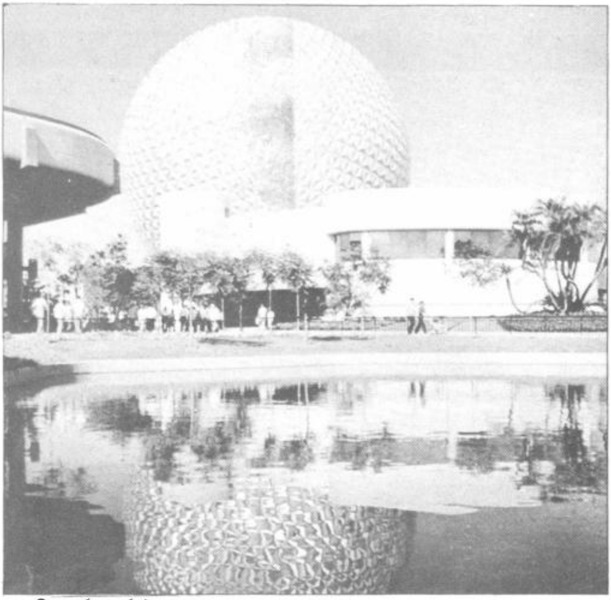
স্পেসশিপ আর্থ ও আর্থ স্টেশন

স্পেসশিপ আর্থ

পৃথিবীর মতো গোলাকৃতি একটি কাল্পনিক বিরাট মহাকাশযান, যার উচ্চতা ১৮ তলা বাড়ির সমান, তিনজোড়া বৃহৎ আকৃতির মজবুত হেলানো পায়াতে ভর করে মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। বাকমিনস্টার ফুলার প্রবর্তিত জিওডেসিক পদ্ধতিতে তৈরি একটি গোলাকার তাঁবু একবার কলকাতায় ময়দানে দেখানো হয়েছিল। এটিও ওইভাবে তৈরি, তবে আকারে সেই তাঁবুর কয়েকশো গুণ বড়। স্টিল ফ্রেমের উজ্জ্বল রুপোলি রং বহু দূর থেকে দেখা যায়। যত এর কাছে আসা যায় ততই তার গঠন-বৈচিত্র্য নজরে পড়ে। ওই বিশাল গোলকটি শক্ত মজবুত ইস্পাতের সহস্র সহস্র ত্রিকোণ আকৃতির ফ্রেমে তৈরি। ইস্পাতের ফ্রেমের উপর লাগানো আছে মসৃণ অ্যালুমিনিয়ামের অজস্র তিনকোনা পাত—যার উপর আকাশ, মেঘ, রোদ সূর্য, চাঁদ, তারা—সব কিছুর ছায়া প্রতিফলিত হয়। আবার পৃথিবীর গাছপালা বাড়িঘর ও আলোকমালাও প্রতিফলিত হয়। তাই দিনে, রাত্রে, সকাল, সন্ধ্যায়, দুপুরে, ক্ষণে-ক্ষণেই তার চেহারার পরিবর্তন হয়। সে সৌন্দর্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

কিছুটা দূরেই হ্রদের জল, তাতে পড়েছে হ্রদের অন্য পারের বিভিন্ন দেশের বর্ণাঢ্য মণ্ডপ ও সৌধের ছবি, সেসবও প্রতিফলিত হয় ওই মস্ত গোলকটিতে।

যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামে, ওই বিরাট গোলকটির গা বেয়ে জল এসে জমা হয় খুব বড় একটি জলাধারে, তাই গোলকের নীচে কারও গায়ে জল লাগে না। আঠারো তলার সমান উঁচু ওই গোলকটির তলা দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াতের পথ, লিফটে উঠে ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

গোলকটি তো খণ্ড খণ্ড ত্রিভুজের মতো ফ্রেম দিয়ে তৈরি, কিন্তু তার মধ্যেও কী কৌশলে যে তোলা হয়েছে বৃহৎ আকৃতির কম করে কুড়িটি দর্শনীয় বস্তু—যার মূল বিষয় হল সংবাদ প্রচার ও বার্তা বিনিময়, যা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এটির স্রষ্টা বেল সিসটেম হল কমিউনিকেশনে পৃথিবীর এক সেরা বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান। এই গোলকটির মধ্যে যেসব বিষয় দেখানো হয়েছে তাতে মানব সভ্যতার আদিযুগ থেকে ভাবের আদান-প্রদানে বিবর্তনটি কী করে তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে তা অত্যন্ত আকর্ষকভাবে চিত্রে ও মডেলে ফুটে উঠেছে। সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে অতি দ্রুত সংবাদ পাঠানো হয় তাও সবিস্তারে দেখানে হয়েছে।

এখানে দর্শকেরা টাইম মেশিন নামে খোলা গাড়িতে (দু' সারিতে একসঙ্গে চারজন বসবার মতো) চেপে ওই জিওডেসিক স্ফিয়ারের ভিতরে গা বেয়ে বেয়ে ১৮ তলা সমান উঁচুতে উঠে আবার একইভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্পাইরালওয়ে বেয়ে নেমে আসে। পথে তারা দেখতে পায় কমপক্ষে চল্লিশ হাজার বছর ধরে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানব সভ্যতায় সংবাদ আদানপ্রদানের ধারাটি। অডিও-এনিমেট্রোনিক্স্ পদ্ধতিতে যন্ত্রে মডেলগুলি সচল হয়, কথা বলে, কাজ করে।

এইভাবে চলতে চলতে প্রাচীন মিশর, তখনকার হিয়ারোগ্লিফিক্স্ অক্ষরে খোদাই করা মন্দিরগাত্র প্রভৃতি দেখা যায়। ছবি দিয়ে মনের ভাব বোঝানোর ওই প্রচেষ্টা থেকে ক্রমে লেখার অক্ষর সৃষ্টি। লিপিকারেরা ফারাও-এর আদেশমতো ফরমান লিখছে, তাও দেখা যায়। এভাবে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার নিদর্শন, রোমানদের ক্রমোন্নতি, আরব, স্পেন, এবং চিন দেশের লেখার যুগ এসে পড়ে। দেখা যায় যোহান গুটেনবার্গের আবিষ্কৃত প্রথম ছাপাখানার কাজকর্ম। পায়ে চালানো মেশিনের পরে বাষ্পচালিত ছাপার যন্ত্র আসে। একজন খবরের কাগজ বিক্রেতার হাঁক শুনতে শুনতে এসে পড়ে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন। তারপর রেডিও, ফিল্ম সবাক চলচ্চিত্র, টেলিভিশন। হতে হতে অতি আধুনিক ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের যুগে এসে পড়ে। আসে কমপিউটার যুগ।

ডাইনোসরের লড়াই

স্পেসশিপ আর্থের প্রবেশপথেই দেখা গিয়েছিল এক বিরাট দেওয়াল চিত্রে মানুষের মহাশূন্য অভিযান, কীভাবে সেখান থেকে সারা দুনিয়ায় সংবাদ আদান-প্রদান করা হচ্ছে তারই যান্ত্রিক ব্যবস্থা আর যাত্রাশেষে গোলকের শীর্ষদেশে উঠলে মাথার উপরে ফুটে ওঠে তারাভর্তি আকাশের ছবি। কমপিউটারে সে তারকাগুলি দীপ্তিমান রাখা হয়েছে। সেখান থেকে দূরে আমাদের পৃথিবীকে কেমন দেখায় তাও দেখা যায়। নামবার পথে ছবিতে দেখি, মহাশূন্যে কীভাবে ভাসমান অবস্থায় মহাকাশচারীরা একটি শাটলযান মেরামত করছেন। ঘোষকের কথায় জানা যায় পাশে দৃশ্যমান ছবির কোনটা অতি আধুনিক ল্যান্ডস্যাট (যে স্যাটেলাইট দিয়ে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে সার্ভে করা যায়—যাতে জানতে পারা যায় কোথায় ভূগর্ভে কোন্ কোন্ জিনিসের খনি রয়েছে)। পৃথিবীর আবহাওয়া এবং নানা তথ্য সংগ্রহের জটিল যন্ত্রপাতির বিষয় বুঝিয়ে বলা হয়। এইভাবে যখন যাত্রা শেষ হয়ে আসে তখন ঘোষক জানান, "আমাদের যুগ হল জ্ঞানের যুগ, এবং নিজেদের নির্বাচিত বিষয় বেছে নেওয়া ও তার সুযোগসুবিধা লাভ করবার যুগ। তাই আসুন, আমরা শুনি, শিখি আর অনুসন্ধান করি, আমরা জানতে চাই এবং বুঝতে চাই।"

আর্থ স্টেশন

স্পেসশিপ আর্থ ঘুরে বেড়িয়ে মাটিতে নেমে এলে দেখা যায়, যে পথ দিয়ে ঢুকেছি এ তো সে পথ নয়, এ যেন এক বিরাট হাওড়া স্টেশন। কিন্তু এত যে লোকের ভিড় তবু কোনও কোলাহল নেই, তার কারণ গোল, ঘোরানো দেওয়াল জুড়ে বিশাল বিশাল পরদায় চলমান ছবিগুলিতে নানা তথ্য অবিরত জানানো হচ্ছে। যাত্রীরা তাই দেখেই যে-যার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পায়। তাতেও যারা তাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সন্ধান পায় না, তারা দেওয়ালের কাছে এগিয়ে গেলে অনেকগুলি যন্ত্র পর-পর সাজানো দেখতে পাবে, তাতে তার বিশেষ কিছু

জানবার থাকলে যন্ত্রে সেই বিষয়টির নামের উপর স্পর্শ করা মাত্র তার উত্তর পরদায় ফুটে উঠবে।

তোমরা এখন নিশ্চয় জানতে চাইবে—দেওয়ালের চলমান ছবিতে বা এইসব যন্ত্রে কী-কী বিষয় জানা যায়? অনেকেই জানতে চাইবে, এপকট সেন্টারে আর কী-কী দেখবার জিনিস আছে? দেওয়াল জুড়ে প্রচুর চলমান ছবি, ওরা পুরনো দিনের ইনফরমেশন বুথের জায়গা দখল করে জানিয়ে দিচ্ছে—আরও কী-কী বিষয় দেখবার আছে। যদি কারও খিধে পায় সে নিশ্চয় জানতে চাইবে, ধারে-কাছে কোথাও রেস্তোরাঁ আছে কি না। কিংবা যদি কারও এপকট সেন্টারে এসে সেদিন আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকে, কাছাকাছি কোথাও দু-চারদিন থাকবার ব্যবস্থা আছে কি না, এসব প্রশ্নের জবাব ওই দেওয়ালের কাছে রাখা যন্ত্রগুলিতে শুধু একটু স্পর্শ করলেই তার উত্তর সহজেই পাওয়া যাবে।

এতেও যারা খুশি হতে পারে না, তাদের জন্য বুথ রয়েছে, যেখানে হাসিমুখে সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি আছেন কর্মী, বেশির ভাগই মহিলা।

ওই যে স্পর্শ করা মাত্র ভিডিও স্ক্রিনে নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব ফুটে ওঠে, ওটি করছে কমপিউটারে। যারা কোনওদিন কমপিউটার ব্যবহার করেনি তারাও নিশ্চিন্তে সানন্দে এই মেশিন ব্যবহার করে আগামী শতাব্দীর আসন্ন পরিবেশের কিছুটা আভাস পাবে। তা ছাড়া দেওয়ালের বড় পরদায় যেসব ছবি আসছে তার মধ্যে থাকে কিছু ছোট ছোট চৌকো খোপের তৈরি ছবি। তাও সাধারণ ছবি হতেই যান্ত্রিক উপায়ে ওইভাবে কিউবিজম্ পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবিতে পরিণত করা হচ্ছে, যা সহজেই নজরে পড়ে এবং সহজেই বোঝা যায়।

কোথায় কোন্ প্যাভেলিয়নে কী-কী দেখানো হচ্ছে তারও কিছু নমুনা দেখাবার ব্যবস্থা আছে এই আর্থ স্টেশনে। আবার যদি এমন কোনও বিশেষ ঘটনা থাকে, যেমন সত্যিকারের একজন সেদিন এসেছেন এপকট সেন্টারে, তক্ষুনি সব ছবি স্তিমিত হয়ে সরে গিয়ে কেন্দ্রীয় বিশাল পরদায় প্রচারিত হবে সেই বিশেষ ঘোষণাটি—যাতে তা সবার নজরে পড়ে।

কোন্ রেস্তরাঁয় খাবারের কী দাম, বাচ্চাদের কোনও ছাড় দেয় কি না, কিংবা কোনও একটি নির্দিষ্ট হোটেলে রুম বুক করা যাবে কি না—সব খুঁটিনাটি প্রশ্নের জবাব মেশিনেও দিতে পারে, অনুসন্ধান অফিসের কর্মীরাও বলবে। এমনকী, যারা প্রতিবন্ধী, তাদের সহায়তা করবার জন্য আলাদা বুথ আছে। যারা ইংরেজি জানে না তাদের ইউরোপীয় অন্য ভাষায় বোঝাবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে—যেমন ফরাসি, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষায় শুনবার জন্য নির্দিষ্ট হেডসেট পরে নিলেই সেই ভাষায় কথা অনূদিত হয়ে যায়। কমপিউটার টারমিনালেও এই অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছে।

> এপকট সেন্টারের প্রতীক চিহ্নটি একটি বিশাল আকারের গোলক, যেন পৃথিবীরই একটি ছোট সংস্করণ। আসলে এটির নাম কিন্তু 'স্পেস শিপ আর্থ'। পৃথিবীর মতো গোলাকৃতি একটি কাল্পনিক মহাকাশযান, যার ভিতর চড়ে যাত্রীরা 'টাইম মেশিন' নামের ছোট গাড়িতে করে ঘুরে ঘুরে অতীত ও বর্তমানের অনেক দর্শনীয় বিষয় দেখতে পারে। মহাকাশযান থেকে নামলে পাওয়া যায় 'আর্থ স্টেশন', ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বিমানকেন্দ্র কেমন হবে তারই নমুনা।

আর্থ স্টেশনের মেশিনে এপকট সেন্টারের অন্যত্র রেস্টুরেন্ট বা হোটেলে রিজার্ভ করাও সম্ভব। যন্ত্রের রিজার্ভেশন বিষয়ক স্থানে স্পর্শ করা মাত্র পরদায় যেখানে রিজার্ভেশন চাইছি সেই রেস্টুরেন্টের কর্মীটিকে পরদায় দেখা যাবে, তখন তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বললে দূরে বসেও সেই কর্মীটি তা শুনতে পাবেন এবং যোগাযোগকারীর নাম ও বুকিং-এর সময়, তারিখ, লিখে নিয়ে আশ্বস্ত করে বলবেন, "ঠিক সময়ে চলে আসুন, আপনার খাবার তৈরি পাবেন।' যদি সে হোটেলে বুকিং না মেলে, ওরাই অন্য হোটেলের সন্ধান বলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন। এতেও যদি অস্বস্তি না কাটে তবে ওই যন্ত্রেই একটি বোতাম রয়েছে যেটি স্পর্শ করলেই পরদায় একজনের মুখ ভেসে উঠবে। তিনি বলবেন, 'আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?' তখন তাঁকে আমার প্রয়োজনের লিস্টটা বলে গেলেই হল—সব ব্যবস্থা তিনিই করে মুশকিলের আসান করবেন। ওই যন্ত্রের মধ্যেই দু'দিকে সংযোগকারী ব্যবস্থা আছে যাতে প্রশ্নকর্তাকে উত্তরদাতাও দেখতে পান, যেমন উত্তরদাতাকে এখানে প্রশ্নকর্তা দেখতে পাচ্ছেন। তাই মুখে হাসি এনে কথা বলাই ভাল, যাতে উত্তরদাতা তা দেখতে পান।

এইরকম যন্ত্র আর্থ স্টেশন ছাড়াও পার্কে আরও ২৯টি জায়গায় বসানো আছে, যাতে যাত্রীরা যে-কোনও জায়গা থেকেই নানা কেন্দ্রের সঙ্গে সহজে নিখরচায় যোগাযোগ করতে পারেন। পরে এমন যন্ত্র আরও বেশি সংখ্যায় বসাবার পরিকল্পনা আছে। এপকট সেন্টার এভাবেই আগামী দিনের পৃথিবীর মানুষের সুখসুবিধা বাড়াবার বাস্তব নিদর্শন হাজির করে চলেছে।

ইউনিভার্স অব এনার্জি

এই প্যাভেলিয়নটি উপহার দিয়েছেন আমেরিকার বৃহৎ পেট্রোল কম্পানি—'এক্সন'। এখানে মডেল, চলচ্চিত্র ও অতি আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর আদিম যুগের অরণ্যে বিরাট আকৃতির ডাইনোসর ও অন্যান্য প্রাণী কীভাবে লড়াই করত, কীভাবে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতে চাপা পড়ে লক্ষ লক্ষ বছর পৃথিবীর তলায় থেকে ক্রমে ফসিল এনার্জি পেট্রলে পরিণত হয়।

শুধু পেট্রল নয়, যতরকম উৎস থেকে মানুষ শক্তি সংগ্রহ করতে পারে তাও দেখানো হয় ১০০টি ঘূর্ণায়মান প্রোজেকশন ট্রাঙ্গল দিয়ে। তারপর দর্শকদের সেই আদিম অরণ্যের পরিবেশের মুখোমুখি এনে ফেলা হয়। সেখানে ডাইনোসরের মডেলগুলি দর্শকদের মাথার উপর গলা বাড়িয়ে দেয়, মনে হয় এক্ষুনি কামড়ে দেবে। দেখা যায় ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত, ছুটে আসে ভয়ঙ্কর লাভা স্রোত।

সেখান থেকে দর্শকেরা এসে পড়ে একেবারে বিংশ শতাব্দীর 'এনার্জি ইনফরমেশন সেন্টার'-এ। কীভাবে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ শক্তির সন্ধানে কাজ করে চলেছে তারই চলমান ছায়াছবি দেখতে, যার পরদাটা ২১০ ফুট বিস্তৃত হয়ে দর্শকদের ঘিরে থাকে। এখানে সূর্যরশ্মি থেকে সংগৃহীত শক্তি দিয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালাবার জন্য বাড়িটির ছাদে ৮০ হাজার সোলার সেল বসানো আছে।

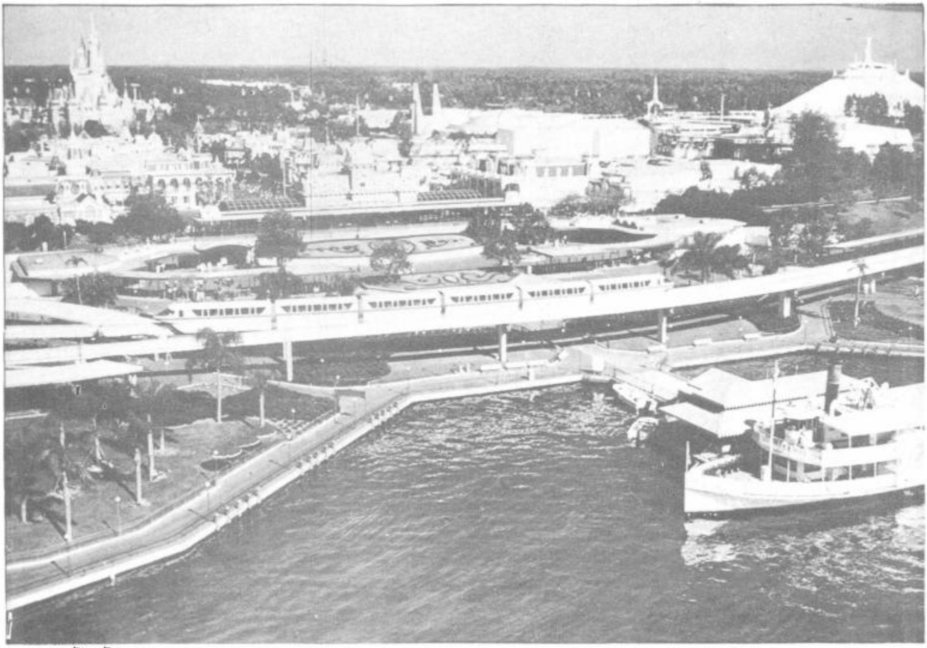

স্বপ্নের এপকট সেন্টার

ওয়ার্ল্ড অব মোশন

আমেরিকার সবচেয়ে বড় মোটর কম্পানি হল—জেনারেল মোটর্স্, তাঁরাই উপহার দিয়েছেন—'ওয়ার্ল্ড অব মোশন' বা 'গতির জগৎ'। ভবিষ্যতে মোটরগাড়ির আকৃতিপ্রকৃতি কেমন হবে তাও এখানে দেখানো হয়েছে।

প্রদর্শনীর শুরু হয়েছে আদিম যুগের মানুষ কীভাবে পরিবহণ সমস্যার সমাধান করত তাই দিয়ে। তার মধ্যে চাকার আবিষ্কারই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তারই প্রতীক হিসেবে এই প্রদর্শনীটিই একটি চাকার মতো গোলাকারভাবে সাজানো। পায়ে হেঁটে যাতায়াত থেকে শুরু করে হাজার হাজার বছর ধরে কীভাবে মানুষের গতি বাড়ল, নানা মডেল ও ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। তাতে লিওনার্দো দা ভিনচির কল্পিত নানা ব্যবস্থা, মায় উড়োজাহাজের স্কেচ থেকে অতি আধুনিক যুগে এবং অদূর ভবিষ্যতে যানবাহনের কীভাবে বিবর্তন হয়েছে এবং হবে তাও দেখানো হয়েছে। ওখানেই আছে একটি রোবট ও একটি যান্ত্রিক পাখির আশ্চর্য প্রদর্শনী। ওখানে ট্রানস সেন্টার-এ রয়েছে বিরাট আকারের এক চমৎকার কারখানা। আবার এয়ারোটেস্ট বিভাগে যান্ত্রিক উপায়ে দেখানো হয়, নতুন মডেলের গাড়ি ব্যবহার করলে তাতে পেট্রোলের খরচ কতটা বাঁচানো যাবে।

হরাইজনস

এই প্যাভেলিয়নটি তৈরি হয়েছে যেন তা একখণ্ড বিরাট আকৃতির হীরক বা অন্য দামি পাথরের খণ্ড। এটি উপহার দিয়েছেন আমেরিকার আর-এক বাঘা কম্পানি—জেনারেল ইলেকট্রিক। এখানে এপকট সেন্টারে যেসব তথ্যপূর্ণ প্রদর্শনী দেখানো হয়েছে তা একসঙ্গে দেখবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন—সংবাদ আদান-প্রদান, শক্তি সংগ্রহ, পরিবহণ ব্যবস্থা, নানা যান্ত্রিক আবিষ্কার ও তার ফলে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি ও তার দৈনন্দিন জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য।

দর্শকেরা প্রথমে এসে পৌঁছয় ভবিষ্যৎকালের এক স্টেশনে—যার নাম ফিউচার পোর্ট—অর্থাৎ ভবিষ্যৎ স্টেশনের কাল্পনিক মডেল। এখানে যাত্রীরা তাদের যানবাহনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দেখে ভবিষ্যৎ যুগের একটি শহরের ত্রিমাত্রিক ছবি। একটি শূন্যে ভাসমান মনুষ্য আবাস বা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জলে ভাসমান নগরী। অচিরেই শুরু হয় শব্দ আর আলোর সাহায্যে এক অতি আশ্চর্য প্রদর্শনী যাতে অতীত থেকে ভবিষ্যতের ছবি ফুটে ওঠে, দেখা যায় জুলে ভার্নের কল্পিত ব্যক্তিগত মহাকাশ যান। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি ভবিষ্যৎবাদী আলবার্ট বোবিদা'র কল্পিত ১৯৫০ সালের প্যারিস নগরীর চিত্র, আর ১৯৩০ এবং ১৯৪০ সালে বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের বসবাসের জন্য ভবিষ্যতে কেমন বাসগৃহ তৈরি হবে বলে যা কল্পনা করেছিলেন তার ছবি।

তারপর শুরু হয় বর্তমানে মানুষ কী কল্পনা করছে তাই দেখানো—যাতে দেখানো হয়েছে ওমনিস্ফিয়ার—যেখানে মানুষের সৃষ্ট আবহাওয়ায় থার্মাল সিটি স্কেপ, যন্ত্রমানব বা রোবট তৈরির কারখানা। মাইক্রোচিপ বস্তুটির গঠনবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। সমুদ্রতলার রহস্য উদঘাটন এবং এখনকার বহু বিষয়ে অত্যাশ্চর্য

যান্ত্রিক উন্নতির নিদর্শন।

তারপর একবিংশ শতাব্দীর উন্নত জীবনের দৃশ্য—যখন বৃদ্ধরাও যুবকের মতো স্বাস্থ্যবান থাকবে, ঊষর মরুভূমিতে প্রচুর ফসল ফলবে। চৌম্বক শক্তির সাহায্যে স্বল্প ব্যয়ে যানবাহন চালানো যাবে, রোবট পাঠিয়ে সমুদ্রতল থেকে প্রচুর প্রয়োজনীয় মালমসলা সংগ্রহ করে আনা যাবে, আর মহাশূন্যে ভাসমান ল্যাবরেটরিতে মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় যেসব ক্রিস্টাল তৈরি করা যাবে তা দিয়ে নানারকম বস্তু নিখুঁতভাবে উৎপন্ন করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যতের পরিবেশ থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে ফিরে আসবার জন্য দর্শকদের যার যা পছন্দ তেমন বাহনে চাপবার জন্য দেওয়া হয় ডুবোজাহাজ, মরুভূমিতে ব্যবহারযোগ্য উড়ন্ত গাড়ি বা হোভারক্রাফট অথবা একটি মহাকাশযান।

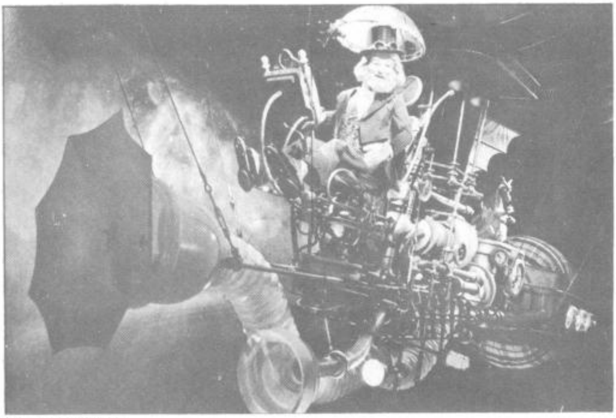

কল্পলোকের জটিল যান

কমিউনিকোর

এপকট সেন্টারের আর একটি মজাদার জায়গা হল কমিউনিকোর। এখানে পাশাপাশি দুটি অর্ধচন্দ্রাকার বাড়িতে এ-যুগের কমপিউটার ব্যবস্থার চূড়ান্ত প্রদর্শনীর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায় দর্শকেরা। এখানে দেখানো হয়, কীভাবে কমপিউটার এপকট সেন্টারের নানা বিস্ময়কর কাজ সম্ভব করছে। দর্শকদের হাতের ছোঁয়ায় নানা কমপিউটার সক্রিয় হয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়। এখানে একটি বড় রোবট অতিথিদের সঙ্গে কথা বলে। 'ফাউনটেন অব ইনফরমেশন' রঙিন আলোর স্রোতের ধারায় খবর লেখা লাইনগুলি ঝরনার মতো ঝরে পড়ে। একটি বৃহৎ গোলকের গায়ে ফুটে ওঠে আবার মিলিয়ে যায় কত চমৎকার ছুটি কাটাবার জায়গার চলমান ছবি। আরও আছে নানা বিষয়ের খবর জানাবার কত বিচিত্র ব্যবস্থা। এ-সবই এপকট সেন্টারের নিজেদের তৈরি।

জার্নি ইনটু ইমাজিনেশন

এই বাড়িটির আকৃতি অনেকটা ক্রিস্টালের মতো—ক্যামেরা ও ফিল্ম প্রস্তুতকারক কোডাক কম্পানি এটি উপহার দিয়েছেন। দর্শকেরা দু'জন করে একটি গাড়িতে বসে ভিতরে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পান এক স্বপ্নের জগৎ, যেখানে আকাশে রামধনুর রঙের বাহার, তার মধ্যে বিদ্যুতের চমক, আবার রং গুলে গুলে এক এক নতুন আকৃতি নিচ্ছে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে চোখে পড়ে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র এবং অন্য সৃষ্টিশীল চেতনার নানা অভিব্যক্তি। দর্শকেরা শুনতে পান ইলেকট্রনিক ফিলহারমোনিক বাজনা, আলোর তুলি বুলিয়ে ছবি আঁকা, এইসব স্বপ্নজগতের উদ্‌ভট চিন্তার বাস্তব রূপ। গলার স্বর শুনেও আলো সজাগ হয়ে রং পরিবর্তন করে। তা ছাড়া বাড়িটাও পিরামিডের মতো আকৃতির, ভিতরের স্টিল স্ট্রাকচার দেখে তাজ্জব বনে যেতে হয়। বাইরেও রোদ প্রতিফলনে চোখ ঝলসায়। বাগানের গাছগুলিও নানা আকারে ছাঁটা—চমৎকার দেখায়, তাই নাম—'ম্যাজিক গার্ডেন'।

দি ল্যান্ড

ছ' একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে এই গোটা অঞ্চলটিতে জমিতে ফসল ফলাবার বিচিত্র ব্যবস্থা দেখিয়েছেন ক্রাফট্ কম্পানি। আগেই বলেছি, এই 'ল্যান্ড' মণ্ডপের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে জলভরা খাল—যার দু'পাশ বাঁধানো, সেই খালে চলে যাত্রী নিয়ে খোলা নৌকো। নিঃশব্দে যন্ত্রে নৌকোগুলি খাল বেয়ে চলতে থাকে আর প্রতি নৌকোয় একজন করে ঘোষক দু'পাশের দর্শনীয় বিষয় বর্ণনা করতে থাকেন। দেখা যায় ঘন জঙ্গল, রোদভরা ধূসর মরুভূমি,

ইংরেজি 'এ' অক্ষরের মতো হেলানো দেওয়াল ও হাজার কামরার 'কনটেমপোরারি রিজর্ট'

তৃণময় প্রান্তর। এখানে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কী করে অবাধ ফলন করা যায় তার নিদর্শন আছে। কৃষি বিষয়ে আগ্রহীদের বহু জানবার বিষয় এখানে হাতে কাজ করে দেখানো হয়েছে। আছে গ্রিন হাউসে তৈরি দুর্লভ গাছের চারা। 'হার্ভেস্ট থিয়েটার' অঞ্চলে কুড়িটি দেশের চাষবাস দেখানো হয়েছে। আছে 'কিচেন ক্যাবারে'—যাতে নানা তরকারি ও ফলমূলের মডেল রীতিমত নাটকীয়ভাবে চলছে, বলছে, অতিথিদের মজা দেখাচ্ছে। তাদের নাচের সঙ্গে গান বাজনাও কি কম মজাদার ? এখানে টাটকা খাবারও পাওয়া যায়। মহাশূন্যে মানুষ বসবাস করলে সেখানেও যে তারা শাক-সবজি জন্মাতে পারবে তার প্রমাণ এখানে সম্পূর্ণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিমুক্ত পরিবেশে লেটুস গাছ জন্মানো। বিনা মাটিতে কৃত্রিম সার দিয়ে ফসল ফলাবার নিদর্শন তো দেখানো হয়েছে।

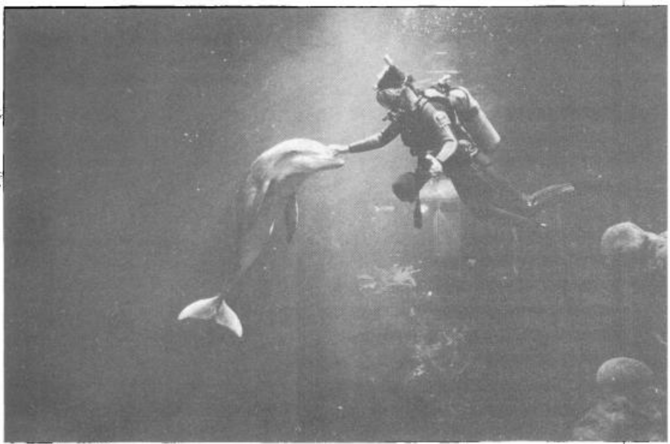

জলের নীচে ডলফিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব

দি লিভিং সিজ

সমুদ্রের জলের ঢেউ যেন আছড়ে পড়েছে এই বাড়িটির উপর—এমনই তার গঠন। জলে ভর্তি বিশাল আকারের কাচঘেরা ট্যাঙ্কের মধ্যে সমুদ্রতলের দৃশ্য চাক্ষুষ করবার এমন সুযোগ বিরল। এখানে জলমগ্ন প্রবাল পাহাড়ের গলিঘুঁজিতে বাস করে জীবন্ত সামুদ্রিক প্রাণীরা। ডুবুরিরা যাদের সঙ্গে ভাব জমায়। তাদের পেট ভরে খেতে দেয়। সামুদ্রিক প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা চলে। এখানকার কোরালরিফ রেস্টুরেন্টে সামুদ্রিক পরিবেশ দেখতে দেখতে চাখতে পাওয়া যায় নানারকম সি ফুড বা সামুদ্রিক খাদ্যবস্তু। সমুদ্র নিয়ে গবেষণা দেখানো হয়েছে, তাতে ডিজনির দানও কম নয়।

এপকট সেন্টারের এক অংশে এই প্রতিষ্ঠানগুলি আছে, তারপরেই অনেকটা জায়গা জুড়ে জলাভূমিকে এখন বিশাল হ্রদে পরিণত করা হয়েছে। সেই হ্রদে চলছে 'ফ্রেন্ডশিপ', অর্থাৎ ছোট ছোট জাহাজ—বন্ধুত্বের তরণী। সেই জাহাজে চেপে চলে গেলাম হ্রদের অন্য পারে। সেখানে পাকাপোক্ত পাথর ইট কাঠ দিয়ে তৈরি নানা দেশের নানা ধরনের সারি সারি ইমারত। সেখানকার রাজপথে বাসও চলে। সেই বাসে চেপে গিয়েছিলাম এপকট সেন্টারের মনোরেল স্টেশনে। মনোরেল চড়ে ডিজনি ওয়ার্ল্ডের ম্যাজিক কিংডম পৌঁছনো গেল।

> এপকট সেন্টারের একটি মজাদার জায়গা হল কমিউনিকোর। এখানে পাশাপাশি দুটি অর্ধচন্দ্রাকার বাড়িতে এ-যুগের কম্‌পিউটার ব্যবস্থায় চূড়ান্ত প্রদর্শনীর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায় দর্শকেরা। এখানে দেখানো হয়, কীভাবে কমপিউটার এপকট সেন্টারের নানা বিস্ময়কর কাজ সম্ভব করেছে।

ফাউনটেন অব ইনফরমেশন

হ্রদের ওপারে সারি সারি প্যাভেলিয়নে পাই মেকসিকো, চিন, জাপান, জার্মানি, ইতালি, মরক্কো, ফ্রান্স, ইউনাইটেড কিংডম এবং কানাডার নিজস্ব রীতিতে তৈরি বাড়ি, রেস্টুরেন্ট, কিউরিও শপ প্রভৃতি। এদের মধ্যে 'আমেরিকান অ্যাডভেঞ্চার' প্রদর্শনীটি সবচেয়ে বড়।

একটু সময় নিয়ে বিভিন্ন দেশের বাড়িগুলি ঘুরে দেখলে ওই দেশের নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় এবং ইচ্ছে করলে ওখানকার কিউরিও শপ ঘুরে ওইসব দেশের নিজস্ব শিল্পকর্ম সংগ্রহ করায় যায়।

মাত্র সাত বছর আগে তৈরি এপকট সেন্টার ডিজনির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যদি তিনি অকালে মারা না যেতেন তবে হয়তো আরও কোনও নতুন সেন্টার তৈরি করতেন যা দিয়ে মানবসভ্যতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বিরল প্রতিভাধর ওয়াল্ট ডিজনি'র কথা মনে করলে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে।

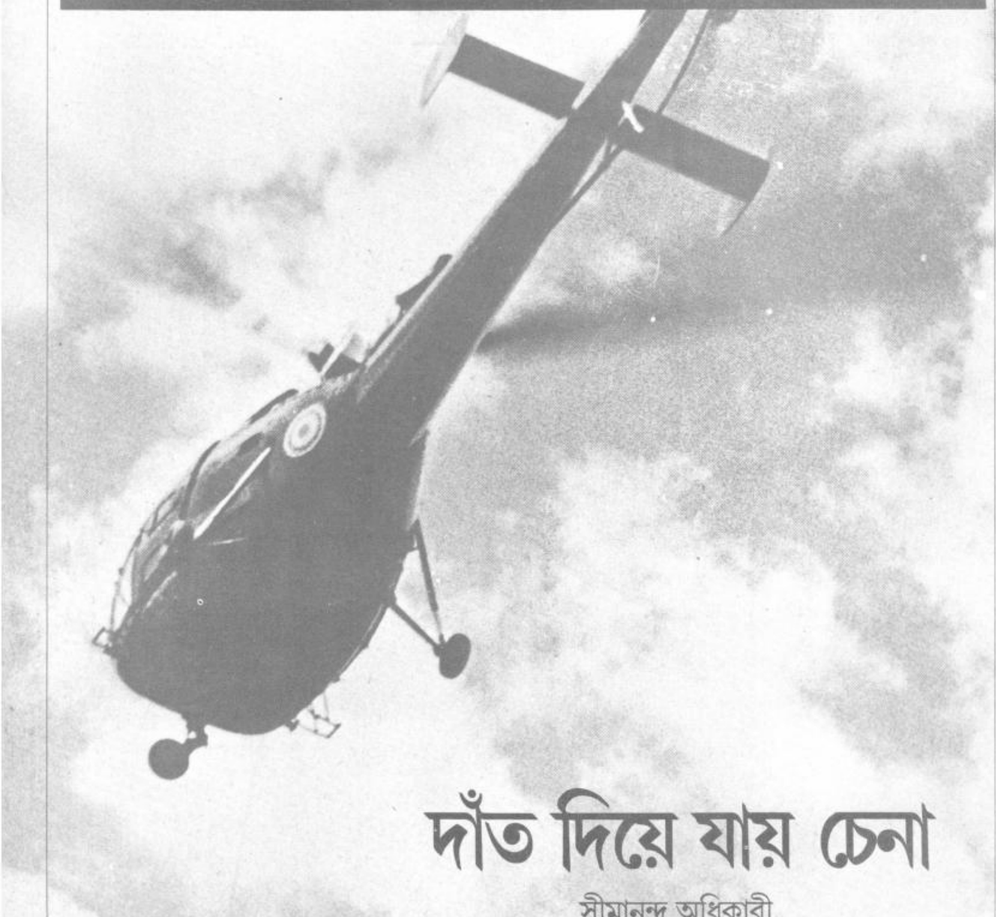

দাঁত দিয়ে যায় চেনা

সীমানন্দ অধিকারী

দ্বিরদ নির্মিত দ্বারে দ্বারী দ্বিরদ।
১,০,০,৩/ ১,০,০,৩

কীরকম যেন রহস্য-রহস্য লাগছে! গুপ্তধনের সঙ্কেত? রহস্যভেদ করার জন্য কোনও রহস্যভেদীকে ডাকতে হবে? না, তার বোধহয় দরকার নেই। একটু চেষ্টা করলেই পারা যাবে। তবে একটু সঙ্কেতের দরকার। প্রথম বাক্যটার জন্য একটা বাংলা থেকে বাংলা অভিধান আর দ্বিতীয় লাইনের সংখ্যাগুলোর জন্য প্রাণিবিদ্যার কোনও বই।

প্রথম লাইনের শব্দগুলো অনুপ্রাসের একটা সুন্দর নিদর্শন। অনুপ্রাস হল বাক্য বা কাব্যের গয়না, যেখানে একই ধ্বনি উৎপাদক অক্ষরের বারবার ব্যবহার হয়। রদ মানে দাঁত। দ্বিরদ মানে দুটো বিশেষ দাঁত ধারণ করে এমন প্রাণী, অর্থাৎ হাতি। সুতরাং বাক্যটার মানে হল হাতির দাঁতে তৈরি দরজায় দ্বাররক্ষক হাতি।

আর দ্বিতীয় লাইনের সংখ্যাগুলো হল দাঁতের ফরমুলা। এই ফরমুলায় পড়ে হাতি। অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর দাঁত আছে। দাঁতগুলো ওপরের আর নীচের মাড়িতে বসানো। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর বর্গ নির্ধারণে এই ফরমুলা অভ্রান্তভাবে কাজ করে। এ একরকম দাঁত দিয়ে চেনা। সেজন্য এক বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী একবার বলেছিলেন, আমাকে

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যুগে হাতির কেন এই কষ্ট

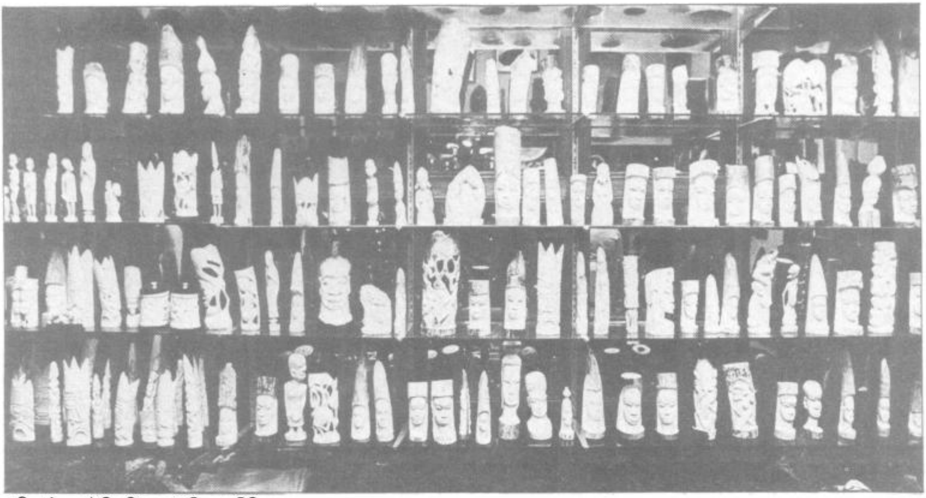

হাতির দাঁতের শৌখিন শিল্পদ্রব্য তৈরি এখন নিষিদ্ধ

শুধু একটা দাঁত এনে দাও। দাঁত পরীক্ষা করে আমি বলে দেব, প্রাণীটা কী এবং কী খায়!

স্তন্যপায়ীদের দাঁতের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এদের দাঁতের গোড়া মাড়িতে প্রোথিত এবং দাঁতগুলোর মধ্যে প্রকারভেদ আছে। এ ছাড়াও আছে দু'বার দাঁত গজানো। মানুষের (সেই অর্থে স্তন্যপায়ীর) চাররকমের দাঁত থাকে। সামনে থেকে পেছনে এরা হল যথাক্রমে ছেদক, শ্ব-দন্ত, পুরঃ-পেষক এবং পেষক। মানুষের দাঁতের ফরমুলা হল ২, ১, ২, ৩/ ২, ১, ২, ৩। এই ফরমুলায় বলা হয়েছে মানুষের ওপরের আর নীচের মাড়ির প্রতি অর্ধাংশে দুটো ছেদক, একটা শ্ব-দন্ত, দুটো পুরঃ-পেষক এবং তিনটে পেষক দাঁত আছে। অর্থাৎ প্রতি মাড়ির অর্ধাংশে আটটি (২+১+২+৩=৮) দাঁত। এই সংখ্যাকে চার দিয়ে গুণ করলে দাঁতের মোট সংখ্যা হবে ৩২ (৮×৪=৩২)। কারও ওপর রেগে গেলে তার বত্রিশ পাটি দাঁত ভেঙে দেওয়ার বাসনা অনেকেরই হয়। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে মানুষের বত্রিশটা দাঁত থাকবার কথা হলেও অধিকাংশ মানুষের বত্রিশটা দাঁত থাকে না। সাধারণত মানুষের আঠাশটা দাঁত থাকে। বাকি চারটে দাঁত মাড়ির ভিতরে থাকে, দেখা যায় না। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে ওই সুপ্ত দাঁতগুলোর মধ্যে দুটো বা একটা মাথা চাড়া দেয় এবং তখনই ঝঞ্ঝাট বাধে। নিষ্ঠুর এই মাথাচাড়া দেওয়া দাঁতকে বলা হয় 'আক্কেল দাঁত' বা 'উইজডম টুথ'।

আসলে বিবর্তনের ধারায় মানুষের দাঁতের সংখ্যা কমছে। মানুষের দাঁতের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্থানাভাব। মানুষের বিবর্তনের ধারায় মানুষের চোয়াল ক্রমে ছোট হচ্ছে। আর চোয়াল ছোট হওয়ায় দাঁত থাকবার জায়গা হচ্ছে না। ফলে মানুষের দাঁতের সংখ্যা কমছে।

এখন হাতির দাঁতের ফরমুলায় দেখা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটা জায়গায় শূন্য রয়েছে। ফরমুলায় যেখানে যেখানে শূন্য থাকে সেই জায়গায় যে দাঁতের থাকার কথা তা থাকে না। সেই জায়গায় শূন্য বসিয়ে না-থাকা দাঁত নির্দেশ করা হয়। যেমন হাতির দাঁতের ওপরের দাঁতের ফরমুলায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে শূন্য। এর অর্থ হল হাতির ওপরের মাড়ির অর্ধাংশে একটা ছেদক থাকে, শ্ব-দন্ত এবং পুরঃ-পেষক থাকে না; কিন্তু তিনটি পেষক দাঁত থাকে। নীচের মাড়ির অর্ধাংশে আবার ছেদক দাঁতও থাকে না।

হাতির অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা হল

হাতির দাঁতের দুর্মূল্য শিল্পসামগ্রী

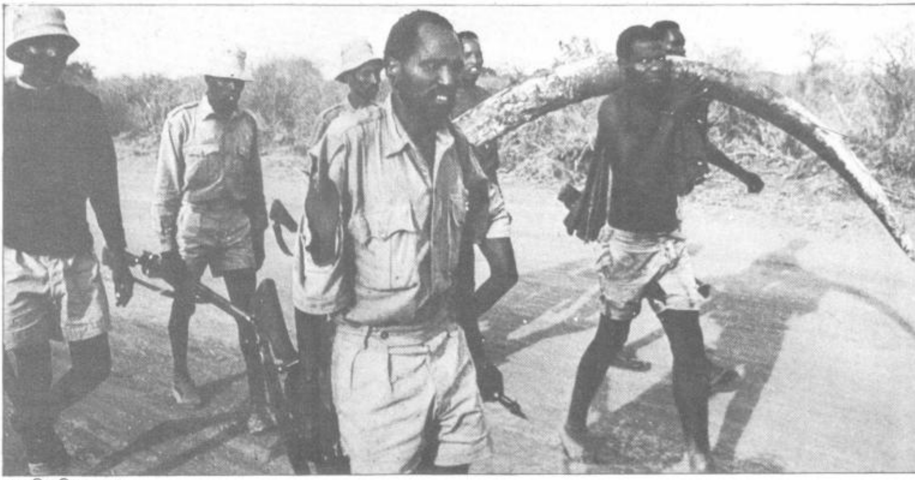

চোরাশিকারিদের ***সংগ্রহ***

তার গজদন্ত। হাতির ওপরের মাড়ির প্রতি অর্ধাংশে একটা করে ছেদক দাঁত থাকে। এই ছেদক দাঁত ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং বেড়ে যে বিরাট কলেবর ধারণ করে সেটাকেই গজদন্ত বলে। আফ্রিকার স্ত্রী-পুরুষ উভয় হাতিরই গজদন্ত থাকে। কিন্তু ভারতীয় হাতিদের মধ্যে কেবল পুরুষ-হাতির গজদন্ত থাকে। মেয়ে-হাতির ছেদক দাঁত থাকে, কিন্তু সেটা বেড়ে না ওঠায় গজদন্ত হতে পারে না। গজদন্ত আদৌ গজায় না।

গজদন্তের রেকর্ড ওজন প্রায় একশো কিলোগ্রাম এবং লম্বায় দেড়শো সেন্টিমিটার। তবে গজদন্তের গড় ওজন পুরুষ-হাতির ক্ষেত্রে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম এবং স্ত্রী-হাতির ক্ষেত্রে পনেরো কিলোগ্রাম। এইভাবে দু'শো কিলোগ্রামের দাঁতের ভার মুখে নিয়েও হাতি মাথা উঁচু করে গজেন্দ্রগমনে চলে। হাতি গজদন্ত দিয়ে গাছের ছাল ছাড়ায়, তারপর শুঁড় দিয়ে সেই ছাড়ানো ছাল পেটে চালান করে। অধিকাংশ হাতি ডান দিকের দাঁতটা বেশি ব্যবহার করে। যেমন আমরা সচরাচর ডান হাত বেশি ব্যবহার করি। কিছু হাতি বাঁ দিকের দাঁত বেশি ব্যবহার করে। অর্থাৎ বাঁ হাতি মানুষের মতো বাঁ-দাঁতি হাতিও হয়।

মানুষ হাতির দাঁতের মর্যাদা ইতিহাস-পূর্ব যুগেই বুঝেছিল। কেননা হাতির দাঁতের আইভরি অংশের ব্যবহারের নিদর্শন ইতিহাস-পূর্ব যুগ থেকেও পাওয়া গেছে। রাজা সলোমানের হাতির দাঁতের তৈরি সিংহাসন, ইজিপ্টে ঘরের মেঝে তৈরিতে আইভরির ব্যবহার বা আসিরীয় রাজত্বে হাতির দাঁতের ওপর খোদাই করা কাজ এই সত্যকে প্রমাণিত করে। হাতির দাঁতের আইভরি অংশ দিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার বল, ছড়ি, পিয়ানোর চাবি, ছুরি, ছাতার বাঁট, দাবার ঘুঁটি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এ ছাড়া হাতির দাঁতের ওপর খোদাই করে নানা শিল্পদ্রব্যও তৈরি হয়। সাদা সোনা গজদন্তের অর্থকরী মূল্য অনেক। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত লন্ডনে এই সাদা সোনার এক বিরাট বাজার ছিল। এখন এই বাজারের রমরমা কম। এখানে বছরে ৫,৫০,০০০ টন গজদন্তের বেচাকেনা চলত। এই পরিমাণ গজদন্ত জোগাড় করতে ৬ হাজার হাতির প্রয়োজন। স্বাভাবিক মৃত্যু বাদ দিলেও বেশ কয়েক হাজার হাতি এই কারণেই চোরাগোপ্তা শিকারের বলি হত। সুখের কথা, বর্তমানে হাতির দাঁতের আইভরি দিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার বল তৈরি হয় না। আজকাল

অবাধে এভাবে আর হাতিশিকার করা যাবে না

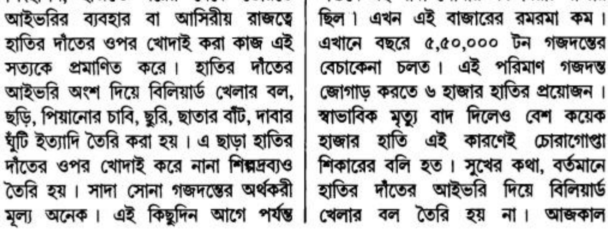

বিলিয়ার্ড বল তৈরি হয় বেনজোলিন নামে এক ধরনের প্লাস্টিক থেকে।

ভারতীয় হাতির গজদন্তের তুলায় আফ্রিকার হাতির গজদন্তের আইভরি অনেক উন্নত মানের। সুতরাং লন্ডনের বাজারে যে গজদন্তগুলো আসে তার উৎস আফ্রিকা। সেইজন্য স্বাভাবিক কারণেই সোনার খনির মতো হাতির দাঁতের খনি আছে এইরকম একটা কথা চালু আছে। আর কেবলমাত্র আফ্রিকাতেই আছে এই সাদা সোনার খনি। স্টানলি আর লিভিংস্টোনের পর যে-সমস্ত শিকারি আফ্রিকায় শিকার সেরে ইউরোপে ফিরে আসতেন তাঁরাই এই খনির অস্তিত্বের কথা প্রচার করতেন। একই জায়গায় এবং একইসঙ্গে এত হাতির দাঁত থাকার কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া হত যে-হাতির মৃত্যু আসন্ন সে দল ছেড়ে কোনও গোপন জায়গায় গিয়ে মারা যায়। এক জায়গায় বহু বছর ধরে বহু হাতির মৃত্যু হয়ে হাড় আর দাঁতের পাহাড় তৈরি হয়। এই জায়গাই হচ্ছে সাদা সোনার খনি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও সাদা সোনার খনি আবিষ্কার করা যায়নি। আসলে এরকম কোনও খনি হয় না। হাতি যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ সে নিজেই খনি আর মারা যাওয়ার পর যেখানে সে মারা যায় সেই জায়গাটাই হয়ে ওঠে খনি।

গজদন্ত বাদ দিলে হাতি বেঁচে থাকে, কিন্তু গজদন্ত ছাড়া হাতির ওপরের আর নীচের চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে যে তিনটে করে পেষক দাঁত আছে সেগুলো না থাকলেই হাতির ভবলীলা সাঙ্গ হয়। এককথায় যতদিন পেষক দাঁত আছে ততদিনই হাতির জীবন আছে। কিন্তু হাতি বাঁচে ক' বছর? মোটামুটি হিসেবে জানা গেছে হাতি ৭৫ থেকে ৮০ বছর বাঁচে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে হাতি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে। ধারণাটা বোধ হয় ঠিক নয়।

হাতির পেষক দাঁতের বৈশিষ্ট্য আছে। এরা আকারে বড়, দৈর্ঘ্যে পনেরো ইঞ্চি, প্রস্থে চার ইঞ্চি। শুধুমাত্র বড় হয়ে এরা ক্ষান্ত হয়নি। হাতির জীবদ্দশায় এরা ছ'বার গজায়। হাতি ছাড়া অন্যসব দাঁতওলা স্তন্যপায়ীর দাঁত দু'বার গজায়।

একটা হাতি সে স্ত্রী অথবা পুরুষ যাই হোক, দিনের মধ্যে ১৬ ঘণ্টা খায়। খেয়েই চলে। নিজের বিরাট বপুকে বহাল রাখতে একটা পূর্ণবয়স্ক হাতি দিনে ২০০ থেকে ২৫০ কেজি ঘাস, পাতা, গাছের ছাল, ফল ইত্যাদি খায়। এত পরিমাণ খাদ্যবস্তু চিবোতে-চিবোতে হাতির পেষক দাঁত ক্ষয়ে যায়। ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলোকে ঠেলে মাড়ির ভিতরে থাকা আর-এক প্রস্থের দাঁত মাথা চাড়া দেয় ২৫ বছর বয়সের মধ্যে। এইভাবে হাতির চার প্রস্থ দাঁত ওঠে। পঞ্চম প্রস্থ দাঁত ওঠে ২৫ বছর বয়স হওয়ার পর। এবং পঞ্চম প্রস্থ দাঁত থাকে প্রায় দশ বছর। ৩৫ থেকে ৪০ বছর বয়সে ওঠে ছ'বার বা শেষবারের দাঁত। এই সবশেষে ওঠা দাঁত বছর-চল্লিশ ধরে দিনে ১৬ ঘণ্টার কাজ করে পড়ে যায়। এর ফলে হাতি খেতে পারে না। সুতরাং আশেপাশে খাবার থাকলেও খেতে না পারার জন্য হাতির অনাহারে মৃত্যু হয়। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে হাতি দল থেকে সরে যায়। দাঁত না থাকলেও শেষ সময়ে জল খেতে পারবে এই ভরসায় হাতি পুকুর, নদী, হ্রদ বা কোনও জলাশয়ের ধারে আস্তানা গাড়ে। তারপর ধীরে-ধীরে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

সুতরাং বলা চলে হাতির জীবন পেষক দাঁত নির্ভর জীবন।

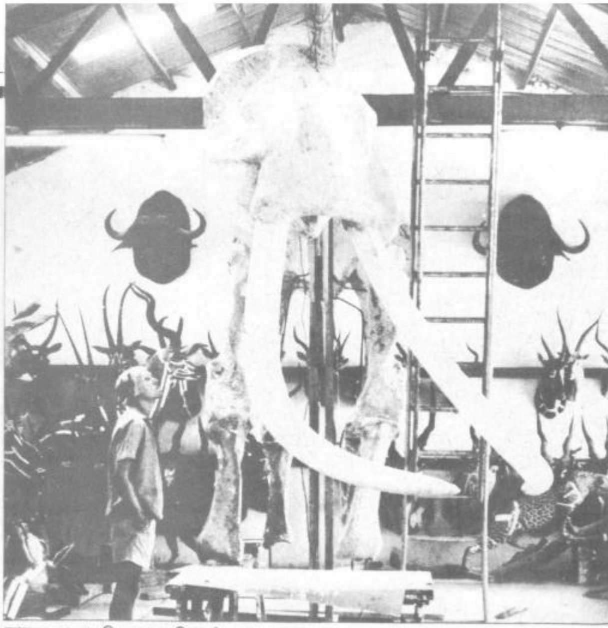

জাদুঘরে জাম্বো হাতির মাথার খুলি ও দাঁত

আফ্রিকার হাতির দাঁত অনেক উন্নত মানের

জীবনের নানা ওঠাপড়া যেন সহজে গায়ে না লাগে...

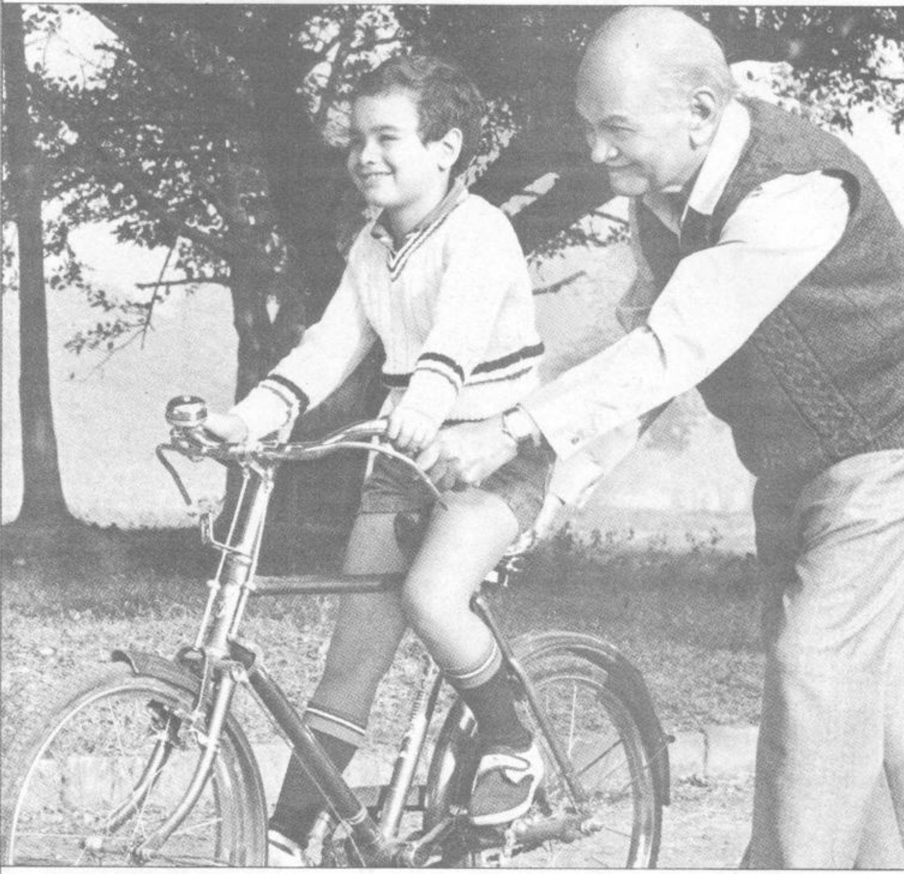

তাই হাত বাড়ালেই বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

শুষ্ক ত্বক ও সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়

ষাট বছর আগে প্রথম আজও প্রথম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস
কলকাতা ৭০০০৫৩

বোরোলীন প্রসাধন সামগ্রী নয়

Response 1038

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সোনার গণপতি হিরের চোখ

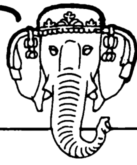

বিল্টু ও শুভঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে সাবান মেখে সাবানের ফেনায় গা-মাথা সব ভরিয়ে স্নান করল। ওঃ, যা ধুলো লেগেছে গায়ে। এবার শুধু ছেনি-হাতুড়ি ঠুকে ঠিক জায়গা থেকে ঠিক জিনিসটিকে বের করে নেওয়া। কিন্তু যা ওরা ভাবল তা কার্যকর হল না। তার কারণ কাকিমা ওদের খাবার জন্য ডাকলেন।

তিন্নি বাগান থেকে সাজি-ভর্তি ফুল নিয়ে ওপরের ঘরে চলে গেল। করবী, চাঁপা, গন্ধরাজ, কত ফুল।

বিল্টু আর শুভঙ্কর গেল খেতে। বিল্টু অবশ্য আপত্তি করেছিল খাবার ব্যাপারে। কিন্তু কাকিমা শুনলেন না। বললেন, "বেলা একটা বাজে। আর দেরি নয়। আগে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকোও, তারপর যা ইচ্ছে করোগে যাও। ওই একটা ছেলে, প্রথম এসেছে এ-বাড়িতে। কী ভাববে কী ও?"

শুভঙ্কর বলল, "কাকিমা ঠিকই বলছেন বিল্টু। খাওয়াদাওয়ার পাটটা আগেই বরং চুকিয়ে নেওয়া যাক। তারপর ভেবেচিন্তে কাজ করা যাবে। সারাটা দুপুর তো রইলই আমাদের জন্য।"

"বলছিস? চল তবে। খাওয়াদাওয়াটাই সেরে নিই।"

ওরা স্নান করে আর ওপরে না গিয়ে তিন্নিদের ঘরেই এল। এখানেই ব্যাগ-ট্যাগগুলো রাখা ছিল ওদের। তা থেকেই পাজামা-পাঞ্জাবি বার করে পরে নিল ওরা।

দাওয়ায় আসন পেতে কাকিমা খেতে দিলেন ওদের। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন, "দুষ্টু মেয়েটা, কোথায় যে গেল। সকাল থেকে ঘুরছে। একটু হাতাপাতি করলে কখন হয়ে যেত সব কিছু।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার বোনের ব্যাপারে এই সব বলবেন না কাকিমা। ও কিন্তু সারাক্ষণ আমাদের কাছে-কাছেই আছে।"

"না না। এতখানি বেলা হল, এবার নিজেও তো চান-টান সেরে নিতে পারে।"

বিল্টু বলল, "আসলে ওকে আমরা একটা কাজ দিয়েছি। ও ওপরের ঘরে বসে দাদুর ছবিতে পরাবে বলে মালা গাঁথছে।"

"তাই নাকি! তা এতদিন বাদে হঠাৎ দাদুর ওপর এত দরদ কেন? তাঁর অমন সাধের বাড়িই তোমরা বিক্রি করে দিচ্ছ?"

"সেইজন্যই তো এ-বাড়িতে আমরা তাঁর শেষ পূজা করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কাকিমা।"

"তা বেশ করছ বাবা। তোমাদের ভাল হোক। তোমরা সুখী হও। বাড়ি বিক্রি হলেও আমাদের যেন ভুলে যেও না। মাঝে-মধ্যে এসো। এসে থেকে যেও। দু' বন্ধুতেই এসো, কেমন?"

শুভঙ্কর বলল, "ও না আসুক, আমি তো আসবই। ভাইফোঁটার দিন তিন্নির হাতে ফোঁটা নিতে হবে না?"

কাকিমা হেসে বললেন, "নেবে বইকী বাবা। নিশ্চয়ই নেবে। তোমার বাবা-মাকেও নিয়ে আসবে। আমাদের গরিবের ঘর হলেও থাকার জায়গার অভাব হবে না এখানে। ধলভূমগড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে তো? যে-কোনও মানুষের মন ভরে যাবে। তা ছাড়া এখানকার জলহাওয়াও কত ভাল। দিন কতক থাকো, তা হলেই বুঝবে। চেহারা ফিরে যাবে।"

বিল্টু বলল, "কাকিমা! আজ দুপুরের জন্য তিন্নিকে আমরা চেয়ে নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে। ওকে যেন কোনও কাজ দেবেন না। আজ ও সারা দুপুর আমাদের কাছে থাকবে। আজ আমরা ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে শুধু দাদুর কাছে প্রার্থনা করব যেন এই বাড়ি কোনওমতেই বিক্রি না হয়।"

কাকিমা বললেন, "বেশ। তাই কোরো। তোমাদের অন্তরের ডাক যদি তাঁর কানে পৌঁছয়, তা হলে নিশ্চয়ই তাঁর আশীর্বাদে এ-বাড়ি রক্ষা পাবে।"

ওরা খাওয়াদাওয়া সেরে মুখ-হাত ধুয়ে ও-বাড়িতে চলে গেল। ওপরে উঠে দেখল তিন্নি তখন দিব্যি ছুঁচ-সুতো নিয়ে মালা গাঁথতে বসে গেছে। ওদের দেখে বলল, "কী! এত দেরি করলে যে? চান করতে এত সময় লাগে?"

বিল্টু বলল, "একেবারে স্নান-খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়ে চলে এলাম। তুইও যা। এখন মালা গাঁথা রাখ। আগে স্নান-খাওয়া সেরে নে। আমি কাকিমাকে বলে এসেছি, আজ সারা দুপুর তুই এখানে থাকবি।"

তিন্নি বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। তবে একটা কথা, আমি না-আসা পর্যন্ত দেওয়াল ভেঙে গণেশ ঠাকুরকে বার কোরো না যেন! তা হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে।"

বিল্টু বলল, "না রে বাবা, না। যা করব আমরা তিনজনেই করব। তুই খেয়ে আয়।"

"বাবার খাওয়া হয়েছে?"

"তা তো বলতে পারব না। ঘরে শুয়ে আছেন দেখলাম। তুই যা।"

তিন্নি বলল, "যাচ্ছি।" বলে অসমাপ্ত মালা গাঁথার কাজ ফেলে রেখে কোনও একটি গানের কলি গুনগুন করতে করতে নীচে নেমে গেল।

ফুলের সুগন্ধে ঘরের ভেতরটা তখন মম করছে।

বিল্টু টেনে-টেনে দু'-একবার নিশ্বাস নিয়ে বলল, "আঃ। শুভ রে। আমার দু' চোখ জুড়ে যত রাজ্যের ঘুম যেন নেমে আসছে এবার।"

শুভঙ্কর বলল, "সে তো আসবেই। কাল সারাদিনে ধকলটা কি কম গেছে? তার ওপর রাত জাগা। আজও সকাল থেকে পরিশ্রমটা কম কী হল? বেলা দুটো বাজে। পেটে ভাত-জল পড়েছে। ঘুমের আর দোষ কী বল?"

"একটু ঘুমিয়ে নেব?"

"সে কথা বলতে। আগে ঘুম, তারপরে অন্য কিছু। তুই একটু ঘুমিয়েই নে। তিন্নি স্নান-খাওয়া করে আসুক। তারপর একটু দেরি করেই না হয় কাজে লাগা যাবে।"

বিল্টু বলল, "তুই ঘুমোবি না?"

"না। তুই তো জানিস, আমি দিনের বেলায় ঘুমোতে পারি না। তা ছাড়া কাল সারারাত যা ঘুমিয়েছি, তাতে আজ আর আমার চোখে ঘুম নেই। তুই ঘুমো। আমি বরং জেগে থাকি। তিন্নির প্রতীক্ষা করি। ও আসুক। মালা গাঁথুক। তারপর ডাকব তোকে।"

বিল্টু বলল, "তাই ডাকিস। আমি আর থাকতে পারছি না।" বলেই হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পাশ ফিরল তারপর দু' চোখ বুজেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আর শুভঙ্কর! সে বেচারি শুয়ে-শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে কত কী চিন্তা করতে লাগল। গণপতি উদ্ধার তো হবেন, তারপর? আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিল্টুকে কথাও তো দিয়ে দিল যাবে বলে কিন্তু কীভাবে যাবে? টাকার ব্যবস্থা কী করে করবে? অথচ যেতে ওকে হবেই। কেননা, তিন্নি যেখানে যাবে সেখানে ওর না গেলে মান থাকে না। এইসব চিন্তা করতে করতে একসময় কী ভেবে যেন উঠে দাঁড়াল ও। তারপর ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে পড়ল ওপরের ছাদে। এখান থেকে ধলভূমগড়ের অরণ্য-প্রকৃতি ওর মন-প্রাণ কেড়ে নিল। বৃষ্টিস্নাত গাছপালাগুলোর ওপর রোদের ছটা কী অপরূপ। আর দূরে বহুদূরের ওই পাহাড়মালা ওকে যেন পাগল করে তুলল। কাল-পরশুর মধ্যে যেভাবেই হোক ওকে কোনও একটা পাহাড়ে উঠতেই হবে। ধারাগিরি না কী যেন, সেখানে ও যাবেই। সিংভূম জেলার এই অরণ্য-সৌন্দর্য ওকে যেন পাগল করে তুলেছে। আজ গণপতির মূর্তিটা উদ্ধার হলেই চেষ্টা করবে কাল দেখাশোনার পাটটা চুকিয়ে নিতে। তারপর মূর্তিটাকে সামলে নিয়ে ভালয়-ভালয় বাড়ি ফিরতে পারলেই নিশ্চিন্দি। পরে টাকা-পয়সা জোগাড় হলে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে ওদের মানসযাত্রা।

শুভঙ্কর সেই প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যের কল্পনায় বিভোর হয়ে কতক্ষণ তন্ময় হয়েছিল কে জানে? তিন্নির ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল। কিন্তু পিছু ফিরেই অবাক। আরে! এ কে! এই শ্যামল সবুজ প্রকৃতির উপত্যকায় দূরে দূরান্তরে সার্কাসের তাঁবুর মতো লাল মাটির ঢেউ খেলানো ফ্রেমের মধ্যে আটকে-পড়া কে ও? তিন্নির সঙ্গে যেন দূর দিগন্ত থেকে একটি শ্বেত কবুতর উড়ে এসে ছাদে বসেছে। বিধাতাপুরুষ তাঁর তুলির টানে যে মুখ এঁকেছেন তার বুঝি তুলনা নেই। আর ওই চোখ দুটো? অমন সুন্দর চোখ তো কখনও দ্যাখেনি ও। কী সুন্দর সহজ সরল নিষ্পাপ ও শুচি স্নিগ্ধ। সাদা ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন সুদূর আকাশ থেকে হংস বলাকার একটি পালক খসে পড়েছে। জল ভরা দিঘির বুকে ফুটে থাকা পদ্মের মতো মুখখানি তার প্রস্ফুটিত। কিন্তু সেই অপরূপ রূপের মাঝে সৌন্দর্যে ভরা মুখ-চন্দ্রিমায় যেন এক কালো মেঘের করাল ছায়া। দেখলেই বোঝা যায় গভীর সমুদ্রে হাল-ভাঙা নাবিকের মতো সে অসহায়। অথবা ঝোড়ো হাওয়ায় এক ক্লান্ত-ডানা চিল।

শুভঙ্কর ওর দিকে গভীর সহানুভূতি নিয়ে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "জানি, তুমি কে।"

মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল। চোখ তো নয় যেন কালো জলের দিঘির বুকে ঝুঁকে থাকা নারকোল পাতা।

শুভঙ্কর বলল, "তুমি মউ। তোমার কথা কাল থেকে তিন্নির মুখে আমি অনেক শুনেছি। মউ ছাড়া আর কেউ তুমি হতেই পারো না।"

মউয়ের দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল এবার।

মউ দু' হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "তুমি তো শুভঙ্কর! তাই না?"

শুভঙ্কর বলল, "হ্যাঁ, আমিই শুভঙ্কর।"

"তোমার বাবা ডি· এস· পি?"

"হ্যাঁ।"

মউয়ের দু' চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল এবার। ফোঁস করে ফণা তুলে বলল, "তাঁর ছেলে হয়ে তুমি এমনই অপদার্থ যে, হাতের কাছে রিভলভার পেয়েও সেটাকে তুমি কাজে লাগাতে পারলে না? বিল্টুদার মতো তোমারও যদি রুখে দাঁড়াবার মেরুদণ্ড থাকত, তা হলে আজ আমি আমার বাবাকে হারাতাম না তা জানো?"

এ-কথার উত্তরে কী-ই বা বলবে শুভঙ্কর? সত্যিই তো। শিকারি বাজের হাত থেকে রিভলভারটা যখন খসে পড়েছিল, তখন যদি ভয়ে জড়োসড় হয়ে না থেকে সে সেটাকে কুড়িয়ে নিত, আর শিকারি বাজকে লক্ষ্য করে ট্রিগারটা টিপে দিত, তা হলে এই ফুলের মতো মউ আজ পিতৃহীন হত না।

শুভঙ্কর বলল, "আসলে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম তখন। কী যে করা উচিত তা মাথায় আসছিল না।"

মউ তেমনিই রুষ্ট স্বরে বলল, "তার মানে তোমার ভেতরে বিদ্রোহের আগুন নেই। তুমি রুখে দাঁড়াতে জানো না। অবশ্য ওই বীজ সকলের মধ্যে থাকে না। ওটা সহজাত। তা যাক, তোমার কাছে একটাই অনুরোধ আমার। তুমি যেন বড় হয়ে পুলিশের চাকরি নিতে যেও না। তা হলে অপরাধীর বদলে কিছু নিরীহ লোক ধরা পড়ে মারধোর খেয়ে মরবে।"

ঠিক এই ধরনের খোঁচা খেতে শুভঙ্কর অভ্যস্ত নয়। তাই লজ্জায় অপমানে ওর ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল। বাবার পদমর্যাদার সম্মানের ভাগ এতদিন সর্বত্রই পেয়ে আসছিল শুভঙ্কর। কিন্তু কোথা থেকে এই মেয়েটা এসে, বিশেষ করে তিন্নির সামনে কী যা তা বলল ওকে। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না সে।

মউ আবার বলল, "তিন্নির মুখে আমি সব কথা শুনেছি। তাই কয়েকটা কথা তোমাকে বলব বলেই ছুটে এসেছি। অবশ্য বলেই বা লাভ কী? আমরা তোমার কে? আমার বাবা তো তোমার বাবা নন। তোমার বাবা যদি ওইরকম অসহায় অবস্থায় পড়তেন, তা হলে তুমি নিশ্চয়ই ওইরকম চুপ করে থাকতে না। কোথাকার কে এক স্কুল-মাস্টার। তাঁর পরিবার পথে বসলে একজন ডি· এস· পি'র ছেলের কীই বা আসে-যায়?"

তিন্নি এবং শুভঙ্কর দু'জনেই নীরব।

মউ বলল, "বিশেষ করে আজ সকালে ওই খুনিদের দু'-দু'জনকে হাতে পেয়েও তুমি ছেড়ে দিলে কী বলে?"

শুভঙ্কর বলল, "সত্যিকথা বলতে কি, আমি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ জানি। কিন্তু কখনও করিনি। তাই ভয় হয়। রাস্তার কুকুর তো নয়, যে হুট করতেই মেরে দেব। মানুষ বলে কথা!"

মউ যেন বোমার মতো ফেটে পড়ল এবার। বলল, "ওদের তুমি মানুষ বলো? ওই খুনিদের মানুষের মর্যাদা দাও তুমি? ছিঃ।"

"না। তা দিই না, তবে…"

"তবে-টবে কিছু নয়। আসলে তুমি একটা…।"

শুভঙ্করের মাথাটা হেঁট হয়ে গেল।

তিন্নি এবারে ওর অবস্থাটা বুঝে বলল, "কী হচ্ছে কী মউ! কাকে কী বলছিস তুই? যেখানে কামরাসুদ্ধু লোক ভয়ে চুপ করে বসে আছে, সেখানে একা শুভদা কী করতে পারেন বল?" তারপর শুভঙ্করকে বলল, "আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না শুভদা। আজ ওর মাথার ঠিক নেই।"

শুভঙ্কর বলল, "না। ওর যা মুখে আসে তাই বলুক, যা প্রাণে চায় তাই করুক। তবে আমি ওকে কথা দিচ্ছি একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের রক্ত যদি আমার শরীরে সত্যিই বয়ে থাকে, তা হলে আমি কী তা আমি ওকে দেখিয়ে দেব। আমি দু'-দু'বার সুযোগ হাতছাড়া

করেছি। আর করব না।"

মেঘ ভাঙা রোদের মতো মউয়ের রাগী মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল এবার। বলল, "শাব্বাশ। এই তো চাই। আমি তোমার মতো একজনকেই মনে-মনে খুঁজছিলাম এতদিন। যার ফণা আছে, যাকে খোঁচা দিলে ফোঁস করে। যার রক্তে বারুদ আছে। একটা দেশলাই কাঠি ধরিয়ে দিলেই যে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই তাকেই আমি পেয়েছি। শুভঙ্কর! তুমি ছেলেমানুষ। আমিও এমন কিছু বড় হইনি। আমার গায়ের রং দেখেছ তো? কিন্তু আমার মনের আগুন যে কত দ্বিগুণ তা কেউ জানে না। সেই আগুনের শিখাকে আমি দাবানল করে তুলতে চাই। আমাকে আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে শুভঙ্কর। আমার দেহ-মন-প্রাণ সেই হত্যাকারীর রক্তপিপাসায় তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। ওকে আমার চাই। শিকারি বাজকে আমি চনি না। তবে এখানকার সন্ত্রাস সে। কয়েক বছর ধরে পুলিশ প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষকে ভয়ঙ্কর রকম জ্বালিয়ে মারছে। তাকে আমি দেখিওনি কখনও। তোমরা দেখেছ। বিল্টুদা, তুমি। তাই আমি তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। তোমরা আমাকে চিনিয়ে দাও কে সেই শিকারি বাজ। আমি তাকে হত্যা করব।"

শুভঙ্কর বলল, "বেশ তো দেব। কিন্তু কোথায় পাব তাকে?"

"এখানেই পাবে। সে আমাদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে।" বলেই ছোট্ট একটি ধারালো ছুরি বার করে বলল, "এই দ্যাখো, কী জিনিস আমি সঙ্গে রেখেছি। ওর গলার নলিটাকে দু'ফাঁক করে দেওয়ার পক্ষে এইটাই কী যথেষ্ট নয়?"

শুভঙ্কর বলল, "অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে আমিও চাই। আর চাই বলেই আমি তোমার হাতে হাত মেলাচ্ছি। তোমার হাতটা একবার আমার দিকে বাড়িয়ে দাও তো।"

মউ ওর হাতটা বাড়িয়ে দিতেই হাতে হাত মেলাল শুভঙ্কর। সেই হাতের ওপর আরও একটি হাত এসে পড়ল। সে হাত তিন্নির। বলল, "আমিও আজ এই মুহূর্তে শপথ নিলাম, আমিও সব সময় তোমাদের পাশে-পাশেই থাকব।"

এমন সময় সিঁড়ির দরজার কাছ থেকে শোনা গেল, "ও, আমি বুঝি কেউ নই?"

মউ বলল, "কে বলল তুমি কেউ নও? তুমি তো তবু কিছু করেছ। কিন্তু যে তোমার চেয়েও বেশি কিছু করতে পারত, অথচ পারল না, তাকে দিয়েই আজ কঠিন শপথ করালাম।"

শুভঙ্কর বিল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কতটুকু ঘুমোলি তুই? এরই মধ্যে উঠে পড়লি, যে?"

"এরই মধ্যে? সূর্য কোথায় ঢলে পড়েছে দ্যাখ।"

"হলেই-বা। শুয়েছিস তো দুটোয়।"

"কী জানি। হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। পাশ ফিরতে গিয়ে দেখি তুই নেই। এমন সময় তোদের কথাবার্তা কানে এল। তাই ঘুম ছেড়ে উঠে এলাম ওপরে।"

"বেশ করেছিস।" বলে মউয়ের হাত থেকে হাত সরিয়ে শুভঙ্কর বলল, "শোনো মউ, এই দুরূহ কাজে নামার আগে তোমার কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। আমি যা জানতে চাইব তা ঠিক-ঠিক বলবে। তাতে কিন্তু আমাদেরই কাজের সুবিধে হবে খুব।"

"কী জানতে চাও বলো?"

"কাল ট্রেনের মধ্যে শিকারি বাজের কথা শুনে বুঝলাম, সে তোমার বাবার ছাত্র ছিল। ওর আসল নাম রঘু। ওর বাবা মধু মাইতি

এই গ্রামেরই লোক। এর পরও তুমি বলছ শিকারি বাজ কে তা তুমি জানো না। এবং তাকে চিনিয়ে দিতে বলছ। ব্যাপারটা কি বুঝলুম না।"

মউ বলল, "এতক্ষণে তুমি একটা পুলিশি চাল চেলেছ।"

শুভঙ্কর রেগে বলল, "শোনো ! ফের যদি তুমি আমাকে বিদ্রূপ করে কিছু বলবে, তা হলে কিন্তু আমি তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হব। আমার সাহায্য যদি চাও, আমার হাতে হাত মিলিয়ে যদি কাজ করতে চাও তা হলে কোনওরকম বাড়াবাড়ি করবার চেষ্টা করবে না।"

মউ হেসে বলল, "আচ্ছা বাবা আচ্ছা। তুমি খুব রেগেছ বুঝতেই পারছি এবং এও বুঝতে পারছি, এবারই তোমাকে দিয়ে কাজ হবে। তোমার ওই দুর্বল সত্তাকে যদি এইভাবে না খোঁচাতাম, তা হলে এত সহজে তুমি এমন তেতে উঠতে না।"

তিন্নি বলল, "তোমরা কি এখন ঝগড়া করবে না কাজের কাজ কিছু করবে ?"

মউ বলল, "হ্যাঁ শোনো, যা তুমি জানতে চাইছ তা বলি। অনেকদিন আগে মধু মাইতি এই গ্রামেই বাস করত। সে ছিল সুবর্ণরেখার মাঝি। কিন্তু পাক্কা চোর একটা। দাগি আসামি। আজ থেকে বছর-কুড়ি আগে ঝাড়গ্রামে পুলিশের গুলিতে সে মারা যায়। মধু মাইতির ছেলে রঘুর তখন দশ-বারো বছর বয়স। সে আমার বাবার পাঠশালায় পড়ত। মাথা মোটা। পড়াশোনা করত না। অর্ধেক দিন পাঠশালাতেও আসত না। ওর বাবার মৃত্যুর পর ওর মা ওকে নিয়ে গিধনিতে ওর মামার বাড়ি চলে যায়। সেই রঘুই পরে সঙ্গদোষে রঘু ডাকাত হয়। তবে ইতিহাসের সেই বিখ্যাত রঘু ডাকাত নয়, ও হল নিম্নস্তরের এক জঘন্য প্রকৃতির হিংস্র ডাকাত। শিকারি বাজ নাম নিয়ে সে চাইছে নিজেকে চম্বলের দস্যু সর্দারের মতো বিখ্যাত করতে। অপ্রয়োজনে নিরীহ মানুষ মেরে সে অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। আমি ওর নামের সঙ্গেই পরিচিত। চেহারার সঙ্গে নয়। আমার বয়স চোদ্দ। ওরা কুড়ি বছর আগে এ-জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। কাজেই আমি ওদের কী করে চিনব বলো ?"

"অথচ সে কিন্তু তোমাকে বা তোমাদের সবাইকেই চেনে।"

"স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তাকে চিনি না। আবার এমনও হতে পারে যে সে আমার খুবই চেনা। হয়তো বহুবার দেখেছি তাকে। কিন্তু সেই যে শিকারি বাজ জানি না তা। পথেঘাটে কত লোককেই তো এইরকম দেখা যায়। কিন্তু কে কী তা কি কেউ বলতে পারে ? তোমরা তাকে দেখেছ। শিকারি বাজ বলে চিনেছ। কাজেই তোমরাই পারো তাকে আমায় চিনিয়ে দিতে।"

শুভঙ্কর বলল, "হ্যাঁ, চিনিয়ে তোমাকে দেবই।"

"দেবই নয়। দিতেই হবে। ওর ক্ষতি না করা পর্যন্ত আমার মনের আগুন নিভবে না শুভঙ্কর।"

বিল্টু বলল, "ঠিক আছে। আমরা চারজনেই তা হলে শপথ নিলাম, আগে শিকারি বাজ তারপরে অন্য কাজ।"

তিন্নি বলল, "তা হলে কাল সকাল থেকেই শুরু হোক আমাদের কাজ ?"

"হ্যাঁ। কাল সকাল থেকেই আমরা চারদিক তোলপাড় করব শিকারি বাজের জন্য। ওর দেখা আমাদের পেতেই হবে।"

তিন্নি বলল, "এদিকে মালাগুলো যে শুকিয়ে গেল তার কী উপায় ?"

বিল্টু বলল, "কথায়-কথায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়। সন্ধে হয়ে আসছে। এবার নীচে নাম।"

মউ বলল, "মালা শুকিয়ে গেল মানে ?"

শুভঙ্কর বিল্টুর দিকে তাকাল।

বিল্টু বলল, "ও-ও যখন আমাদের সঙ্গে একজোট হয়েছে, তখন ওকেও আর বলতে বাধা নেই।"

মউ জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী ?"

"খুবই গোপনীয়।"

তিন্নি বলল, "আয়, নীচে আয়। তা হলেই চোখের সামনে দেখবি সব।"

ওরা সবাই ধীর পদক্ষেপে দোতলায় নামল। তারপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই মউ বলল, "কী ব্যাপার ? তোমরা ঘরের ভেতর ফুলের মালা গাঁথছ, দরজা বন্ধ করছ, ব্যাপারটা কী ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তিন্নি বলল, "মার কাছ থেকে শাঁখটা নিয়ে আসব বিল্টুদা ?"

"অমনি একটা দেশলাইও নিয়ে আসিস। আলো জ্বালতে হবে।"

মউয়ের বিস্ময় সীমা ছাড়া। বলল, "শাঁখ ! শাঁখ কী হবে ?"

তিন্নি দুষ্টুমি করে বলল, "বাঃ রে। সোনার গণপতি বরণ হবে না ?"

"সোনার গণপতি !"

"হ্যাঁ। সিদ্ধিদাতা গণেশ। তাঁকে বরণ করেই আমাদের বড় কাজে নামতে হবে।"

"তোর কথার আমি কোনও মানে পাচ্ছি না।"

"পাবি পাবি। নে, ততক্ষণ বসে না থেকে মালাটা গাঁথ দেখি। আমি চট করে আলো জ্বালবার জন্য একটা দেশলাই আর বাজাবার জন্য শাঁখটা নিয়ে আসি।" বলেই ঘরের দরজা খুলে তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তিন্নি।

সেই যে গেল আর তার ফেরবার নামটি নেই। এক মিনিট, দু' মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঘণীভূত হল, তবুও তিন্নি ফিরল না।

মউয়ের মালা গাঁথা শেষ হয়ে গেছে কখন। তিন্নির প্রতীক্ষায় সবাই বসে আছে চুপচাপ। এই বুঝি আসে, এই বুঝি আসে, করে তো অনেক সময় পার হয়ে গেল। এক সময় অধৈর্য হয়ে মউ বলল, "একটু দেখে আসব, কী ব্যাপার ? কেন এত দেরি করছে মেয়েটা ?"

বিল্টু বলল, "যা তো। দ্যাখ তো কী ব্যাপার। নিশ্চয়ই কাকিমা ওকে কোনও কাজে আটকেছেন।"

মউ বলল, "আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। সেরকম কিছু হলে কাকিমা নিশ্চয়ই আলো নিয়ে আসতেন।"

বিল্টু বলল, "তোমরা বোসো। আমিই বরং দেখে আসছি ব্যাপারটা কী ?" বলে অন্ধকার হাতড়ে এক পা, দু' পা করে যেই-না কয়েক ধাপ নেমেছে, অমনি মনে হল কে যেন আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে মুখটাকে চেপে ধরল ওর।

বিল্টুও ছাড়বার পাত্র নয়। রীতিমত ধস্তাধস্তি লাগিয়ে দিল তার সঙ্গে। গায়ের জোরে ওর হাতটাকে একবার মুখ থেকে সরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, "শু-ভ-ঙ্ক-র !" সে হাত পরক্ষণেই ওর মুখ আবার শক্ত করে চেপে ধরল।

মুহূর্তের জন্য হলেও বিল্টুর ওই ডাক এবং সিঁড়িতে ধস্তাধস্তির শব্দ কানে গেল ওদের। তাই মউকে নিয়ে দ্রুত ছুটে এল শুভঙ্কর, "কী হল বিল্টু ! কোথায় তুই ! বিল্টু !"

কিন্তু কোথায় কে ? আগন্তুক বিল্টুকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলে গেল বাড়ির বাইরে। সেখানে আরও দু'জন অপেক্ষা করছিল। তারা ওকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল। **(ক্রমশ)**

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ঠিক আছে, এবার উপরে উঠে এসো । খুব আস্তে ।
টারজান
এডগার রাইস বারোজ
টারজান এবং কিনসায়েড আবিষ্কার করল যে,টরটুগা কিনসায়েডের পুরনো শত্রু বিস্‌লির দখলে । বিস্‌লি কিনসায়েডের আবিষ্কার চুরি করতে চায়…
চমকটা খুব আনন্দের, কী বলো, টমাস ? আবার আমাদের দেখা হল । শেষ দেখা হয়েছিল বারবাডোজে, তাই না ?
ভুলব কী করে ? তুমি আমার কাছ থেকে স্পেনের বহুমূল্য রত্নালঙ্কার কেড়ে নিয়েছিলে । তুমি এখনও স্নানের জলে লাইল্যাক-নির্যাস মেশাও, তাতেও দুর্গন্ধ যায় না ।
জাহাজে একজন গুপ্তচর ঢুকিয়েছিলুম, বোধ হয় জানতে না ? তোমার জাহাজের অবস্থান ও বেতারে জানাত । কথা ছিল তুমি জলে নামলে হাউই ছেড়ে জানাবে । কিন্তু জানায়নি ।
আমার নির্দেশ অমান্য করলে কী হয় এখন তা ভাল করেই বুঝতে পারছ ।
দুম !
দুম !
পরে…
বিস্‌লি, সাবধান করে দিচ্ছি জলের নীচে মৃত্যু-ফাঁদ পাতা রয়েছে । ওখানে যে কাঁপুনি দেখে এসেছি হয়তো তার থেকে ভয়ঙ্কর কিছু শুরু হয়ে যাবে ।
বাক্যজাল বন্ধ রেখে যেখানে সোনা আছে আমাকে সেখানে নিয়ে চলো, কিনসায়েড ।
বরং ও যা বলছে তা-ই করো, টম । লোভ ওকে বুদ্ধিভ্রংশ করেছে ।
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

জোনাকি গাছ

কল্যাণকুমার দে

কোথায় জোনাকি পোকা আর কোথায় গাছ। দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। বিচিত্র এই প্রকৃতির রাজ্যে না আছে এদের মধ্যে পারিবারিক আত্মীয়তা, না আছে শত্রুতা। সম্প্রতি জনাকয়েক জীববিজ্ঞানী প্রায় জোর করেই এদের মধ্যে এক প্রজননিক (Genetic) আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন। বলা বাহুল্য, সেই আত্মীয়তাসূত্রেই জন্মেছে জোনাকিগাছ!

জোনাকি একটি অতি পরিচিত পতঙ্গ, রাতের অন্ধকারে জোনাকির দেহ থেকে বের হয় স্নিগ্ধ আলো। প্রাণীদের দেহ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে দৃশ্যমান আলো বিকীর্ণ হওয়াকে বলে 'জৈবপ্রভা' বা 'বাইওলুমিনিসেন্স'। শুধু জোনাকি নয়, অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ থেকেও আলো বের হয়। কিছু নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ছাড়া (যেমন ছত্রাক) প্রাণীরাই জৈবপ্রভার একচ্ছত্র অধিকারী। জৈবপ্রভা সৃষ্টির মূলে কাজ করে এক ধরনের জৈব রাসায়নিক যৌগ লুসিফারিন। এই লুসিফারিনই লুসিফারিনেজ নামে একধরনের এনজাইমের সংস্পর্শে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়। তৈরি হয় তিন রকমের যৌগ—জল, কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং অকসিলুসিফারিন। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয় জৈবপ্রভা। লুসিফারিন অক্সিজেনে জারিত হওয়ার সময় নির্গত হয় শক্তি। এই শক্তি অক্সিলুসিফারিনে সঞ্চিত থাকে এক সেকেণ্ডের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ সময়। এই অবস্থায় অক্সিলুসিফারিন অণু থাকে বৈদ্যুতিক দিকে উদ্দীপ্ত অবস্থায়। পর মুহূর্তে এই শক্তি ওই অণু থেকে পরিত্যক্ত হয়ে তৈরি করে দৃশ্যমান আলো। শক্তির প্রায় সবটাই আলোক শক্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়, উত্তাপ শক্তি হিসাবে নয়। তাই জৈবপ্রভা বিকীর্ণ হওয়ার সময় উত্তাপ অনুভূত হয় না। এই কথা ভেবেই বিজ্ঞানীরা জৈবপ্রভার নাম রেখেছেন 'শীতল আলো'।

এ-কথা আমাদের জানা আছে যে, প্রতিটি জীবকোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক রাসায়নিক অণু। সেই অণুই হল জিন বা ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড সংক্ষেপে ডি· এন· এ। জিনই জীবদেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করছে। জৈবপ্রভা যেমন একটি বৈশিষ্ট্য, জৈবপ্রভাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এক বা একাধিক জিন। জিনের নির্দেশে তৈরি হয় এনজাইম। সেই এনজাইম আবার কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়াকে পরিচালনা করছে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ প্রকাশ হচ্ছে কোনও-না-কোনও বৈশিষ্ট্য।

জৈবপ্রভার মুখ্য চরিত্রে আছে লুসিফারিনেজ এনজাইমের ক্রিয়াকলাপ। জোনাকির দেহকোষে লুসিফারিনেজ এনজাইম তৈরি হচ্ছে বিশেষ কোনও জিন বা জিনসমষ্টির দ্বারা। সুতরাং যার দেহে লুসিফারিনেজ

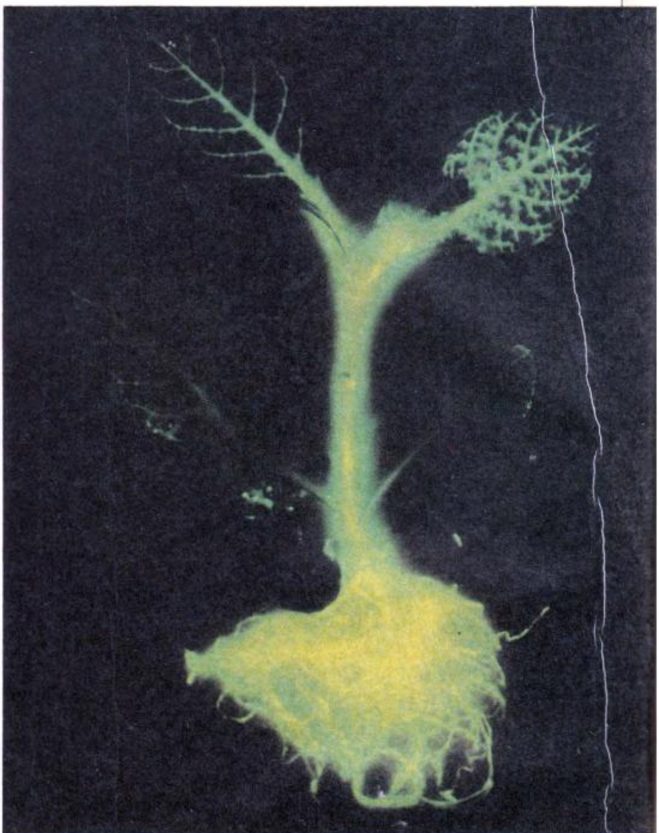

তামাকগাছের মধ্যে জোনাকির আলো জ্বালানোর জিনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এর ফলে তামাকগাছের সর্বাঙ্গ জ্বলজ্বল করছে স্নিগ্ধ আলোয়

তৈরির জিন থাকবে তার মধ্যেই প্রকাশ হবে জৈবপ্রভা। লুসিফারিনেজ তৈরির জিনকে যদি কোনওমতে জোনাকির দেহ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোনও জীবদেহে (যাদের জৈবপ্রভা হয় না) স্থাপন করা হয়, তা হলে সেখানেও জৈবপ্রভা হতে পারে। কিন্তু কীভাবে এই কাজ করা যাবে ? আর কার মধ্যে সেই জিনকে চালান করা হবে ? বায়োটেকনোলজি বা জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে যে-কোনও জিনকে এক কোষ থেকে অন্য কোষে স্থাপন করা সম্ভব। সুতরাং জিন স্থাপন করার পদ্ধতি সম্ভব। বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন, এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী বা এক উদ্ভিদ থেকে অন্য উদ্ভিদ কোষে জিনকে তো স্থাপন করা যাবে, কিন্তু প্রাণী থেকে উদ্ভিদে বা উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে কোনও জিনকে স্থাপন করলে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। তাই ঠিক হল লুসিফারিনেজ জিনকে তামাকগাছের কোষে স্থাপন করা যায় কি না তার চেষ্টা। লুসিফারিনেজ জিনকে বেছে নেওয়ার কারণ যদি লুসিফারিনেজ জিনকে উদ্ভিদ কোষে স্থাপন করা যায় তবে সে জিন ভিনদেশী কোষে সক্রিয় হচ্ছে কি না সেটা বোঝা যাবে উদ্ভিদে জৈবপ্রভা হচ্ছে কি না তা দেখে। কিন্তু উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা দিল। কোষের চারপাশে যে পাকাপোক্ত কোষ-দেওয়াল আছে সেটাই কোনও আগন্তুক বস্তুকে কোষের বাইরে থেকে ভিতরে স্থাপন করার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সে সমস্যারও সমাধান হল। বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ কোষের প্রাচীরকে ভেঙেচুরে সরাসরি প্রোটোপ্লাস্ট অংশকে বের করে নিয়ে তা থেকে সরাসরি উদ্ভিদকে তৈরি করে দেখিয়ে দিলেন কোনও সমস্যাই সমস্যা নয়। প্রোটোপ্লাস্টের চারদিকে কোষ-প্রাচীরের মোড়ক না থাকায় যে-কোনও বিদেশী কণা, এমনকী,একটা আস্ত জিনকে প্রোটোপ্লাস্টের মধ্যে স্থাপন করা অনেক বেশি সহজ হয়ে গেল। কোনও কোষে জিন স্থাপন করার ব্যাপারে দরকার হয় একজন বাহকের, যে নির্দিষ্ট জিনকে বয়ে নিয়ে যাবে এবং সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। জিনকে কোষের মধ্যে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে পারদর্শী হল ব্যাকটিরিয়া কোষের অতিরিক্ত ক্ষুদ্র গোলাকার প্লাজমিড ডি·এন·এ·। জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে জোনাকির দেহ থেকে লুসিফারিনেজ জিনকে কেটে প্রথমে প্লাজমিড ডি· এন· এ-র সঙ্গে জুড়ে দিলেন বিজ্ঞানীরা। তারপর সেই প্লাজমিডকে ছুঁড়ে দিলেন তামাক গাছের প্রোটোপ্লাস্টের মধ্যে। সেই সঙ্গে ঘটে গেল আশ্চর্য ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রোটোপ্লাস্ট প্রথমে তার চারপাশে কোষের দেওয়াল বানাল। ক্রমাগত বিভাজিত হতে লাগল। অবশেষে পূর্ণাঙ্গ গাছের চেহারা নিল। পুরো ব্যাপারটাই ঘটল জীবাণুবর্জিত টেস্টটিউবের মধ্যে। এবারে সেই গাছটাকে বাইরে বের করে এনে বিজ্ঞানীরা তার গায়ে কৃত্রিম লুসিফারিন দ্রবণ স্প্রে করে দিলেন। সত্যিই কি লুসিফারিনেজ জিন তামাকগাছের লক্ষ-লক্ষ কোষের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে ? কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল রাতের অন্ধকারে জোনাকির মতো সর্বাঙ্গে স্নিগ্ধ আলোর ছটা নিয়ে তামাকগাছটা জ্বলজ্বল করছে। সেই সঙ্গে আনন্দে, উত্তেজনায় চকচক করে উঠল কয়েক জোড়া বিজ্ঞানীর চোখ—চেয়ে-চেয়ে বারবার দেখতে লাগলেন আশ্চর্য সেই জোনাকিগাছকে।

যে তিনটি শব্দ আপনার মাথায় সবসময় ঘুরছে,
তাদের ভার ইউনাইটেড ইন্ডিয়াকেই দিন :

"তবে কি হবে..."

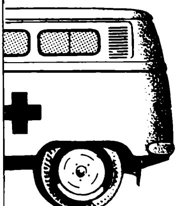

...আপনার বৃদ্ধ পিতার কিডনির গণ্ডগোল শুরু হয়েছে।
...এক্‌জিকিউটিভের কাজের চাপে আচমকা আপনার হৃদযন্ত্রে গোলমাল দেখা দিয়েছে।
...খেলায় মত্ত আপনার ছেলে, হাত পা ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। এসবই বাস্তব ঘটনা, কোন ভুল নেই।

ঈশ্বর না করুন এমনটি হয়।

এখানে সত্য ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে আপনাকে বোঝাবার জন্য : এদেশের হাজার হাজার লোক এখন মেডিক্লেম-এর মর্ম বোঝেন — কারণ দিন দিন সামর্থ্যের বাইরে চলে যাওয়া চিকিৎসা খরচের মোকাবিলা করার এই হলো সবচেয়ে সহজ ও সেরা উপায়।

মাত্র ২৫০ টাকার বিনিময়ে পরিশোধযোগ্য প্রকল্পে আপনি হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ বাবদ ১৭,৬০০ টাকা পর্যন্ত পাবেন।

আমরা চাই বা না চাই, জীবনের ওঠা-পড়া তো লেগেই থাকবে।

তাহলে আগামীকাল কাজে বেরোবার সময়ে আপনার কাছাকাছি ইউ আই অফিসে চলে আসুন—আপনি মেনে নেবেন যে...

পরে আক্ষেপের চেয়ে মেডিক্লেম-এর নিরাপত্তা অনেক ভালো।

MED-I-CLAIM

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ
(জেনারেল ইনস্যুরেন্স করপোরেশন অফ ইন্ডিয়ার একটি সহযোগী সংস্থা)
২৪ হোয়াইট্‌স রোড, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৪

UNITED INDIA

HTA 7350

মানুষখেকো গুহা

গ্রিক ভূগোলবিদ স্ট্রাবোর মতে প্রাচীন গ্রিক শহর হিয়ারাপোলিসের অ্যাপোলো দেবতার মন্দির ছিল রহস্যময়। মন্দিরের লাগোয়া একটি গুহায় জন্তুজানোয়ার ছুঁড়ে দিলে তারা আর বেরিয়ে আসত না। এমনকী, কোনও মানুষ যদি গুহামুখ অতিক্রম করে সামান্য ভেতরে ঢুকত, তা হলে তারাও উধাও হয়ে যেত। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতরা নিরাপদে গুহায় ঢুকতে-বেরোতে পারতেন। তবে স্ট্রাবো নথিবদ্ধ করেছেন যে, গুহার ভেতরে থাকাকালীন তাঁদের মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে যেত। প্রাচীন গ্রিকদের বিশ্বাস ছিল, ওই রহস্যময় গুহা পরলোকে যাওয়ার পথ। অপদেবতারা সেখানে রাজত্ব করেন।
স্ট্রাবোর পাণ্ডুলিপি প্রায় ২০০০ বছরের প্রাচীন। সেই প্রাচীন পুঁথির সূত্র ধরে নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন নিউ ইয়র্কের কুইন্স কলেজের মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক শেলডন আরন্‌সন। আরন্‌সনের শখ পুরাতত্ত্ব। দীর্ঘ দিন ধরে এই রহস্যময় গুহার বিষয়ে গবেষণা করার পর তিনি বলেছেন, "ওই গুহার নীচে সম্ভবত কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল। সেগুলো থেকে কালান্তক কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে আসত গুহার মধ্যে। ফলে মানুষ বা কোনও প্রাণী গুহার ভেতরে গিয়ে শ্বাসকষ্টে মারা পড়ত।" প্রাচীন গ্রিক শহরটি বর্তমানে পশ্চিম তুর্কির পামুক্কালে শহর। সেখানে প্রচুর উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। আর তার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে এ-থেকেই উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। "বাষ্প এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড হয়তো কোনও ফাটল দিয়ে ঢুকে পড়ত গুহার ভিতরে।" আরন্‌সন বলেছেন, "গুহামুখে দাঁড়ালে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনে হয়তো তেমন ঘাটতি দেখা দিত না। কিন্তু ভেতরে কয়েক পা এগোলেই নিশ্চিত মৃত্যু।"

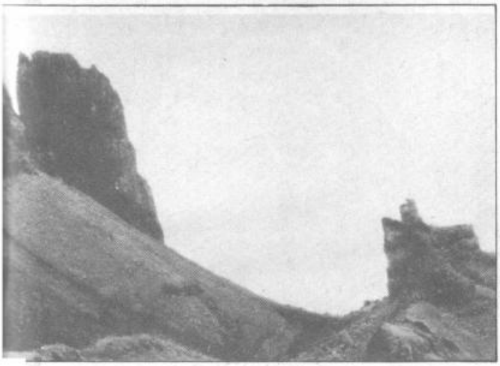

কিন্তু পুরোহিতরা কেমন করে নিরাপদে গুহার ভিতরে যেতেন? আরন্‌সন এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "তাঁরা স্রেফ দম বন্ধ করে থাকতেন। স্ট্রাবোর লেখা থেকেই এই সূত্র পাওয়া যায়। কারণ, দমবন্ধ করে থাকতেন বলেই তাঁদের মুখমণ্ডল লালচে হয়ে যেত।" অ্যাপোলোর মন্দির আজ আর নেই, তবে রহস্যময় গুহাটি এখনও রয়েছে। বছর দুয়েক আগেও কয়েকজন অভিযাত্রী অস্ট্রেলীয় ছাত্র ওই গুহার ভেতরে উধাও হয়ে গেছে। তার পরই তুর্কি সরকার লোহার গরাদ বসিয়ে দিয়েছেন গুহামুখে।

হাতের লেখা পড়ে ফেলবে কম্পিউটার

একজন ক্রেতা ফোন করল কোনও দোকানে। কোনও জিনিস অর্ডার দিল সে। ফোনের অন্য প্রান্তে একজন কর্মচারী একটা অর্ডার ফর্ম নিয়ে রাখল একটা বিশেষ ধরনের প্যাডের ওপরে। তারপর খসখসিয়ে লিখে নিল ক্রেতার অর্ডারটি। সেটা লেখা মাত্রই বিশেষ ইলেকট্রনিক প্যাড তার হাতের লেখাকে 'অনুবাদ' করে দিল ছাপার হরফে, এবং সেখান থেকে নতুন এই অর্ডারের সঙ্কেতটি পৌঁছে গেল একটি কম্পিউটারে।
বিশেষ ধরনের এই প্যাডের নাম 'পেনপ্যাড'। তৈরি করেছে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর 'পেনসেট' কম্পানি। পেনপ্যাড তৈরির কাজে তাদের প্রধান সমস্যা ছিল কী করে বিভিন্নজনের লেখার বিভিন্ন ধরন নির্ভুলভাবে বুঝতে পারবে যন্ত্রটি। অবশেষে তারা তৈরি করল বিশেষ একটি ইলেকট্রনিক পেন এবং একটি নোটপ্যাড। প্যাডের ওপরে পেন চলার সময়ে পেনের বিভিন্ন অবস্থান বোঝার জন্য প্যাডের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সূক্ষ্ম বর্তনি। তবে এর আসল চাবিকাঠি হল অভিনব একটি কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার যা হাতে লেখা প্রতিটি অক্ষরকে সঠিকভাবে চিনে নেয়।
পেনপ্যাড বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ১০৯৫ ডলার দামে। বহু দোকানেই পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়ে গেছে পেনপ্যাডের ব্যবহার।

আধুনিক অপেরায় মায়া-সঙ্গীত

দেওয়াল-চিত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আমেরিকার মায়া জাতির লোকেরা সঙ্গীতপ্রেমী ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গীতের সুর ছিল কেমন? নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যায়ের সঙ্গীতের অধ্যাপক রিচার্ড ক্যামেরন-উল্‌ফ্‌-এর ধারণা, তিনি এই প্রশ্নের কিছুটা হদিস পেয়েছেন।
মেক্‌সিকো, বেলিজ ও গুয়াতেমালার আদিবাসীদের বিভিন্ন সঙ্গীত কয়েক শো ঘণ্টা শোনার পরে ক্যামেরন-উল্‌ফ্‌ তার থেকে এমন সব অংশ আলাদা করতে পেরেছেন যা ইওরোপীয় সঙ্গীত থেকে নেওয়া অথবা তার দ্বারা প্রভাবিত। ফলে বাকি যে-অংশ পড়ে রইল তা মূলত প্রাচীন মায়া-সঙ্গীত। এ ছাড়া মায়াদের বাতাসী বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন সুর নিয়েও গবেষণা করেছেন ক্যামেরন-উল্‌ফ্‌। খুব শিগগিরই মায়া-সঙ্গীত ব্যবহার করে একটি অপেরা সৃষ্টি করছেন তিনি। এতে আরও থাকবে মায়া-জাদুবিদ্যা, উপকথা। এই সব মিলিয়ে গাঁথা হবে গুয়াতেমালার আদিবাসীদের ওপরে তৈলসন্ধানীদের শোষণের আধুনিক কাহিনী, এতে প্রথাগত বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও ব্যবহার করা হবে ইওরোপীয় বাদ্যযন্ত্র। এই অপেরা হয়তো মায়া সভ্যতার গুণাগুণের ওপরে কোনও নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

অনুসন্ধানী

অনসূয়া

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

"আচ্ছা খোকা, তোদের ওই হেভি আয়ন ব্যাপারটা কী একটু বলবি ?"

হেভি আয়ন ? শুনেই চোখ কুঁচকে গেল সুবীর ভটচাযের। ঠিক তখনই সাইড ভিউ আয়না থেকে নজর ফেরাবার উপায় ছিল না। কেননা, একটা নীল রঙের পুষ্পক অনেকক্ষণ থেকে চাপবার চেষ্টা করছে। সিনথেটিক পেট্রলে, লিটারে পঞ্চাশ মারেন বলে তেজ কত। মারুতির মতো সেকেলে মডেলদের গাড়ি বলে গণ্যই করে না। কিছুতেই জায়গা না ছাড়ার প্রতিজ্ঞা কিন্তু টিকল না। পেডার রোডের মোড়ে আলোটা লাল হয়ে গেল। সুবীর এবারে ভাল করে পাশে বসা শক্তপোক্ত চেহারার লোকটির দিকে তাকাল। তার বাবা, কিন্তু কে বলবে। হোমি ভাবা রোড থেকে মালাবার হিল হেঁটে পাড়ি দেন অক্লেশে। কতবার সুবীর বলেছে, 'বাবা, মেট্রো নিলেই তো পারো। আজকাল বয়স্কদের জন্য স্পেশাল ট্রেন দিচ্ছে।' কিন্তু বিনোদবিহারীর বয়স আটাত্তর হলেও উনি বয়স্কদের সুবিধেগুলো নিতে কিন্তু বোধ করেন, ট্রেনে হাফ টিকিট নিতেও ওঁর মর্যাদায় বাধে। তার চেয়ে যারা সত্যিকার বয়স্ক, তারাই এই সুবিধেগুলো নিক। বয়স আশির দিকে ক্রমশ এগোলে কী হবে, তাঁর মনটা এখনও টগবগে। সুবীর বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় মনে রাখার চেষ্টা করে যে, বাবাদের সময়ের পর ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেছে সময়, অনেক বদলে গেছে জগৎটা। কিন্তু অন্যদের বাবারা সেই ফেলে আসা জগৎটার জন্য কেবল হা-হুতাশ করেন। সুবীরের সহকর্মীদের সকলেরই বাবা, কাকা, মা-মাসিদের নিয়ে সমস্যার অন্ত নেই।

বিনোদবিহারী কিন্তু বালকের মন নিয়ে সব সময় জানতে চান। মুশকিলটা এই যে, সব বিষয়ই কি আর তাঁর বোধগম্য হবার মতো ? যেমন সুবীরদের লেটেস্ট কাজটা, যেটা নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়ে গেছে। ওয়াকিবহাল মহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে, তা হলে বোধহয় অনেকদিন বাদে ভারতে আবার একটা নোবেল প্রাইজ আসতে চলেছে।

নোবেল প্রাইজ ! হাঃ, হাসি পেল সুবীরের। যাকগে, পুরস্কার পাক বা না পাক, নতুন কাজের নেশাই আলাদা। সেটা যদি সফল হয় তার চেয়ে পুরস্কার আর কী। তা ছাড়া পুরনো প্রজন্মের কাউকে, এই যেমন বাবাকে সে যে তার কাজের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পেরেছে, সেটাই কি কম কথা !

একটা মিছিল রাস্তা পার হচ্ছে অনেক্ষণ ধরে। গণেশের প্রকাণ্ড মূর্তি নিয়ে বিসর্জনের মিছিল। অগত্যা গালে হাত দিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। চৌমাথার ইলেকট্রনিক বোর্ডে লেখা ফুটে উঠল : 'মিছিল পার হতে সময় লাগবে আট মিনিট তিরিশ সেকেণ্ড।'

"হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে বাবা ?" সুবীরের হাতে এখন সাড়ে আট মিনিট। এই সময়ে গণপতি বাপ্পার পেটমোটা চেহারা না দেখে বরং হেভি আয়নদের নিয়ে পড়া যাক।

"বলছিলাম তোদের ওই হেভি আয়ন। ওটা কী, আমাকে একটু সহজ করে বুঝিয়ে দিবি ?"

"হঠাৎ হেভি আয়ন নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?" সুবীর বাবার সঙ্গে এইরকম ঢঙেই কথাবার্তা বলে।

"মহাকাশ থেকে হেভি আয়ন কুড়িয়ে আনবার জন্য তোরা অনসূয়াকে পাঠিয়েছিস, এইসব নিয়ে কথা হয়, শুনি তো।"

"কুড়িয়ে আনার জন্য ? এ কি রাস্তা থেকে পাতা কুড়নো ? হাসালে !"

বিনোদবিহারী মুখ গম্ভীর করলেন। মেজাজে তিনি সর্বদাই হাসিখুশি, মুখ থেকে সূক্ষ্মভাবে হাসি উবে গেলে সুবীর না দেখেও বুঝতে পারে। তাই সে কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলল, "তা একরকম কুড়িয়ে আনাই বলতে পারো। মহাকাশে, মানে ইন্টার গ্যালাকটিক স্পেসে যেসব কণা ঘুরে বেড়াচ্ছে..."

"কী বললি ? ইন্টার গ্যালাকটিক স্পেস ? মানে দুটি নক্ষত্র-জগতের মধ্যবর্তী জায়গা ?"

"হ্যাঁ, সবটাই মহাশূন্য। কী হচ্ছে সেখানে, কী সেখানকার উপাদান—এসব নিয়েই তো পার্টিকল ফিজিক্সের লোকেরা মাথার চুল সাদা করে ফেলেছিল। এখন এসেছি আমরা—নতুন প্রজন্মের অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের কারবারি। কিন্তু অত আগে থেকে শুরু করলে হবে কী করে। মিছিল ফুরোতে আর মাত্র তিন মিনিট।"

তখন রাস্তায় গান গাইতে গাইতে নানা বয়সের ছেলেবুড়োরা চলেছে। গান হচ্ছে—

গণপতি বাপ্পা মোর লা
অগলে বরস কো জলদি আ।

সুবীর মনে-মনে জিভ কাটল। বুড়োদের বুড়ো বলা যাবে না তো ! নিয়ম নেই। এটা এখন বিচ্ছিরি গালাগালি। কেউ নালিশ করলে মামলা অবধি হয়ে যেতে পারে।

"তুমি জিজ্ঞেস করছিলে হেভি আয়নের কথা।"

বিনোদবিহারী মুচকি হাসলেন। আজকালকার ছেলে, কোথায় স্মৃতিশক্তি হবে তরোয়ালের মতো, তা না, এক কথা একশোবার।

"আয়ন হচ্ছে যে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে গেছে। ভাল ভাষায় ইলেকট্রনচ্যুত পরমাণু। প্রোটন হল হাইড্রোজেনের আয়ন। অক্সিজেনের আটটা ইলেকট্রন।"

"সেগুলো ছাড়িয়ে ফেললে আয়ন হবে ?"

"ছাড়ানো অমনি বললেই যায় না। তার জন্য চাই প্রচণ্ড তাপ। ধরো চারটে ছাড়ালে—তা হলে কী হল ? অক্সিজেনের আয়ন। এরকম লোহায় হতে পারে, ক্যালসিয়ামে হতে পারে, ইউরেনিয়ামে হতে পারে।"

"বলিস কী ? পৃথিবীতে তা হলে আয়নের ছড়াছড়ি !"

"পৃথিবীতে কোথায় ? বললাম না অপার্থিব তাপ চাই। মহাশূন্যে এটা অহরহ হচ্ছে। তাপ বেশি তো। প্রচণ্ড তাপে ইলেকট্রনগুলো খুলে বেরিয়ে যায়।"

লাল আলো সবুজ হল। পাশের পুষ্পকটা শাঁ করে বেরিয়ে যেতেই গম্ভীর মুখে সুবীর তাকে ওভারটেক করার জন্য অ্যাকসিলেটারে চাপ দিল। বিনোদবিহারী রোমাঞ্চিত চিত্তে ভাবতে লাগলেন নক্ষত্রজগৎ থেকে আর-এক নক্ষত্রজগৎ—সীমাহীন মহাশূন্য, কিছু নেই, হাওয়া নেই, মেঘ নেই, কেবল ইলেকট্রনচ্যুত আয়ন কণিকারা বাঁধন হারা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। কী অপূর্ব দৃশ্য।

বিনোদবিহারী রেজিস্টার বগলে গটমটিয়ে ঢুকলেন। ছাত্রদের মধ্যে কেউ উঠে দাঁড়ালেন, কেউ বসেই রইলেন, তাতে কিছু আসে যায় না। বয়স তো সকলেরই আশির উপর। কেউ-কেউ আবার বাতে কষ্ট পাচ্ছেন। উঠে দাঁড়াতে সময় লাগে। আর না ওঠা মানেই যে শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো, তা তো নয়। কমবয়সী মানে

খোকাদের বয়সী ছেলেরাই বা বয়োজ্যেষ্ঠদের কতটা সম্মান দিচ্ছে। নেহাত সরকারি নিয়মকানুনগুলো আছে—তাই আশি-নব্বই-এর বয়স্ক ব্যক্তিরা ঘোরাফেরা করে চাকরি করে খেয়েদেয়ে বেঁচে আছেন। এই যেমন বিনোদবিহারী সমাজকল্যাণ দপ্তরের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াবার চাকরিটা পেয়েছেন। তা না হলে কাঁহাতক আর টিভি-ভিডিও দেখে, বাগান আর গান শুনে সময় কাটত। খোকাকে অবশ্য উনি অফার দিয়েছিলেন ওদের টিমে কাজ করার। একটা কমপিউটার কোর্স তো নেওয়াই আছে। তা ছাড়া কলেজে ফিজিক্সও পড়েছিলেন এক কালে, ঝালিয়ে নিতে কতক্ষণ। বলাই বাহুল্য, সুবীর তাতে রাজি হয়নি।

"না বাবা, ওসব তুমি পারবে না।"

"আরে তোদের রাশি রাশি ডেটা যখন আসে সেগুলো কমপিউটারে ফিড করা…"

"ও তুমি বুঝবে না বাবা। তার চেয়ে বরং তুমি বুড়োদের—ইয়ে মানে বয়স্কদের মোটামুটি মহাকাশবিজ্ঞানের গোড়ার কথাগুলো বোঝাবার চেষ্টা করো।"

বিনোদবিহারী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। অনসূয়া থেকে যেসব তথ্য আসবে তা নিয়ে চাপা উত্তেজনা উনিও অনুভব করেন। টাটা ইনস্টিটিউটে সুবীরের বন্ধু, সহকর্মী ছাত্রদের মুখে অনসূয়া ছাড়া কথা নেই। স্পেসল্যাবে বাছা-বাছা কিছু এক্সপেরিমেন্ট গেছে, ভারত থেকে গেছে তিনটে, তার মধ্যে আছে সুবীরের অনসূয়া। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রেরা কিন্তু এসব ব্যাপার আন্দাজই করতে পারেন না। উনি বোঝাবার চেষ্টা করলে হেসে উড়িয়ে দেন।

আজ যখন উনি রেজিস্টার বগলে গটমটিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন তখনও তাই হল। ক্লাসের এক কোণ থেকে কে যেন বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "এই যে এলেন অনসূয়ার বাবা!"

বিনোদবিহারী কটমট করে তাকালেন। আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন, মন্তব্যটা কার কাছ থেকে এল। সম্ভবত মিত্তির। অলকেশ মিত্তির। নিজের কানটা গেছে, তাই কথাবার্তাও বলেন চেঁচিয়ে। তা ছাড়া এঁরা তো কেউ দুগ্ধপোষ্য শিশু নন যে, টিচারকে দেখে নিচু গলায় কথা বলবেন! মুশকিল হয়েছে—মিত্তির এখনও মনে করেন তিনি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের বড়কর্তা। তাঁর চালচলনে সর্বদাই বড়কর্তা-বড়কর্তা ভাব। যেন তিনি হুকুম দেবেন, বাকিরা তালিম করতে দৌড়বে। মিত্তির ভুলেই যান, এটা ক্লাস, এখানে তিনি এসেছেন শিখতে আর বিনোদবিহারী ভটচায এসেছেন তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার চেষ্টায়।

"এই যে মিত্তির," গলাটা চড়ালেন বিনোদবিহারী, "অনসূয়ার বাবা তো এসে গেছেন। এবারে তা হলে আলোচনাটা তোমাকে দিয়েই শুরু হোক। আমার প্রথম প্রশ্ন হল অনসূয়া কে বা কী?"

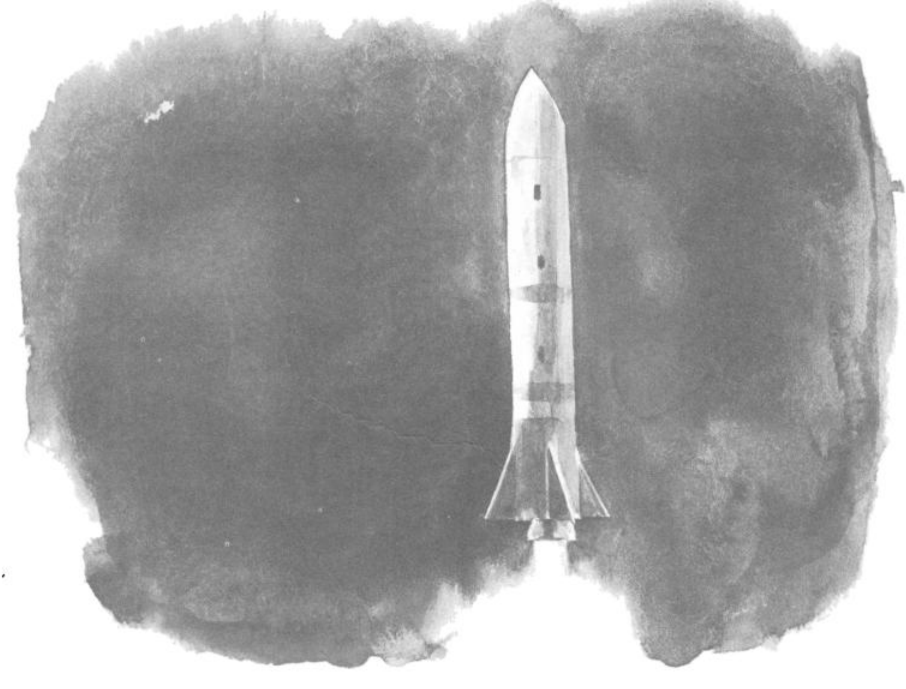

মিত্তির সব কথা বোধহয় শুনতে পাননি, কানের পিছনে হাত রেখে উৎকর্ণ হবার ভাব দেখালেন। ততক্ষণে পিছনের বেঞ্চ থেকে একজন খনখনে গলায় বলে উঠলেন, ইনি একজন বয়স্কা মহিলা,"অনসূয়া কে বা কী—এ আবার কেমন ধারা কথা ?"

"হ্যাঁ ঠিক ঠিক, নিশ্চয় ।"তাঁকে সমর্থন করে বলে উঠলেন মিত্তির। বিনোদবিহারী জানেন এ সমর্থনের কোনও মাথামুণ্ডু নেই । সম্ভবত মিসেস নায়েকের কথাটা কানেও যায়নি তাঁর । তবু কিছু একটা মন্তব্য না করে থাকতে পারেন না উনি ।

"বেশ তো মিসেস নায়েক । আপনিই তা হলে আলোচনা শুরু করুন ।" বিনোদবিহারী এবার সাদা চুল কটকটে নীল শাড়ি পরা মিসেস নায়েককে নিয়ে পড়লেন ।

"কী নিয়ে আলোচনা ?" মিসেস নায়েক বসে-বসেই জানতে চাইলেন ।

"এই যে বললাম, অনসূয়া ।"

"আপনি তো বললেন অনসূয়া কে বা কী ? তাই বললেন না ?"

"হ্যাঁ । তাই বললাম । কেন বললাম বলুন তো ? অনসূয়া কি মানুষ না অন্য কিছু ?"

ক্লাসে মহা শোরগোল পড়ে গেল । সবাই মিলে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন । ভটচায এঁদের ডিসিপ্লিন শেখাবার চেষ্টা করে-করে হার মেনে গেছেন । আলোচনার ক্লাসগুলো প্রায়ই হই-হট্টগোলে শেষ হয় । সকলেই কথা বলবেন, কেউ কারও কথা শুনবেন না। এরকম করে কি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় ?

ডেস্কের উপর ডাস্টার ঠুকলেন বিনোদবিহারী, "এক এক করে । এক এক করে । আচ্ছা আপনার কথা শুনি আগে মিসেস নায়েক ।"

শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস নায়েক, "আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি ভটচায যে আপনি কালিদাসের মহান কাব্যের সঙ্গে পরিচিত নন । তা হলে এমন কথা বলতে সাহস করতেন না । অনসূয়া কি মানুষ ?"

"অনসূয়া না প্রিয়ংবদা ?" কে যেন একজন টিপ্পনি কাটলেন ।

বিনোদবিহারী একটা হাত তুললেন, "আপনার পালা এলে বলবেন ।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা । ক্লাসসুদ্ধু সব বয়স্ক-বয়স্কারা যে-যাঁর ইচ্ছেমতো টিপ্পনি কেটে যেতে লাগলেন । খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকার পর বিনোদবিহারী চট করে ভিডিও পরদার বোতাম টিপে দিলেন । একটা উপগ্রহ উৎক্ষেপণের দৃশ্য । বাজ পড়ার মতো শব্দ হল । আগুনের হলকা ভেদ করে তেরছাভাবে ছুটে চলে যাচ্ছে একটা রকেট। তীব্র উত্তেজিত গলায় ভাষ্যকার বলে চলেছে—গতিবেগ, কক্ষপথ, কতগুলো প্রণালী ওর মধ্যে কার্যকর হবার ব্যবস্থা আছে ইত্যাদি । বোতাম টিপে গলার স্বরটা থামালেন বিনোদবিহারী । ছবি চলতে লাগল । বয়স্কদের, বিশেষ করে নব্বই-পঁচানব্বই-এর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে দেখেছেন, পরদায় যে-কোনও চলমান বস্তু দেখলেই এঁরা মন দিয়ে সেটা দেখতে থাকেন । ক্লাসে গণ্ডগোল থামাবার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা এটাই ।

অনসূয়ার প্রসঙ্গ কিন্তু সকলের মেজাজ এতই গরম করে দিয়েছিল যে, এই পদ্ধতিতে আজ বিশেষ কাজ হল না । একজনের গলা সবাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল । তিনি তর্কশাস্ত্রীমশাই । কর্মজীবনে ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক। এঁকে মহাকাশ-বিজ্ঞানের ধারণা দিতে গিয়ে সবচেয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন বিনোদবিহারী ।

"আপনি অনসূয়াকে রকেটের সাহায্যে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করলেন । এত বড় ধৃষ্টতা ।"রাগে গলা কাঁপছিল তর্কশাস্ত্রীমশাইয়ের ।"মহাকবির ঘোর অপমান । কালে কালে কতই দেখা বাকি ছিল, হা পরমেশ্বর ।"

তর্কশাস্ত্রী ধুতি আর নামাবলী জড়িয়ে ক্লাসে আসেন । বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর গায়ে সেলাই করা জামা কেউ চড়াতে পারেননি, এমনকী হাতকাটা ফতুয়াও নয় । নেহাত বোম্বাই শহরে ঠাণ্ডা পড়ে না, নইলে কী করতেন শাস্ত্রীমশাই ভেবে মজা পান বিনোদবিহারী । কলেজে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে পুজোআর্চাও করে থাকতেন উনি । তবে উনিশশো সাতানব্বইতে যখন পুরুত ডেকে পুজো করা বন্ধ হয়ে যায়, তারপর থেকে শাস্ত্রীমশাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর দারুণ চটে আছেন । এখন ওঁর কাজের মধ্যে বিজ্ঞান ক্লাসে গোলযোগ সৃষ্টি করে কেবল ক্লাস ভণ্ডুল করার চেষ্টা । এতেই ওঁর মহৎ আনন্দ ।

বিনোদবিহারী এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন । তিনি হাসিমুখে ভিডিও বন্ধ করলেন । বললেন, "দেখলেন তো শাস্ত্রী, অডিও ভিসুয়াল প্রণালীর উপকারিতা ।"

চোখ পাকিয়ে শাস্ত্রী বললেন, "তার অর্থ ?"

"অর্থ খুব সহজ । আমাকে কথা বলে সময় নষ্ট করতে হল না । যা বলতে চাইছিলাম আপনারা নিজে থেকেই বুঝে গেলেন, ছবি দেখে আর শব্দ শুনে ।"

"আমি কিছুই বুঝি নাই । তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইল না ।" শাস্ত্রী মাঝে-মাঝে সাধুভাষায় কথা বলে ফেলেন ।

"কিসের তাৎপর্য ? ছবিটার ? রকেট উৎক্ষেপণের ? নভোমণ্ডলে ওই সব বিজাতীয় বস্তু নিক্ষেপ করার তাৎপর্য আমি কিছুই বুঝি না । তা ছাড়া ওই রকেট বস্তুটি আবার ফিরিয়া আসে না কেন ? প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তো উহার ধরাবক্ষে প্রত্যাগমনের কথা ।"

বিনোদবিহারী প্রমাদ গুনলেন । সাত কাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার বাবা ? এই কোর্সে ইতিমধ্যে সাতটা বক্তৃতা হয়ে গেছে । কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা । নাঃ, তর্কশাস্ত্রীর মাথায় চক্রমন বেগের ধারণাটাই ঢোকেনি ।ছোটবেলার পড়া একটি কবিতার দুটি লাইন হঠাৎ তাঁর মনে এল :

হারুবাবু লক্ষ্মী ছেলে বাপের ক্ষুরে পেন্সিল কাটেন,
পুরুত ঠাকুর বসলে পুজোয় ক্যাঁচ করে তাঁর টিকি ছাঁটেন ।

যদিও তর্কশাস্ত্রীর মাথায় এখন আর টিকি নেই, কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে টিকি কতদিন চলতে পারে ? তবু বিনোদবিহারী নিজেকে হারুর জায়গায় কল্পনা করলেন । মানসচক্ষে দেখলেন চোখ বুজে আসনপিড়ি হয়ে বসে আছেন তর্কশাস্ত্রী, উনি পিছন থেকে আলতোভাবে তাঁর টিকি কেটে নিচ্ছেন। ভেবেই পরম আনন্দ পেলেন । মনের ভাব মনেই রেখে তিনি আবার ক্লাস-টিচারের ভূমিকায় ফিরে এলেন ।

"এই যে, ছাত্রছাত্রীরা, তর্কশাস্ত্রীমশাই একটা অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন । সুন্দর প্রশ্ন । রকেট কেন ধরাধামে প্রত্যাবর্তন করে না । আপনাদের মধ্যে যাঁর-যাঁর এই প্রশ্নের উত্তর জানা আছে, তাঁরা হাত তুলুন ।"

অনেক হাত একসঙ্গে উপরে উঠল ।সেই সঙ্গে অনেক কণ্ঠে কোলাহল । এঁরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারেন না । নিজের কথা বলার জন্য তর সয় না । কিন্তু নাছোড়বান্দা মিসেস নায়েক জায়গা ছেড়ে টিচারের ডেস্কের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন ।

"দেখুন মিঃ ভটচায, আপনি খুব চালাক আছেন । কেবল কথা ঘোরাবার চেষ্টা । শাস্ত্রীর কথা বাদ দিন, উনি ভট্টিকাব্য আর রঘুবংশ ছাড়া কিছু বোঝেন না ।"

"কী ? এত বড় কথা," শাস্ত্রীর শ্রবণশক্তি দারুণ কড়া । "আপনি কী বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন মিসেস নায়েক ?"

"কিছু না । আপনি বসুন তো ।"

থতমত খেয়ে বসে পড়লেন তর্কশাস্ত্রী । বিনোদবিহারী মনে মনে

বললেন শাবাশ। ভদ্রমহিলার দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব। এরকম একটা ক্লাস চালাবার জন্য উনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু হলে কী হবে, মিসেস নায়েকের জীবনের বেশিটা সময় কেটেছে ধ্রুপদী সংগীতের চর্চা করে। এক-সময় নামটামও হয়েছিল খুব। এখনও আন্ধেরিতে একটা গানের ক্লাস চালান। তবে সম্প্রতি উনি ঝুঁকেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে।

মিসেস নায়েক সোজা এগিয়ে এসে টিচারের ডেস্কের মুখোমুখি হলেন।

"আজ আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে। কেন আপনি অনসূয়া-অনসূয়া করছেন এই এক মাস ধরে। আমরা আর্যভট্ট জানি, ভাস্কর জানি, ইনস্যাট জানি, বরাহমিহির, অগস্ত্য জানি। অনসূয়াকে তো শকুন্তলার সখি ছাড়া আর কোনও ভূমিকাতে চিনি না। যতদূর জানি এই নামে কোনও উপগ্রহ এদেশ-ওদেশ কোথাও থেকে ছাড়া হয়নি।"

"মাথাটা একটু দেখান।"

"এদেশের না হলে কি ওদেশের উপগ্রহের নাম হবে অনসূয়া ? ওরা বলবে ন্যানসি কিম্বা ফ্যানসি।"

"আহা, ওঁকেই বলতে দিন না।"

নানারকম মন্তব্যে ক্লাসের বাতাস উতপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। বিনোদবিহারী উঠে দাঁড়িয়ে বরাভয়দানের মতো করে একটা হাত তুলে একটু কাসলেন।

"বলছি, বলছি। মিসেস নায়েক আপনি জায়গায় যান।"

"না, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থেকে কান খুলে আপনার কথা শুনব।"

হাঃ হাঃ হাঃ। হাসির বন্যা বয়ে গেল। পুলকেশ মিত্তির হাসতে হাসতে দমবন্ধ হবার মতো হলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন মিসেস নায়েক। মস্ত ফ্লাস্কে করে সব সময় জল নিয়ে আসেন উনি। কেন তা কেউ জানে না। সম্ভবত পুরনো অভ্যাস, ছাড়তে পারেননি।

"এই নিন,এক ঢোক জল খেয়ে সুস্থ হয়ে নিন।" কাপে করে জল উনি মিত্তিরের হাতে তুলে দিলেন। মিত্তির ততক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছেন।

"ল্যাবেঞ্চুস খাবে মিত্তির ?" ওদিক থেকে কোনও এক অশীতিপর ছাত্র টিপ্পনি কাটলেন। আবার অট্টহাস্য। মিত্তির চোখ পাকিয়ে তাকালেন। কথাটা উনি আসলে শুনতেই পাননি। কিন্তু এই গণ্ডগোলে আসল কথাটা চাপা পড়ে গেল। সেই মিসেস নায়েক এখন মিত্তিরের সেবা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সত্যি বড়ই নরম হৃদয় ভদ্রমহিলার। কারও অসুখ-বিসুখ করলে আর দেখতে হবে না।

বিনোদবিহারী একটু গলাটা সাফ করে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। এতজন বয়স্ককে একসঙ্গে চুপ করে বসিয়ে রাখা তো একটা সমস্যা। তার উপরে তাঁদের মনোযোগ ধরে রাখা এক ঘণ্টা ধরে। উনি ভাবলেন এবারে তা হলে মহাকাশে গবেষণাগার তৈরি করার উপযোগিতার বিষয়টা আরম্ভ করা যাক। এতদিন তো মানবকল্যাণের দিকটা নিয়ে অনেক বলা হল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, খনিজ সম্পদের খোঁজ, উপগ্রহের চোখে মর্তের নানা অনুসন্ধান, হ্যানা-ত্যানা। কিন্তু এবারে অন্য দিক থেকে আক্রমণ এল।

তর্কশাস্ত্রী নামাবলী বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে একটা হাত উপরে তুললেন। তারপর শিক্ষকের অনুমতি না নিয়েই বলতে শুরু করলেন, "আজ ভটচাযের বদলে বরং আপনারা আমার কাছ হইতেই কিছু শ্রবণ করুন। আর ভটচায, নামে ভটচায হইলে কী হইবে, ধর্মের অ-আ-ক-খ উহার ঘটে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তো

১		২	■	৩		৪	■	৫	৬
	■	৭		■	■	৮			
৯			■	১০			■	■	
	■	১১			■	■	১২	১৩	
১৪	১৫	■	■	১৬	১৭	■	১৮		■
■	১৯	২০	■	২১		■	■	২২	২৩
২৪			■	■	২৫		২৬	■	
	■	■	২৭			■	২৮		
২৯	৩০			■	■	৩১		■	
৩২		■	৩৩			■	৩৪		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ভিখারি, দরিদ্র ; লোভীও বটে। (৩) অপরের জিনিস। (৫) প্রচলিত ছড়ায় যে-গাছে তোতাপাখি। (৭) গাল। (৮) রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ। (৯) ইমরান খান যা। (১০) চন্দ্রযোগে এক কবি। (১১) আনন্দ-সহ। (১২) মেঘযুক্ত। (১৪) ঝাড়ুদার পাখি। (১৬) এর পর ক্ষতি হলে ব্যবসা বা অঙ্কের বিষয়। (১৮) খাবার। (১৯) নাক কেন ডাকে আর—কেন চমকায় ? (২১) জ্যোতিষে রাশির উদয়কাল। (২২) তাপ, জ্বালা। (২৪) লাউ। (২৫) দূরগামী। (২৭) বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। (২৮) গতিশীল। (২৯) সুনির্মল বসুর কবিতায় যা রোদ্দুরে দেওয়ার পর নানাজনে নানা অনুমান করছিল। (৩১) রোগ। (৩২) পুত্র। (৩৩) যে রাখতে জানে না তার জন্যে এই পথ নয়। (৩৪) টিকা।

উপর-নীচ : (১) খড়ম। (২) যে-সময়ে বিয়ে পুজো ইত্যাদির অনেক লগ্ন পড়ে। (৪) নিজের লোক। (৫) বিশ্বাস, ভরসা। (৬) বিখ্যাত গায়ক। (১০) বসুবংশের বিখ্যাত শিল্পী। (১২) বন্ধু। (১৩) গল্পের এক দাদা। (১৫) কামধেনু। (১৭) দুঃসংবাদবাহক। (২০) বহুজাতিক ফল। (২৩) অনায়াসে দর্শনীয় বস্তুকে এমন বলা হয়। (২৪) আস্তাবল। (২৬) প্রবাদ, হাতির মাথায় এই মুক্তো জন্মে। (২৭) ধ্বংস, লোপ। (৩০) যমজ ভাইদের চেহারায় যা থাকে।

গত সংখ্যার সমাধান

কা	ঠ	ঠো	ক	রা	■	প্র	জা	প	তি
লা	■	ক	■	জ	বা	লা	■	থ	র
পা	ম	র	■	হ	র	প	■	■	স্কা
হা	সি	■	রা	ং	তা	■	ক	ঠো	র
ড়	■	স	হি	স	■	ধ	র	না	■
■	খা	লি	ত্য	■	ল	ব	ণ	■	লু
আ	স	ল	■	দ	জ্জা	ল	■	পা	ট
লি	■	■	প	র	শ	■	অ	লা	ত
বা	সা	■	স	দ	র	■	নু	■	রা
বা	রি	ধা	রা	■	ম	রু	জা	হা	জ

রঞ্জন

গায়ত্রীমন্ত্র উহার মুখস্থ আছে কি না ? জিজ্ঞাসা করুন উহার উপবীত কোথায়…"

"তাই তো, তাই তো।" আর একজন বয়স্ক মাথা নাড়লেন, "টিকিরও তো ভগ্নাংশও দৃষ্টিগোচর হয় না।"

তর্কশাস্ত্রী উৎসাহিত হয়ে বললেন, "তবেই দেখুন। টিকি নাই, মস্তকের কোথাও টিকির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইবেন না।"

এমন সময় ফিসফিস করে কে একজন জানতে চাইলেন, "টিকি কী ?" কথাটা আস্তে বলা হলেও বিনোদবিহারীর কানে গেল। কোথাকার অর্বাচীন ছোকরা, বয়স ভাঁড়িয়ে বয়স্কদের দলে নাম লিখিয়েছে, টিকির নাম শোনেনি ! ভাবলেন, এবারে প্রিন্সিপালের কাছে রিপোর্ট না করলেই নয়। এরকম বেশ কয়েকটি কেস ধরা পড়েছে। বয়স পঞ্চান্ন কি ছাপান্ন, কিন্তু সুযোগ-সুবিধের লোভে পঁচাত্তর বলে বয়স ভাঁড়িয়ে এখানে এসে ঢুকেছে।

তর্কশাস্ত্রী ততক্ষণে তাঁর বক্তৃতার মাঝপথে, "দেখুন বন্ধুগণ, জীবনটা বেশ সুন্দর ছকে ফেলে দিয়েছিলাম। ছন্দের তালে চলছিল আমার বিদ্যাদান। বর্ষা পড়লেই শুরু করে দিই রঘুবংশ আর শীত পড়লেই ভট্টিকাব্য। এর কোনও অন্যথা হইত না। এইভাবেই জীবন চলিতেছিল।"

"এমন সময় কী হল ?" অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করলেন আর-একজন।

"কী হইল ? সেই কথাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শ্রবণ করছি, শ্রবণ করছি।" ক্লাসসুদ্ধ সকলে গল্পের গন্ধ পেয়ে বেশ উৎসুক হয়ে উঠলেন। বিনোদবিহারী ভাবলেন অথচ ক্লাসের পড়া করতে বললে অন্য মূর্তি। হোম ওয়ার্ক করার ধার দিয়ে যান না কেউ।

"তারপর কী হইল শুনুন। একদিন এক পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা। আমি পড়াইতাম সংস্কৃত, সে পুণের কোনও কলেজে পড়াইত পদার্থবিজ্ঞান। বন্ধুকে দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম, বলিলাম, ভাই কেমন আছ ? মুখ যেন কেমন শুষ্ক-শুষ্ক দেখি। তা সে বন্ধু বলিল, জীবন একেবারে দুর্বিসহ হইয়া গেল। মুখ শুষ্ক কি সাধে ? আমি বলিলাম কেন, কেন ? জীবন কেন দুর্বিসহ ? সে বলিল ওই যে রাশিয়ানগুলা ঊর্ধ্বাকাশে কী যেন পাঠাইয়াছে, তাহা বনবন করিয়া পৃথিবীকে পাক খাইতেছে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, সংবাদপত্রে এই বিষয়ে কিছু একটা সংবাদ বাহির হইয়াছিল বটে। তাহার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ? বন্ধু বলিল, সম্পর্ক আছে হে, আছে। সম্পর্ক বাহির করিয়াছে আমার দুষ্ট ছাত্রগুলা। তাহারা বলে, মাস্টারমহাশয় আপনি আমাদের এতদিন যাহা শিখাইয়াছেন, তাহা কি সব ভুল ? আপনি বলিতেন একটি ঢিল আকাশে নিক্ষেপ করিলে তাহা অচিরেই ভূতলে পতিত হইবে। কিন্তু এখন কী হইল ? এই ঢিল তো পাক খাইতেছে—পড়িবার নামটি করিতেছে না।"

বিনোদবিহারী হো-হো করে হেসে উঠলেন। ভাবলেন, দারুণ গল্প তো। মনে করে এটা পরের লেকচারে ঢুকিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ক্লাসের বাকি সকলে থমথমে মুখ করে বসে রইলেন, কেউ হাসলেন না।

তর্কশাস্ত্রী বিজয়ীর মতো সকলের দিকে একবার দেখে নিলেন, "ব্যাপারটা বুঝলেন তো ?"

সকলেই সমঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। এই প্রসঙ্গ আর বেশি দূর এগোবার আগেই ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল। এর পরে কমিউনিটি কিচেনে খাবার খাওয়ার পালা। ঘর থেকে বেরোবার জন্য হুটোপাটি পড়ে গেল। শেষ ছাত্রটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর বিনোদবিহারীর খেয়াল হল, আজকে নাম ডাকতেও ভুল হয়ে গেল। এই নিয়ে বার কয়েক এরকম হল। কী করবেন, আন্দাজে বসিয়ে দেবেন ? না পরের ক্লাসে জিজ্ঞেস করবেন ? এঁদের আবার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর নয়। আজ কী করলেন কালকেই ভুলে যান।

সুবীর গাড়ি নিয়ে গেটে এসে হর্ন দিতেই বিনোদবিহারী বেরিয়ে এলেন, "আজ তোমার কেমন কাটল ?"

"কেমন আর ? তর্কশাস্ত্রীর তর্কের ঠ্যালায় একটা নতুন বিষয় শুরু করব ভেবেছিলাম। সেটা আরম্ভ করাই গেল না।"

সুবীর একবার চট করে বাবার মুখের ভাবটা দেখে নিল। খুব কি হতাশ মনে হচ্ছে ? এইসব বুড়ো খোকাদের সঙ্গে সারাদিন কাটানো বোধহয় খুব আরামের হচ্ছে না। তার চেয়ে কয়েক মাসের জন্য খুকুর কাছে জাপানে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় ?

"বাবা, তুমি জাপানে বেড়িয়ে এসো না। মাস কয়েকের জন্য ?"

"খামোখা ?"

"না, মানে অনেকদিন খুকুকে দ্যাখোনি,তাই বলছি।"

"তোর বুঝি মেয়ের জন্য মন কেমন করছে ? তা হলে তুই-ই ঘুরে আয় না।"

সুবীরের মুখটা একটু করুণ হয়ে এল। ইচ্ছে হলেও সম্ভব হচ্ছে কই। বাবার মতো তার যদি অঢেল অবসর থাকত।

"ওসব বাজে কথা রাখ। তোকে যে-কথা সকালে জিজ্ঞেস করছিলাম, মহাকাশে যেসব কণা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলো কি চোখে দেখা যায় ?"

"মোটেই না। কে দেখবে ? কার চোখে দেখবে ?"

"ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। তাই জন্যই তো তোরা অনসূয়াকে পাঠিয়েছিস। খবরাখবর আনবে বলে।"

সুবীরের হাসি পেল। বাবা এমনভাবে কথা বলেন। অনসূয়া যেন মানুষ। সে মুখে বলল, "ঠিক। মহাজাগতিক রশ্মির কথা বলেছিলাম না ? খুব হাই এনার্জি এদের। আমাদের আবহমণ্ডলে এসে ধাক্কা খায়। আমরা শুধু বিক্রিয়া থেকে বুঝি।"

"এখান থেকেই বুঝিস ?"

"না, মানে কথা হচ্ছে যেসব আয়ন পৃথিবীর আকাশ অবধি পৌঁছয়, তাদের অনেক উচ্চশক্তির হতে হয়। মাঝারি বা অল্পশক্তির ভারী মৌল মহাকাশে আছে কি না তাদের সন্ধান পেতে গেলে আবহমণ্ডলের উপরে উঠতে হবে তো।"

"তাই অনসূয়াকে পাঠিয়েছিস ?"

"হ্যাঁ, সেইজন্য।"

"তা কী খবর আসবে বলে আশা করছিস তোরা ?"

"সেটা কি আগে থাকতে বলা যাবে ? তবে যদি কম এনার্জির ভারী নিউক্লিয়াস পায় তা হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধারণা একদম পালটে যাবে, এটুকু বলতে পারি।"

বিনোদবিহারীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখের সামনে নীল আকাশের খোলস খুলে যেতে লাগল—দূরে আরও দূরে নীল থেকে গভীরতর নীলের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন তিনি। তার চেয়েও দূরে যেখানে নক্ষত্র তৈরির কারখানা, সেখানে কণা চূর্ণ হচ্ছে, অক্সিজেন থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রন, তাপের অধিক তাপ, আলোর অধিক আলো। কী মর্ম বুঝবে এ সবের তর্কশাস্ত্রী ? এদিকে অনসূয়ার সঙ্গে খবর আসছে আরও কত অজানা রহস্যের। আসুক, আসুক, তবে তো বুঝবেন বাছাধনেরা। অনসূয়ার বাবা। হুঁঃ।

"কী হল, নিজের মনে হাসছ কেন ?"

"না, কিছু না।" বিনোদবিহারী চট করে মুখটা গম্ভীর করে নিলেন।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

উষার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী এখন ঘড়ি

রূপক সাহা

"উষার চেয়েও ভাল দৌড়ত এমন একটি মেয়ে তখন আমাদের স্কুলে পড়ত। উষা ক্লাস ফাইভে, আর ওই মেয়েটি— সীতা সিক্সে। সে সময় উষা ছোটখাটো রোগে বেশ ভুগত। শরীরটাও ছিল রোগা-পাতলা। আমরা তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি, ও এত বড় অ্যাথলিট হবে।" বছর-চারেক আগে এই কথাগুলো আমাকে বলেছিলেন কেরলের পাইয়োলি গ্রামের এক স্কুল-শিক্ষক। পি টি উষা সেই সময় জাকর্তার এশীয় অ্যাথলেটিক্‌স মিট থেকে পাঁচটি সোনা জিতে দেশে ফিরেছেন। উষার বাড়ি পাইয়োলি-তে গিয়েছি সাক্ষাৎকার নিতে। পথে ওই স্কুল-শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হতে কথায় - কথায় তিনি আরও বললেন, "আমাদের নজর তখন সীতার দিকেই। ওকে ঘিরে অনেক আশা। নানি রাধা-র চেয়েও ভাল স্প্রিন্টার হবে। কিন্তু মালয়ালি মেয়েদের সমস্যাটি কী জানেন, বাপ-মা চায় না মেয়ে বেশিদিন দৌড়ক। সীতার কপালেও তাই ঘটল। উষা কন্নুর স্পোর্টস স্কুলে ঢোকার বছরেই সীতার বিয়ে হয়ে গেল।"

উষার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী এই সীতার বিয়ে হয়েছে পাইয়োলির পাশের গ্রামেই। সুখে তিনি ঘরকন্না করছেন। আর দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকুমারী আম্মা এখন শুধুই আক্ষেপ করে যাচ্ছেন। সত্তরের দশকের শেষ দিকে, উষার উদয়ের ঠিক আগে ধূমকেতুর মতো উঠে এসেছিলেন এই শ্রীকুমারী আম্মা। আবার ধূমকেতুর মতোই মিলিয়ে গেছেন। একবার গোয়ালিয়রে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় স্প্রিন্টে দুর্দান্ত সব সময় করেছিলেন শ্রীকুমারী। উষার কোচ নাম্বিয়ারের কোপে পড়ে তিনি দৌড়নোই ছেড়ে দিলেন। দিল্লি এশিয়াডের আগে পাতিয়ালায় কোচিং ক্যাম্পে শ্রীকুমারী কাঁদতে কাঁদতেই আমাকে বলেছিলেন, "নাম্বিয়ার-সার সব সময় উষাকে নিয়েই পড়ে আছেন। আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখেন না। উষাকেই সব ব্যাপারে আগে ঠেলে দেন। আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। এশিয়াডের পর আর দৌড়বই না।"

এশিয়াড ক্যাম্পের দু' বছর আগেই আরও একজন মেয়ে স্প্রিন্টারের মন ভেঙে দেন উষা। ইনি বাংলার রীতা সেন। ১৯৭৯-তে সোল এশীয় মিট থেকে রুপো এনেছিলেন রীতা। দেশ জুড়ে তাঁর নামডাক। পরের বছর, মস্কো ওলিম্পিকে কিন্তু তিনি যেতে পারলেন না। তাঁর বদলে ভারতীয় দলে স্থান পেলেন উষা। প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রীতা। খবরের কাগজে অভিযোগ তুললেন, "বড় বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে উষাকে নিয়ে।" ওলিম্পিকের হিটে সবার শেষে পৌঁছলেন উষা। মাথা নিচু করে ফিরেও এলেন। কিন্তু পরের বছর, রীতার মুখ তিনি বন্ধ করে দিলেন, তাঁর এই তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরই রেকর্ড ভেঙে।

উষার চোদ্দ বছরের অ্যাথলিট-জীবন যদি কেউ খুঁটিয়ে দেখেন, তা হলে স্পষ্টই বুঝতে পারবেন, সীতা-শ্রীকুমারী-রীতারা আদপেই উষাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি। উষার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কেরলেরই আর-এক মেয়ে এম· ডি· বালসাম্মা। ১৯৮২-র এশিয়াডে এই বালসাম্মা হার্ডলসে সোনা পেয়েছিলেন। আর উষা স্প্রিন্টে রুপো। দু'জনে যখন দেশে ফিরে গেলেন, তখনই রেষারেষিটা শুরু হল। এই দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পিছনে ছিল দু'জনের কোচ— নাম্বিয়ার আর কানন কুট্টির ব্যক্তিত্বের সংঘাত। দুই কোচই কেরলের স্পোর্টস স্কুলের। কোচ হিসেবে কেউ নিজেকে কমতি বলে মনে করতেন না। এশিয়াডের পর কেরল সরকার সংবর্ধনা দিল পদকজয়ী অ্যাথলিট আর তাঁদের কোচদের। ফুলে সাজানো হুড খোলা গাড়িতে করে সারা শহর তাঁদের ঘোরানো হল। সোনাজয়ী বালসাম্মা আর তাঁর কোচ কুট্টি একটু বেশি খাতিরই পেলেন। ব্যস, আঁতে ঘা লেগে গেল উষা-নাম্বিয়ারের। তাঁরা দু'জনেই ঠিক করে

নিলেন, যোগ্য জবাব দেবেন। এমন কিছু করবেন, বালসাম্মা-কুট্টির কথা যাতে আর কেউ মনে না রাখেন।

পাইয়োলির সমুদ্রতীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলনে ডুবে রইলেন উষা আর নাম্বিয়ার। পাইয়োলির চার কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে থাকেন নাম্বিয়ার। রোজ ভোরে মোটরবাইকে চেপে তিনি হাজির হতেন উষার বাড়িতে। তারপর তাঁকে নিয়ে চলে যেতেন প্র্যাকটিসে। কয়েকশো মাইল দূরে, পালঘাটের মার্সি কলেজে এইসব খবর রাখতেন না কুট্টি ও বালসাম্মা। উষা যে ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছেন, এটা তাঁরা টের পেলেন প্রায় এক বছর পর, ১৯৮৩-তে কুয়েত-এর এশীয় অ্যাথলেটিক্সে উষা যখন সোনা জিতলেন। দেশে ফিরে আবার সংবর্ধনা। এবার ফুলে সাজানো গাড়ির সামনের সিটে উষা-নাম্বিয়ার। পিছনে কুট্টি-বালসাম্মা।

১৯৮৩ থেকে '৮৫— এই দু'বছর উষা আর বালসাম্মার লড়াই ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকেও অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। বালসাম্মাকে জব্দ করার জন্যই ১৯৮৪-তে নাম্বিয়ার উষাকে নিয়ে এসেছেন হার্ডলসে। ট্রায়ালে বালসাম্মাকে হারিয়ে উষা লস অ্যাঞ্জেলিসে গেলেন এবং ওলিম্পিকে চতুর্থ স্থান পেয়ে সারা বিশ্বের নজর টানলেন। লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে ফিরে এসে কুট্টি দোষ চাপালেন নাম্বিয়ারের ওপর। বললেন, "ওর ভুল স্ট্র্যাটেজিতে দৌড়েই উষা পদক পেল না। আমার কথা শুনলে এমনটি হত না।" উত্তরে নাম্বিয়ার কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন কুট্টিকে একটা বড় চমক দেওয়ার জন্য। ১৯৮৫-তে জাকর্তায় এশীয় মিটে উষাকে তিনি নিয়ে গেলেন একেবারে টপ ফর্মে। ফিরে এলেন পাঁচটি সোনা নিয়ে। আর উষার কাছে বারবার হারতে হারতে হতাশ হয়ে একসময় দৌড়ই ছেড়ে দিলেন বালসাম্মা।

উষার পঞ্চম প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্য ভারতীয় নন। একজন ফিলিপিনো। নাম লিডিয়া ডি ভেগা। ফিলিপিন্সের এই সুন্দরী মেয়েটি সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেরা স্প্রিন্টার। তাঁর জীবনের ঘটনা নিয়ে সিনেমা হয়েছে। নায়িকার ভূমিকায় লিডিয়া নিজেই অভিনয় করেছেন। উষা আর লিডিয়ার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ— তা জানার কৌতূহল সারা এশিয়ায়। '৮৬-র এশিয়ান গেমসের অন্যতম আকর্ষণ এই দু'জন। সোলে উষার শ্রেষ্ঠত্বে চিড় ধরিয়ে দিলেন লিডিয়া একটি সোনা ছিনিয়ে নিয়ে। তবে চারটি সোনা জিতে উষা আবার প্রমাণ দিলেন, তিনি অনেক এগিয়ে। পরের বছর সিঙ্গাপুরে লিডিয়ার কাছে উষা হারলেন একটি রেসে। তবে তিনটি সোনা জিতে আবার বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর ধারে-কাছে কেউ নেই। কম দূরত্বের স্প্রিন্টে উষা এশিয়ায় একমাত্র হেরেছেন লিডিয়ার কাছেই। সেজন্য তাঁকে যথেষ্ট সম্ভ্রমের চোখেই দেখেন। এই লিডিয়া বিয়ে-থা করে এখন ঘোর সংসারী। উষা কিন্তু মধ্যাহ্নেই রয়েছেন।

এশিয়ায় কি তা হলে উষার আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই? আছেন। তিনি হলেন তাইপে-র চি চেং। ইন্ডোর আর আউটডোরে ন'টি বিশ্বরেকর্ডধারী চেং এশিয়ার সর্বকালের সেরা মেয়ে অ্যাথলিট। মেয়েদের এক শো আর দু'শো মিটারে এশিয়ার মহাদেশীয় রেকর্ড গত উনিশ বছর ধরে চি চেংয়ের দখলে রয়েছে। উষাও তা ভাঙতে পারেননি। আর পারবেন বলে মনেও হয় না। কেননা, উষার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী এখন ঘড়ি।

গ্যালারি থেকে

লেডি ডায়ানার খেলা

প্রিন্সেস অব ওয়েলস লেডি ডায়ানা-র হঠাৎ খেলার শখ হয়েছে? ছবিটি দেখে তা মনে হতে পারে। আসলে লেডি ডায়ানা এবং প্রিন্স চার্লস এসেছিলেন জাকর্তায়। অসুস্থ রোগীদের দেখতে গিয়েছিলেন নানা আশ্রয়স্থলে। সেরকমই একটি জায়গায় রোগীদের উৎসাহ দিতে 'লন বোলিং' খেলায় মেতে ওঠেন লেডি ডায়ানা।

লেডি ডায়ানা

পরিকল্পনা বাতিল

নিজের পরিকল্পনা থেকে একচুলও নড়বার লোক নন ব্রাজিলের কোচ লাজারোনি। কিন্তু তিনিও বেশ সমস্যায় পড়েছেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে, ফরোয়ার্ডে রোমারিয়া এবং কারেকার খেলার কথা, প্রয়োজনে বদলি হিসেবে নামবেন বেবেটো। কিন্তু কোপা আমেরিকা কাপে দুরন্ত খেলে সব ছক উলটে দিয়েছেন বেবেটো। নতুন করে এখন লাজারোনি দলের আক্রমণভাগ সাজাচ্ছেন। প্রয়োজনে তিন ফরোয়ার্ডেও নাকি বিশ্বকাপে খেলবে ব্রাজিল।

শিশুদের জন্য লিউইস

শিশুদের খেলাধুলোয় উৎসাহী করে তোলার জন্য একটি ছবি করছেন অমল পালেকর। কিন্তু এটাই খবর নয়। আসল খবর, তাঁর এই ছবির জন্য কার্ল লিউইস তিন মিনিটের একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আরও কয়েক মিনিটের জন্য নয় কেন? কারণটা স্পষ্ট। লিউইসের কাছে তিন মিনিটের সাক্ষাৎকারই চেয়েছিলেন পালেকর। নয়া দিল্লিতে নেহরু আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন লিউইস। সাক্ষাৎকার প্রায় কাউকেই দিতে চাননি। কিন্তু অমল পালেকরের প্রস্তাব পাওয়া মাত্রই রাজি হয়েছিলেন লিউইস। কারণটা আর কিছুই নয়, শিশুদের তিনি ভালবাসেন।

মায়ের জোরে জয়

প্রতিদ্বন্দ্বী টনি উইলসনকে প্রায় কাবু করেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচে হারলেন বক্সার স্টিভ ম্যাকওয়ার্থি। এবং হারালেন টনির মা! এই দারুণ ঘটনাটি ঘটেছে লন্ডনের নিকটবর্তী সাদার্ম্পটনের এক বক্সিং প্রতিযোগিতায়। স্টিভের ঘুষিতে রিংয়ে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন টনি।

রাগের চোটে দর্শকাসন ছেড়ে রিংয়ে চলে এসে জুতো দিয়ে স্টিভকে প্রবলভাবে পেটাতে থাকেন টনির মা। আহত স্টিভকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ফিরে এসে স্টিভ আর রিংয়ে নামতে রাজি না হওয়ায় টনিকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

দর্শক

আমি

বুলা চৌধুরী

সাঁতারে রাজ্য ও জাতীয় অনেক রেকর্ড করেছেন বাংলার মেয়ে বুলা চৌধুরী। তবু তৃপ্ত হননি। সম্পূর্ণ অন্যরকম, দূরপাল্লার সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল পেরোলেন। তথাপি তৃপ্ত নন বুলা। চ্যানেল পারাপারের স্বপ্নে আবার যাবেন আগামী বছর। তার আগে, ব্যক্তিগত অনেক কথা জানাচ্ছেন এবারের 'আমি' বুলা।

বুলা চৌধুরী *ফোটো : অলক মিত্র*

জন্মেছি :
২ জানুয়ারি, ১৯৭০।
থাকি :
হুগলির হিন্দমোটরে।
মা-বাবার :
তৃতীয় সন্তান। আগে দিদি, তারপর দাদা, আমি, আমার পরে আর এক ভাই।
সাঁতারে আকৃষ্ট হলাম, কারণ :
জল ভালবাসি। বাড়ির সঙ্গেই নিজেদের পুকুর আছে। ছেলেবেলায় ঘুমনোর সময় বাদ দিয়ে কখনওই ডাঙায় থাকতে ভাল লাগত না। জল আমায় টানত।
প্রথম যে প্রতিযোগিতায় জিতি :
ছ' বছর বয়সে, লিলুয়ার ডন বসকো স্কুলের একটা ওপেন প্রতিযোগিতায়।
জিতে মনে হয়েছিল :
মনে হবে কি, আনন্দে লাফাচ্ছিলাম।
উৎসাহ পেয়েছি :
বাড়ির সবার কাছ থেকে। বিশেষ করে মায়ের কথা বলতে হয়।
স্মরণীয় উপহার পাই :
পূর্ব জার্মানির কোচ বার্ড জনকের কাছ থেকে। ১৯৮২-র এশিয়াডের পর খুশি হয়ে তিনি আমাকে একটা সুইমিং কস্টিউম দেন।
সেরা জয় :
নেপালের 'সাফ' গেমসে। ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে পার্সিস ম্যাডনকে হারিয়েছিলাম। ব্যবধান ছিল প্রকৃতপক্ষে এক চুলের।
প্রিয় ইভেন্ট :
১০০, ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল।
জাতীয় প্রতিযোগিতায় জলে নামছি :
বহুদিন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত বাংলার হয়ে। গত বছর বিহারের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি।
সোনা পেয়েছি :
অসংখ্য। ১৯৭৯ থেকে আজ পর্যন্ত বছরে কম করে দুটো।
ভারতীয় রেকর্ড করেছি :
অসংখ্য। জুনিয়ারের সব এজ গ্রুপে, সিনিয়ারেও অনেক। সব মনে নেই।
মনে রাখার মতো ঘটনা :
ইংলিশ চ্যানেল পার-হওয়া।
স্বল্পপাল্লা ছেড়ে হঠাৎ দূরপাল্লায় ইংলিশ চ্যানেল পেরোতে গেলাম কেন :
এক জিনিস সবসময় খেতে ভাল লাগে ? মুখ বদলাতে ইচ্ছে হয় না ? আমিও পরিবর্তন চেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে স্বল্পপাল্লায় এ-দেশে আমার আর কিছু পাওয়ার নেই। তাই একটা চ্যালেঞ্জ নিলাম।
মজাদার ঘটনা :
ঘটনা নয়, মজার কথা শুনেছি। পরিচিত একজন সেদিন বললেন, "তুই ইংলিশ চ্যানেল পেরোলি, গঙ্গা পারাপার করতে পারবি ?" অনেকের ধারণাই নেই ইংলিশ চ্যানেল ব্যাপারটা কী !
দুঃখজনক স্মৃতি :
'৮৬-এর এশিয়ান গেমসে ভাল ফল করতে পারিনি। এবং '৮৮ সালে জাপানে এশিয়ান সুইমিং চ্যাম্পিয়ানশিপে যোগদানের অনুমতি পাইনি। এই দুটোই আমার দুঃখের স্মৃতি। অথচ '৮৮-তে দারুণ প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।
এশিয়ান মানে সেরকম কিছু করতে পারলাম না, কারণ :
বিদেশী কোচের সাহায্য প্রথম থেকে পেলে ভাল হত। সারা বছর অনুশীলনের সুযোগও পাওয়া যায় না এখানে।
আদর্শ সাঁতারু :
মার্ক স্পিজ অবশ্যই। ভারতে ইলা পাল।
স্পিজের সঙ্গে দেখা হলে প্রথম যে প্রশ্নটা করব :
এত খুশি হব যে, মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরবে না প্রথমে। পরে শুধু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে বলব।
সাঁতার ছাড়া প্রিয় খেলা :
অ্যাথলেটিক্স আর জিমন্যাস্টিক।
প্রিয় খেলোয়াড় :
বরিস বেকার।
খেতে ভালবাসি :
যে-কোনও ধরনের মাছ।
অবসর কাটাই :
গান শুনে আর ভি সি আর-এ সিনেমা দেখে।
চাকরি করি :
জামশেদপুরে, টিসকোতে, স্পোর্টস বিভাগে।
আর কত দিন সাঁতার কাটব :
দু'বছর তো বটেই।
ভাল সাঁতারু হতে গেলে দরকার :
কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আর সাঁতারের জন্য পুরো সময় দেওয়া। অন্য দিকে মন দিলে চলবে না।
স্বপ্ন দেখি :
ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করার।
সাঁতারু না হলে :
নাচিয়ে হতাম।

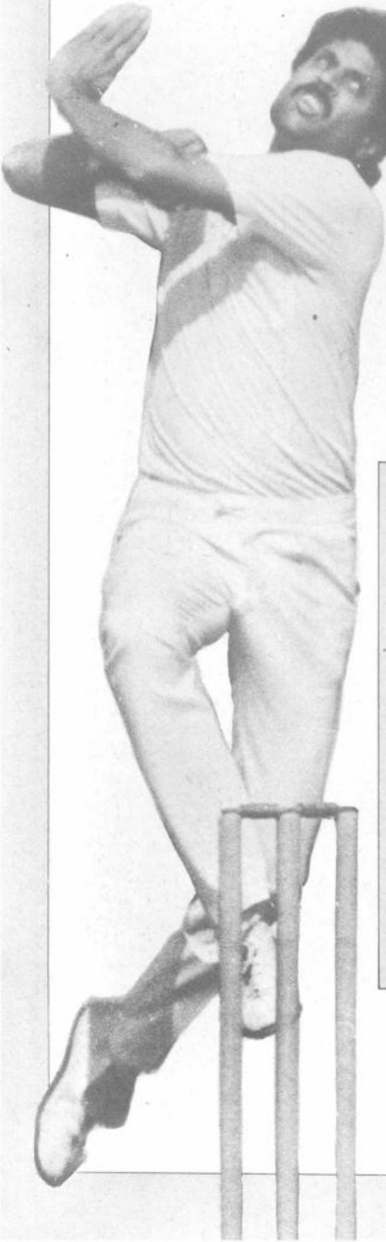

কপিল এখন যা করবেন সেটাই রেকর্ড

> বহু বছর আগে আমার কাছে ও যখন প্রথম আসে, তখনও যেমন শেখার আগ্রহ ছিল এখনও তেমনই আছে :
> দেশপ্রেম আজাদ
>
> কী মারাত্মক ব্যাপার যে কপিল করেছে তা ভাবা যায় না :
> ইমরান খান
>
> কপিল জানে না, ও কত বড় খেলোয়াড় :
> সুনীল গাওস্কর

অরূপ রায়

একশো টেস্ট খেলা নিঃসন্দেহে গৌরবের কথা। বিশ্বে অল্প কয়েকজন ক্রিকেটারই এই বিরল কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে, শরীর সুস্থ রেখে চমৎকার ফর্মে খেলে যাওয়া চরম দক্ষতার পরিচায়ক। কপিলদেব নিখঞ্জও শত টেস্ট খেললেন। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব বোধ হয় আর-একটু বেশি।

অলরাউন্ডার হিসেবে ব্যাটে, বলে এবং ফিল্ডিং-এ সমান পারদর্শিতা দেখিয়ে এগারো বছর ধরে খেলছেন কপিলদেব। সাড়ে তিনশোর ওপর উইকেট, চার হাজারের বেশি রান এবং প্রায় ষাটটি ক্যাচ— এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে কপিলদেবের অনন্যতা। এবং পরিসংখ্যানে যা প্রমাণিত হয় না তা হল, ভারতীয় দলের বিশাল দায়িত্ব তাঁকে দিনের পর দিন, এই এগারো বছর ধরে বহন করতে হয়েছে। যে দিন থেকে টেস্ট খেলছেন প্রায় সেদিন থেকেই ভারতীয় দলের বোলিংয়ের মূল দায়িত্বটা তিনিই তাঁর হাতে তুলে নিয়েছেন।

১৯৭৮ সালে পাকিস্তানের ফয়সলাবাদে কপিলদেবের টেস্ট অভিষেক, শততম টেস্ট খেললেন পাকিস্তানের মাটিতেই, করাচিতে। মধ্যে ১৯৮৫ সালে কলকাতা টেস্টে শুধু খেলেননি কপিলদেব। খেলেননি বলার চেয়ে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল বলাই ভাল। এবং সেটিও ফর্মের জন্য নয়। যদি কলকাতায় খেলতেন কপিল, তা হলে টানা একশোটি টেস্ট খেলার একটি অনন্য রেকর্ড গড়তে পারতেন তিনি। রেকর্ডের জন্য কখনও খেলেন না কপিলদেবের মতো খেলোয়াড়, কিন্তু রেকর্ডটি হলে অন্তত আমরা গর্বিত হতে পারতাম! অবশ্য এখনও গর্ব কিছু কম নয়।

কপিল সম্পর্কে দারুণ প্রশংসা করেছেন ইমরান খান। ইমরান বলেছেন, "কী মারাত্মক ব্যাপার যে কপিল করেছে তা ভাবা যায় না। অলরাউন্ডারদের পক্ষে একশো টেস্ট ম্যাচ খেলা মানেই প্রাণান্তকর ব্যাপার।" মজার উক্তি করেছেন সুনীল গাওস্কর, "কপিল জানে না ও কত বড় খেলোয়াড় এবং জানে না বলেই বোধ হয় এত ভাল খেলে যাচ্ছে।"

কপিল যখন প্রথম টেস্ট খেলেন তখন স্বপ্নেও ভাবেননি শত টেস্ট খেলবেন। শত উইকেট পাওয়াই তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল। ভারতে কোনও পেসারের এই কৃতিত্ব ছিল না। ইমরান জানিয়েছেন, আটাত্তর সালে প্রথম দর্শনেই তিনি কিন্তু বুঝেছিলেন ছেলেটি অনেকদূর যাবে। কারণ কী? প্রথমত, কপিলের চমৎকার অ্যাকশন। দ্বিতীয়ত, ওঁর নিয়ন্ত্রণ। বলের ওপর কপিলদেবের দারুণ কন্ট্রোল মুগ্ধ করেছিল ইমরানকে।

এই দুটি বৈশিষ্ট্য থাকলেও একদিনে কিন্তু গড়ে ওঠেনি কপিলদেবের সাজানো ভাণ্ডার। দিনের পর দিন পরিশ্রমে, অভিজ্ঞতায় নিজেকে মার্জিত করেছেন তিনি। ইনসুইং, আউটসুইং, ইয়র্কার প্রভৃতি অস্ত্র তিনি ক্রমশ শাণিত করে তুলেছেন। সঙ্গে মিশিয়েছেন বুদ্ধিমত্তা। কপিলের মধ্যে সহজাত একটা ব্যাপার আছে। এবং সেটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ব্যাটিং-এর সময়। ব্যাটে যখন তিনি ঝড় তুলতে থাকেন, তখন সেরা বোলাররাও অতি সহজে উড়ে যান বাউন্ডারি লাইনের বাইরে। অন্যদের অবদান অস্বীকার না করেও বলা যায়, জিম্বাবোয়ের ১৯৮৩-এর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে কপিলের অনবদ্য অপরাজিত ১৭৫ রানের দুরন্ত ইনিংসটিই ভারতের কাপ জয়ের টার্নিং পয়েন্ট। অর্থাৎ, বিশ্ব-ক্রিকেটে ভারতের একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার প্রধান রূপকারও কপিলদেবই।

এখন পর্যন্ত টেস্টে কপিলের সেরা ব্যাটিং ইনিংস কোনটি? আমরা তিন-চারটির কথা এখনই বলতে পারি। কিন্তু কপিলের নিজের পছন্দটিই এখানে শোনা যাক, "১৯৮৬-তে মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টাই টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলাম। ওটাই আমার সেরা ব্যাটিং।" আর সেরা বোলিং? মাদ্রাজেই। ১৯৭৯ সালে, সবে টেস্ট অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন কপিল। সেবার পাকিস্তানের বিপক্ষে দু' ইনিংসে ১১টি উইকেট নিয়েছিলেন।

কপিলের দেখা সেরা বোলার অবশ্যই ডেনিস লিলি। অলরাউন্ডারদের মধ্যে

> অলরাউন্ডার হিসেবে ব্যাটে, বলে এবং ফিল্ডিং-এ সমান পারদর্শিতা দেখিয়ে এগারো বছর ধরে খেলছেন কপিলদেব। সাড়ে তিনশোর ওপর উইকেট, চার হাজারের বেশি রান এবং প্রায় ষাটটি ক্যাচ—এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে কপিলদেবের অনন্যতা। এবং পরিসংখ্যানে যা প্রমাণিত হয় না তা হল, ভারতীয় দলের বিশাল দায়িত্ব তাঁকে দিনের পর দিন, এই এগারো বছর ধরে বহন করতে হয়েছে।

কপিলদেবের মতে, ব্যাটিং-এ বথাম এগিয়ে, বোলিং-এ ইমরান এবং হ্যাডলি অনেক বড়। এটা কপিলের বিনয়। অবশ্য বিনয় তো কপিলদেবের মতো খেলোয়াড়েরই ভূষণ হওয়া উচিত!

জীবনে অনেক সম্মান পেয়েছেন কপিল। বাধাও কি কম এসেছে? ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তো আছেই, শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও এসেছে। হাঁটুতে চোট পেয়েছেন, পেস বোলারের কাছে যা মারাত্মক আঘাত। মনের জোর, পরিশ্রম, আন্তরিকতায় সেসব কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। কপিলের কোচ দেশপ্রেম আজাদ বলেছেন, "ও বড় হবে না কেন? বহু বছর আগে আমার কাছে যখন প্রথম আসে তখনও যেমন শেখার আগ্রহ ছিল, এখনও সময় পেলে যখনই আসে ঠিক তেমনই আগ্রহ নিয়ে শেখে।"

শত টেস্ট খেলা হয়ে গেল, কপিলের সামনে এখন চারশো উইকেটের হাতছানি। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সে বাধাও কপিল অতিক্রম করবেন। কেননা, কোনও বাধায় কপিলদেবের মতো ক্রিকেটারকে আটকানো যায় না!

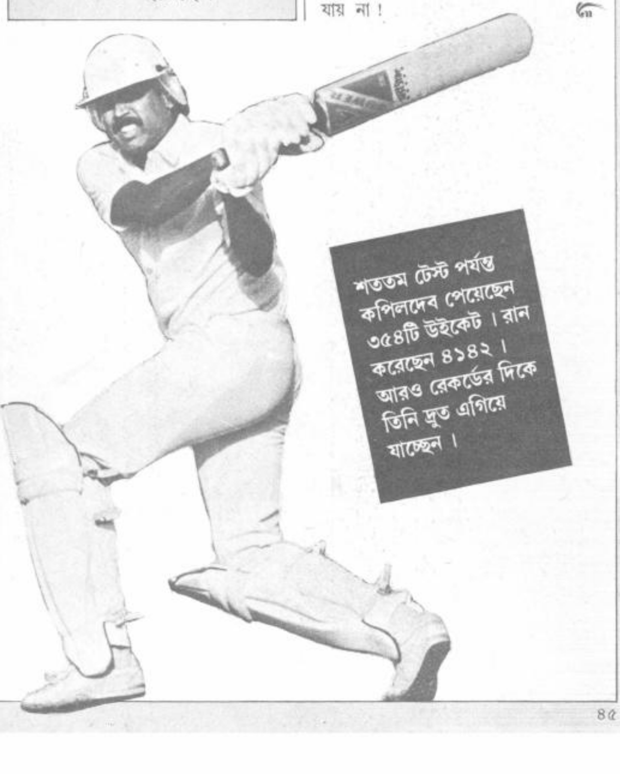

শততম টেস্ট পর্যন্ত কপিলদেব পেয়েছেন ৩৫৪টি উইকেট। রান করেছেন ৪১৪২। আরও রেকর্ডের দিকে তিনি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

গৌতম সরকার

মাঝমাঠের লড়াই

পূর্ব প্রকাশিতের পর

জীবনে সাফল্য, সম্মান, ভালবাসা যেমন অনেক পেয়েছি, অপমানও তেমন কম পাইনি। কিন্তু কেন জানি না, এখন মনে হয়, সেই অপমানগুলো কিছুই না। অন্তত, ভালবাসা যা পেয়েছি তার তুলনায় সেগুলো সত্যিই কিছু ছিল না। তখন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করত, রাগে, ক্ষোভে গা জ্বলত। সময় সময় এমন অপমানিত হয়েছি যে, মনে হয়েছে খেলা ছেড়ে দিই। কিন্তু আগেই বলেছি, আমার চারপাশে মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ এমন কিছু মানুষ আমি পেয়েছি, যাঁরা আমাকে ওই সিদ্ধান্ত নিতে দেননি। গৌতম ছাড়া ফুটবল বাঁচবে, কিন্তু ফুটবল ছাড়া গৌতম কি বাঁচার মতো বাঁচত ? যা কিছু ভালবাসা, সম্মান সবই তো ওই চামড়ার গোল বলটার দৌলতে।

চুয়াত্তরের এশিয়ান গেমসে দলে এসেছিলাম—কিন্তু কীভাবে ? পাতিয়ালা ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার চিঠি পরে পাওয়ায় আমার আর অশোকলাল ব্যানার্জির পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। পৌঁছে দেখি ক্যাম্প শুরু হলেও অন্য অনেক প্লেয়ার আসেনি। কিন্তু কয়েকজন কর্মকর্তা আমাদের পরিষ্কার বলে দিলেন, যোগ দেওয়া যাবে না। অনেক অনুরোধ করলাম, আমার কলকাতায় নানা ম্যাচ খেলার ফলে প্র্যাকটিসের মাঝেই আছি। যে ক'দিন আসতে পারিনি, অতিরিক্ত প্র্যাকটিস করে সেটুকুও 'কভার' করে দেব। কিন্তু কিছুতেই কর্মকর্তারা মানলেন না। এমনকী, কোচ বাঘাদাকে দিয়ে বলানো সত্ত্বেও ওঁদের টলানো গেল না। মনমরা হয়ে কলকাতা ফিরে আসছি, দেশের হয়ে খেলতে পারব না, এই দুঃখ কুরে কুরে খাচ্ছিল। দুঃখই হঠাৎ বদলে গেল রাগে, ক্ষোভে, যখন শুনলাম সময়মতো যোগ না দেওয়া কয়েকজন খেলোয়াড় দিব্যি দলে এসেছেন। তাঁরা 'তারকা' বলেই নাকি শৃঙ্খলার প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয়নি। আমরা স্টার না হতে পারি, কিন্তু কিছু খেলা নিশ্চয় দেখাতে পেরেছিলাম, তা না হলে ক্যাম্পে ডাক পাব কেন ? এইভাবে ডেকে অপমান করার কী মানে হয় ? বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে কী বলব ? লজ্জায় মনে হচ্ছিল, খেলাই ছেড়ে দিই। ভাগ্যিস ছাড়িনি, কেননা এরকম বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা তো জীবনে কম ঘটেনি।

যাই হোক, এ-ক্ষেত্রে অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমি বঞ্চিত হলাম না। অপমান করার সঙ্গে সঙ্গে মান দেওয়ার লোকও তো আছেন। তাঁদেরই একজন চেষ্টা করে আমাকে ভারতীয় দলে ঢোকালেন।

এসব তো সাধারণ ঘটনা। আরও কতবার এরকম হয়েছে। ১৯৭৮ সালের এশিয়ান গেমসেও বঞ্চিত হলাম। তবে খুব দুঃখ পেয়েছি আমারই প্রিয় দুই দলের কাছ থেকেই কঠিন আঘাত পেয়ে। আগেই বলেছি মোহনবাগান ছেলেবেলা থেকে আমার প্রিয় ক্লাব। সেই ক্লাব থেকেই ১৯৭৭ সালে আমাকে আর সুধীরকে শুনতে হয়েছিল 'বিশ্বাসঘাতক' অপবাদ। ১৯৭৬ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছ থেকে প্রথমে পেলাম চরম অপমান। মরসুমের শেষের দিকে একটা সাধারণ টুর্নামেন্টে আমি, সুধীরসহ কয়েকজন সিনিয়ার প্লেয়ার যেতে চাইনি। আমার প্রচণ্ড জ্বর ছিল, তবু যেহেতু আমি দলের অধিনায়ক, জোর করে, কর্মকর্তারা আমায় নিয়ে গেলেন। খেলতে না পেরে আমি ফিরে এলাম। কিছুদিন পরেই দল থেকে আমাদের সাসপেন্ড করা হল। আকাশ থেকে যেন বাজ ভেঙে পড়ল। যে দলের সুখে-দুঃখে এতদিন জড়িয়ে ছিলাম, ভাবতেও পারিনি সেই ক্লাব থেকে এরকম আঘাত পাব। টানা পাঁচ বছর খেলার পর আমাকে জানানো হল, আমি ক্লাবের কেউ না।

গোপনে আমার একটা স্বপ্ন ছিল। শুনেছি, ইস্টবেঙ্গলে সর্বাধিক সময় খেলার রেকর্ড ছিল রামবাহাদুরের। ভেবেছিলাম, আমি সেই রকর্ড ভাঙব। ইস্টবেঙ্গলে খেলেই যখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, আমার সমস্ত পরিশ্রম, দক্ষতা উজাড় করে দিয়ে যাব এই ক্লাবের জন্যই। কিন্তু তা আর হল না। ইস্টবেঙ্গলে খেলতে খেলতেই আমি অন্য দুই বড় দলের কাছ থেকে ভাল পেমেন্টের অফার পেয়েছি। কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছি, কারণ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে আমি তো খারাপ টাকা পাইনি। তা ছাড়া, এত ভাল পরিবেশ, ব্যবহার ছেড়ে যেতেও মন চাইছিল না। লাল-হলুদ জার্সির প্রতি আমার এমনই এক মোহ জন্মে গিয়েছিল যে, অনেকে বলতেন, ওই জার্সি পরলেই নাকি আমি জ্বলে উঠি। হায়, তখন কে জানত এই লাল-হলুদ জার্সি অমি আর জীবনে পরতে পারব না!

সাতাত্তরে বিষণ্ণ মনে ছাড়লাম ইস্টবেঙ্গল। এবং আমাকে আর সুধীরকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে গ্রহণ করল মোহনবাগান।

অথচ লিগে যখন মোহনবাগান তারকাখচিত দল নিয়েও অপ্রত্যাশিতভাবে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারল সমরেশ আর মিহিরের দেওয়া দুর্দান্ত দুটো গোলে, সমস্ত দোষ আর অপবাদের শিকার হতে হল আমাকে আর সুধীরকে। আমরা নাকি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলেছি। সুধীরের মতো ছেলেকে এই দোষ ? ভাবাই যায় না। মোহনবাগান ক্লাবের কাছ থেকে চূড়ান্ত অপমানিত হলাম ঠিকই, তবে ওই অপমানই বোধ হয় আবার আমাকে জাগিয়ে তুলল।

ক্লাব-ক্লাব বলছি বটে, অথচ অপমান তো খেলোয়াড়দের করেন কয়েকজন কর্মকর্তা, গুটিকয়েক উগ্র সমর্থক। সাময়িক জয় হয়তো এদের হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরা ক্লাবের ইতিহাস থেকে মুছে যায়। এদের কেউ মনে রাখেন না।

আমিও এদের নাম ভুলে গেছি, ঘটনাও অনেক মনে নেই। যা বললাম, তাও আস্তে আস্তে ভুলে যাব। কিন্তু মনে থাকবে, ছিয়াত্তরে লিগে ইস্টবেঙ্গল হারার পরও সমর্থকদের কাছ থেকে যে ভালবাসা পেয়েছিলাম, তার কথা। আমার অধিনায়কত্বেই দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকদিন পর ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের কাছে কলকাতায় হারল। কিন্তু খেলার শুরুতেই গোল খেয়েও আমরা যা খেলেছিলাম, সমর্থকরা তা দেখে চোখে জল নিয়েও আমাদের প্রবল অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেই বিকেলটা এখনও এক মধুর স্মৃতি হয়ে আছে। (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

কিম-এর পাঁচটি বিশ্বরেকর্ড

সুইজারল্যাণ্ডের লুজান-এ বিশ্ব তীরন্দাজি চ্যাম্পিয়ানশিপে শোরগোল তুলেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার ১৮ বছরের মেয়ে কিম সু নিয়ং। সাম্প্রতিক এই বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় কিম পাঁচ-পাঁচটা বিশ্বরেকর্ড করেছেন, ব্যক্তিগত ইভেণ্টে জিতেছেন সোনা। চোংজু গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী কিম বিগত সোল ওলিম্পিকে মেয়েদের তীরন্দাজিতেও দু'টি সোনা জিতেছিলেন। কোরিয়ার মেয়ে-তীরন্দাজদের জাতীয় প্রশিক্ষক লি কি শিক বলেছেন, 'কিম বেশ ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে। তীর ছোঁড়ার সময় ওর সামনে শুধু লক্ষ্যটাই থাকে। ওর গায়ের জোরও কম নয়।' জানা গেছে, কোরিয়ার প্রশিক্ষকরা তীরন্দাজদের হাতের পেশীর জোর বাড়ানোর তালিমটাই আগে দিয়ে থাকেন। তারপর লক্ষ্যভেদ। কোরিয়ার তীরন্দাজি সংস্থাও বিদেশ থেকে কার্বন-তীর আমদানি করেছেন। বাতাসে এই তীর দিকভ্রষ্ট হয় না। তাইওয়ানের একজোড়া ঝোড়ো জায়গায় নিখুঁত লক্ষ্যে তীর ছোঁড়ারও তালিম নিয়েছেন কোরিয়ার তীরন্দাজরা।

আউইতার চমক

আমেরিকার কার্ল লিউইস, না মরক্কোর সৈয়দ আউইতা ? বিশ্বের সেরা অ্যাথলিট এখন কে ? কার্ল লিউইসের দিকে পাল্লাটা বোধ হয় কিছুটা ভারী। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আউইতাও কিছু কম যান না। সেরা অ্যাথলিট যদি বলতেই হয় তা হলে তাঁরা সেই সম্মান দেবেন আউইতাকে। এক মাইল, ১৫০০, ২০০০, ৩০০০ এবং ৫০০০ মিটার—এই পাঁচ পাঁচটি ইভেণ্টের বিশ্বরেকর্ড এখন আউইতার দখলে। সত্যিই, অ্যাথলিটদের কাছে আউইতা রীতিমত বিস্ময়। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে চমকটি দিয়েছেন, তার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন বলে মনে হয় না। কিছুদিন আগে আউইতা এক প্রশ্নোত্তরে জানান, ভারতের সঙ্গে তাঁর

বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে। ছেলেবেলায় তিনি ভারতীয় ফিল্ম দেখতেন। খুব ভাল লাগত। 'দোস্তি' ছবিটি দেখে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, এখনও ভোলেননি। রাজকাপুর তাঁর প্রিয় অভিনেতা। প্রিয় অভিনেতা- অভিনেত্রী প্রসঙ্গে তিনি বোম্বাইয়ের কয়েকজন চিত্রতারকার নাম এক নিশ্বাসে বলে দিয়েছিলেন।

কম্পিউটার প্রোগ্রামার, টি-টেস্টার...

ক্রিকেট খেলা এখন লাভজনক পেশা। ক্রিকেট থেকেই খেলোয়াড়রা এখন অনেকেই বেশ ভালভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। অনেকে আবার সাধারণ একটা পেশা নিয়ে জীবন শুরু করে পরে বিখ্যাত ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন। অতীতের ও এখনকার ক্রিকেটাররা কে কী পেশায় ছিলেন, বা আছেন, তা নিয়ে অনেকেরই কৌতূহল আছে। সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়া দলের ডাগ ওয়াল্টার্স ও ট্রেভর চ্যাপেল যুগ্মভাবে একটি ট্র্যাভেল এজেন্সির মালিক। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড কাজ করেন গায়েনার স্বাস্থ্য মন্ত্রকে। গায়েনার ক্রীড়ামন্ত্রী রয় ফ্রেডেরিক্‌স। তিনি ছিলেন ওপেনিং ব্যাটসম্যান। ভিভ রিচার্ডস আন্তিগুয়ার সেন্ট কিট্‌স-এর একটি রেস্তরাঁয় ওয়েটার ছিলেন। কম্পিউটার প্রোগ্রামার ছিলেন মাইকেল হোল্ডিং এবং টেলিফোন অপারেটর জোয়েল গার্নার। ইংল্যান্ড দলের প্রাক্তন ওপেনার গ্রিম ফাউলার সাঁতারের প্রশিক্ষক হিসেবে নাম করেছিলেন। ফুটবল কোচ হিসেবে দেখা গেছে রোলান্ড বুচারকে। ইংল্যান্ডের ওয়েন লারকিন্স ও অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ব্যাটসম্যান জিওফ মার্শ কৃষক। অনেকের অনেক রকম পেশা, যার সঙ্গে ক্রিকেটের যোগ নেই। শ্রীলঙ্কার রবি রত্নায়কে 'টি টেস্টার'। চায়ের স্বাদ ও গন্ধ কেমন তা তিনি পরীক্ষা করেন। স্বাদ ও গন্ধের ওপরেই চায়ের গুণগত মান ও দাম নির্ভর করে। শ্রীলঙ্কা দলেরই সিধাথ ওয়েত্তেমুনি 'জুয়েলার'। তিনি রত্নব্যবসায়ী। দামি গয়নায় হিরে বসানোর কাজ করতেন ইংল্যান্ড দলের ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ডিলি। কেন্ট দ্বিতীয় একাদশের হয়ে খেলতে গিয়ে প্রথম চাকরি তাঁকে খোয়াতে হয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেককেই নানা রকম পেশায় দেখা গেছে। আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞ চান্দু সারভাতের নামই বোধ হয় এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

ভিভ রিচার্ডস

ক্লাইভ লয়েড

জিওফ মার্শ

ক্রিকেটের প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

(১) একদিনের ক্রিকেটে ভারতের পক্ষে প্রথম উইকেট কে পান ?
(২) টেস্টে প্রথম ত্রিশতাধিক রান করেন কে ?
(৩) একটি টেস্টে ম্যাচের দু' ইনিংসেই হ্যাটট্রিক করেছেন কোন বোলার ?
(৪) উইকেটকিপার বাদ দিয়ে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সর্বাধিক ক্যাচ ধরার রেকর্ড কার ?
(৫) ভারতের কোন ক্রিকেটার একদিনের ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি করেন ?
(৬) সেঞ্চুরি হওয়া ওই ম্যাচটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, সেটি কি ?
(৭) টেস্টে ন'শোর বেশি রান এক ইনিংসে ক'বার হয়েছে ?
(৮) এই উপমহাদেশের ক'জন ক্রিকেটার দু'দেশের হয়ে টেস্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ?
(৯) 'জেড' বইটি কোন বিখ্যাত ক্রিকেটারের লেখা ?
(১০) ভারতের ক'জন ক্রিকেটার টেস্টে ডবল সেঞ্চুরি করেছেন ?

উত্তর

(১) একনাথ সোলকার । ১৯৭৪-এর সিরিজে হেডিংলিতে ডি· এল· অ্যামিসকে এল· বি· ডব্লু আউট করেন তিনি ।
(২) ইংল্যান্ডের অ্যান্ডি স্যান্ডহাম । তিনি

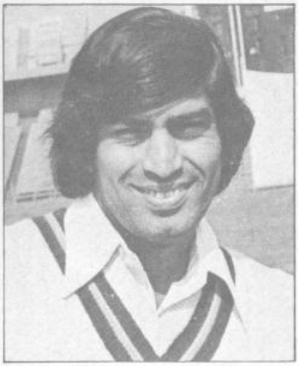

একনাথ সোলকার

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংসটন, জামাইকায় ১৯২৯-৩০ সিরিজে প্রথম ইনিংসে ৩২৫ রান করেন ।
(৩) টি· জে· ম্যাথুজ । অস্ট্রেলিয়ার এই বোলার ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টারে এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হন । সেটি ছিল প্রথম টেস্ট । তিনি প্রথম ইনিংসে ১৬ রানে তিনটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন । বলার মতো ঘটনা, খেলার দ্বিতীয় দিনেই তিনি ৬টি উইকেট নেন ।
(৪) ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঙ্ক উলির । ৩৩ বছরের (১৯০৬-৩৮) ক্রিকেট জীবনে তিনি ১০১৮টি ক্যাচ নেন ।
(৫) কপিলদেব । ১৯৮৩ সালের তৃতীয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট-প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের টেস্ট ব্রিজ ওয়েলসে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিনি অসাধারণ ১৭৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ।
(৬) ব্রিটিশ টেলিভিশন কর্মীরা ধর্মঘট করায় ওই ম্যাচটির কোনও ছবি তোলা হয়নি । অর্থাৎ, ওটির কোনও রেকর্ডই নেই ।
(৭) একবারই মাত্র । ৭ উইকেটে ৯০৩ রান করে ডিক্লেয়ার । ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলায়, ওভালে ১৯৩৮ সালে ।
(৮) চারজন । এ· এইচ· কারদার (ভারত এবং পাকিস্তান), আমির ইলাহি (ভারত-পাকিস্তান), পতৌদির নবাব (সিনিয়ার) (ভারত এবং ইংল্যান্ড) এবং গুল মহম্মদ (ভারত এবং পাকিস্তান) ।
(৯) পাকিস্তানের বিখ্যাত ক্রিকেটার জহির আব্বাসের ।
(১০) সাতজন । এঁরা হলেন : পলি উমরিগড়, ভিনু মাঁকড়, দিলীপ সারদেশাই, মনসুর আলি খান পতৌদি, সুনীল গাওস্কর, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ এবং অংশুমান গায়কোয়াড় ।

কথায়-কথায়

এতদিন মাঠের মধ্যে থেকে লড়াই করেছি । এবার বাইরে থেকে করব । চ্যালেঞ্জ থেকে কখনও পিছোইনি ।
গৌতম সরকার (বাংলা দলের কোচ হওয়ার পর)

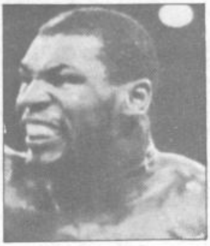

বক্সিং-এ আমি জয়ী, এবার কলেজ ডিগ্রি নিয়ে লেখাপড়াতেও আমি বিজয়ী হব ।
মাইক টাইসন

সঞ্জয় মঞ্জরেকরের টেকনিক ও টেম্পারামেন্ট চমৎকার । দারুণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে ও ।
—ইমরান খান
(প্রথম টেস্টে সঞ্জয় সেঞ্চুরি করার পর)

এক নম্বর হতে গেলে যে শুধু ম্যাচের পর ম্যাচ জিততেই হবে তা নয়, মানুষ হিসেবেও অনেক উঁচুতে উঠতে হয় ।
বরিস বেকার

সলিল আঙ্কোলা

ফোটো : উৎপল সরকার

পর্যটন বিভাগ, ভারত সরকার

এই দেখ! পাথরের ওপর মাথার খুলি আর হাড় আঁকা— বিপদ চিহ্নের মত।
ভেতরে গেলে তোমার মনে হবে ঠিক যেন প্রাচীন রাজা রাজড়ারা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।
কি রকম নি:ঝুম! শান্ত!
কিন্তু এই দেওয়াল আঁচড়ানো আর হাতুড়ি মারার শব্দ কেন?
THAK
THAK
THAK
TONY ♥ S
ধরেছি!
আ—হ!
আপনি ইতিহাস বিকৃত করছেন। ঐতিহ্যকে হত্যা করছেন।
TONY ♥ S
জঘন্য অপরাধ! দেখবেন আপনাদের অবস্থা কি হয়।
আমরা আপনাদের বাইকের নম্বর টুকে নিয়েছি। পুলিশকে রিপোর্ট করে দেব।
4
আমরা লজ্জিত। এ ভয়ঙ্কর বোকামি।
আমি দু:খিত। আর কখনও করবো না।
শুধু 'কখনও করবো না' নয়, অন্য কেউ এরকম বোকার মত কাজ করতে গেলে তাকে বাধা দেবেন।
আমরা রক্ষা করতে পারি এবং করব
ভারতের মহান সৌন্দর্য
আপনাদেরও উচিত অবিবেচক লোকদের পরিবেশ নষ্ট করতে না দেওয়া। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে ভারতের সৌন্দর্যকে চিরকাল ধরে রাখতে পারব।

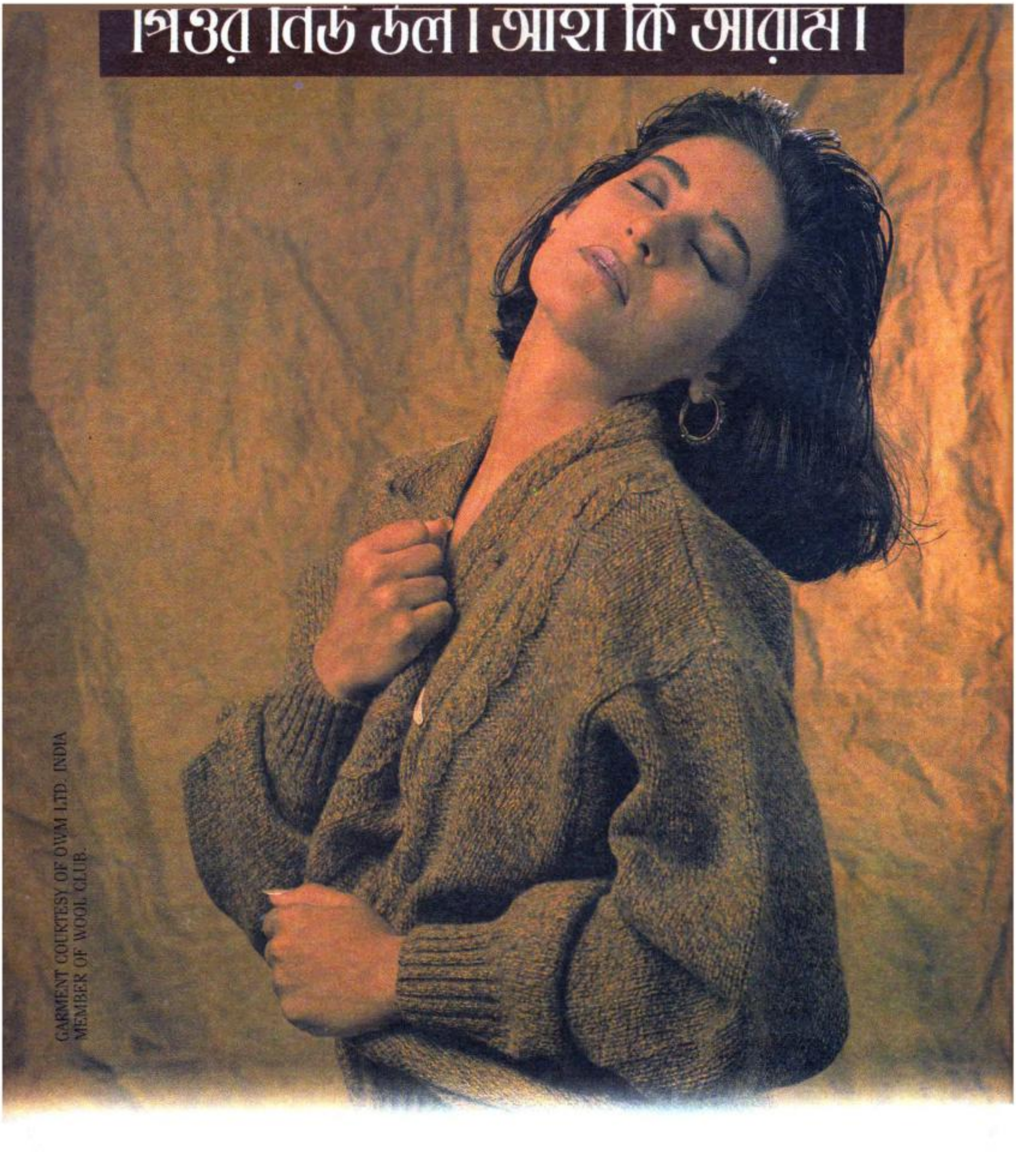

পিওর নিউ উল-এর তৈরী বস্ত্র বা পোশাকের জুড়ি হয় না। এতে স্বাভাবিক ভাবে হাওয়ার আদান-প্রদান হয় – তাতে গায়ে ঘাম বসে না বা লেপ্‌টে থাকে না – কুঁচকিয়ে যায় না, ভাঁজের দাগ পড়ে না। শীতকালে আরামে রাখে, গ্রীষ্ম কালে স্নিগ্ধ। যে ভাবেই পরবেন ঠিক সেই ভাবেই থাকবে। এবং সবথেকে বড় কথা পিওর নিউ উলের কদর দিন দিন বাড়তেই থাকে।

পিওর নিউ উল। পরেই দেখুন না!

Woolmark
(উলমার্ক)

PURE NEW WOOL

O&M/5371

প্রতিপক্ষের মার আটকানোর আরও দুটি কৌশল

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

কিওকুশিন ক্যারাটের ব্লক বা প্রতিপক্ষের মার আটকানোর কৌশল নিয়ে গত সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এবারও আমি দুটি অন্য রকমের ব্লক নিয়ে আলোচনা করব। আগেই আলোচনা করেছি যে, ব্লক অনুশীলন খুবই একাগ্রতার সঙ্গে এবং ভালভাবে বুঝে নিয়ে করা ভাল, তা না হলে প্রতিপক্ষের আঘাতে শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে। এবারে যে ব্লক দুটো নিয়ে আলোচনা করব তার একটির নাম—সিকেন সোতো উকি এবং অন্যটির নাম—সিকেন উচি উকি।

সিকেন সোতো উকি : সিকেন কথার অর্থ আগেই বলেছি, সোতো উকি কথার অর্থ শরীরের মধ্যভাগের বাইরে থেকে ভেতরের ব্লক। আগেই আলোচনা করেছি যে, কিওকুশিন ক্যারাটের হাতের সাহায্যে মারার বা মার-আটকানোর পদ্ধতিগুলো মোটামুটি সবই প্রায় সানচিনদাচি থেকে অনুশীলন করা হয়। এখানেও প্রথমে ইওদাচিতে দাঁড়াতে হবে, তারপর ঠিকভাবে সানচিনদাচিতে দাঁড়াতে হবে। এইবার সানচিনদাচিতে হাতের অবস্থান ইংরেজির 'ভি' অক্ষরের থেকে সরিয়ে এনে ডান হাতটা ডান দিকের পাঁজরার সঙ্গে স্পর্শ করে রাখতে হবে এবং বাঁ হাতটা সামনের দিকে কাঁধের সমান উচ্চতায় মুঠো শক্ত করে শরীরের ওপরভাগ ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরিয়ে কোমর থেকে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে হবে। এবার ডান হাত দিয়ে ব্লক শুরু করতে হবে। প্রথমে বাঁ হাতটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে বাঁ মুঠোটা ডান হাত

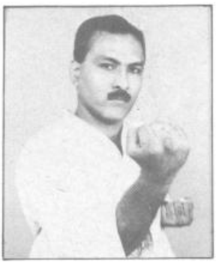

শরীরের যেখান থেকে শুরু, সেখানে স্পর্শ করে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে ডান হাতটা যেখানে ছিল সেখান থেকে সরিয়ে ডান মুঠো ডান কানের পেছন দিকে মাথার কাছে রাখতে হবে। এবার ডান হাতটা মাথার পেছনের থেকে ঘুরিয়ে (হাতের কনুই থেকে একটু মুড়ে) শরীরের সামনের দিকে আনতে হবে। ডান মুঠোর আঙুলের অংশ শুরুতে মাথার দিক করে থাকবে এবং যখন হাত ঘুরিয়ে

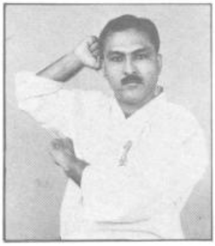

সামনে আসবে, আসার সময় মুঠোর আঙুলের অংশ বাইরের দিক করে আসবে এবং ঠিক ব্লক করার সময় শরীরের সামনের দিকে এসে আঙুলের অংশ ভিতর দিকে ঘুরে শেষ হবে। সেই সঙ্গে বাঁ হাতটা ডান হাত শরীরের যেখানে যুক্ত, সেখান থেকে সরে এসে বাঁ পাঁজর স্পর্শ করে থাকবে। এইভাবে ডান হাতের ব্লক হয়ে গেলে বাঁ হাতের ব্লক অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে প্রতি হাতে কুড়ি বার অভ্যাস করা দরকার। তারপর আস্তে-আস্তে কিছুদিন পর স্পিড বাড়ানো ভাল। ডান হাতের ব্লক অনুশীলন করার সময় কোমর থেকে শরীরের ওপরভাগ বাঁ দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরবে এবং যখন বাঁ হাতের ব্লক অনুশীলন করবে তখন শরীরের ওপরভাগ ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরবে।

সিকেন উচি উকি : সিকেন কথার অর্থ আগেই বলেছি, উচি উকি কথার অর্থ শরীরের মধ্যভাগের ভেতর থেকে বাইরের ব্লক। প্রথমে ইওইদাচিতে তারপর একইভাবে সানচিনদাচিতে দাঁড়াতে হবে। তারপর ডান হাতের মুঠো ডান পাঁজরার সঙ্গে স্পর্শ করে রাখতে হবে এবং বাঁ হাত শরীরের সামনে কাঁধ-সমান উচ্চতায় কনুই থেকে নব্বই ডিগ্রি মুড়ে রাখতে হবে। এবার ডান হাতে প্রথম ব্লক করতে হবে। প্রথমে ডান হাত যেখানে ছিল সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে বাঁ হাতের তলা দিয়ে বাঁ পাশে পাঁজরার ভেতর দিকে প্রায় পিঠের কাছে স্পর্শ করে বাঁ হাত ডান হাত শরীরের যেখান থেকে শুরু সেই অংশ স্পর্শ করে রাখতে হবে। অনেকটা কাউকে দু' হাতে জাপটে জড়িয়ে ধরলে যেরকম হয়, সেইরকমভাবে। এইবার ডান হাত ঘুরিয়ে বাইরের দিকে নিয়ে আসতে হবে যতক্ষণ না নিজের শরীরের ওপরভাগ ঠিকভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়। এবার ঠিক এইভাবে বাঁ হাত দিয়ে ব্লক অনুশীলন করতে হবে, প্রতি হাতে অন্তত কুড়ি বার। যে হাত দিয়ে ব্লক করা হবে সেই হাত নীচ দিয়ে আনতে হবে এবং ঠিক আগের ব্লকের মতো বাঁ হাতে ব্লক হলে শরীরের ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরবে এবং ডান হাতে ব্লক হলে শরীরের ওপর ভাগ কোমর থেকে বাঁ দিকে ঘুরবে। এই দুটো ব্লকের সময় হাত কনুই থেকে ৯০ ডিগ্রি মুড়ে থাকবে এবং হাত কনুই-এর কাছে শরীর থেকে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি দূরে থাকবে।

ফোটো : উৎপল সরকার

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৯ ডলার অথবা ২১ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

বিজ্ঞানে নোবেল : ১৯৮৯

বিমল বসু

বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিবারই রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এবার এই তিনটি বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচজন এবং পশ্চিম জার্মানির একজন বিজ্ঞানী নোবেল পেয়েছেন। তাঁদের গবেষণার কথা আলোচনা করা হল এই নিবন্ধে।

এতদিন জানা ছিল, পৃথিবীতে প্রাণের আদিমতম অণু—প্রাণসৃষ্টির প্রথমতম বীজটির নাম ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি এন এ। জীবকোষের অন্দরমহলে ডি এন এ-র একচ্ছত্র আধিপত্যে এবার বুঝি চিড় ধরল। বিজ্ঞানীরা যাকে এতকাল নেহাতই ডি এন এ-র হুকুমবরদার বলে মনে করতেন সেই আর এন এ (রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড) এসে দাঁড়িয়েছে পাদপ্রদীপের আলোয়। দেখা যাচ্ছে, শুধু হুকুম তামিল করতেই নয়, সৃষ্টির কাজেও আর এন এ-র একটা মস্ত ভূমিকা আছে। রিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের এই অজ্ঞাত চরিত্র আবিষ্কার করেছেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস সেচ এবং সিডনি অল্টম্যান। আর এই গবেষণার জন্য রসায়নে ১৯৮৯ সালের নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁরা। পুরস্কার প্রাপক হিসাবে এঁদের নাম ঘোষণা করে সুইডিশ অকাদেমি বলেছেন, সেচ ও অল্টম্যানের গবেষণার ফলে জিন-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন একটি অস্ত্র সংযোজিত হল, ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ প্রতিরোধে যা অব্যর্থ হয়ে উঠতে পারে।

কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টমাস সেচের বয়স মাত্র ৪২। সিডনি অল্টম্যান ৫০। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়ান। আর এন এ নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এঁদের গবেষণা শুরু হয় সাতের দশকে। আটের দশকের গোড়ার দিকেই আর এন এ-র নতুন চরিত্র তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেন। আমরা জানি, জীবকোষের অন্দরমহল অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে সুতোর মতো ক্রোমোজোমগুলি অসংখ্যা জিন-এর সমষ্টি, যেন জিনের বহু বিচিত্র পুঁতিতে গাঁথা এক একটি মালা। সব জিনের মূল উপাদান হল ডি এন এ। আর এই ডি এন এ-র মধ্যেই রয়েছে এক-একটি জীবের প্রাণ-সঙ্কেত। ডি এন এ-র হাতেই জীবের জন্ম-বৃদ্ধি, বুদ্ধি-বৃত্তি, দেহের যাবতীয় গঠনবৈচিত্র্যের চাবিকাঠি। কোষের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, এনজাইম ইত্যাদি তৈরির ফরমুলা বাতলে দেয় ডি এন এ। অন্যদিকে, আর এন এ-র কাজ হল, কোষের বিভিন্ন অংশে সেইসব সূত্রের তথ্যগুলি ঠিক-ঠিক পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ, আর এন এ নেহাতই 'বার্তাবাহক' বা 'মেসেঞ্জার'। এতদিন বিজ্ঞানীরা শুধু এটুকুই জানতেন। সেচ এবং অল্টম্যানের গবেষণা এর মূলে আঘাত হেনেছে। তাঁরা দেখিয়েছেন, বার্তাবহন ছাড়াও কোষের মধ্যে প্রাণরাসায়নিক ক্রিয়ায় আর এন এ ক্যাটালিস্ট অর্থাৎ অনুঘটকের কাজ করে। শুধু তাই নয়, কোনওরকম প্রোটিনের সাহায্য ছাড়াই আর এন এ অণু বিচ্ছিন্ন হয়ে হুবহু একই ধরনের একাধিক অণুর জন্ম দিতে পারে। বহুগুণে জটিল এবং ক্ষমতাশালী ডি এন এ অনবরত নিজেকে ভেঙে ভেঙে বহু হচ্ছে, কিন্তু এই কাজে অবশ্যই প্রোটিন এবং এনজাইমের সাহায্য তার চাই। পলিমেরেজ জাতীয় এনজাইম না হলে ডি এন এ ভেঙে দুই, চার আট, ষোলো—এইভাবে নিজের অসংখ্য প্রতিরূপ তৈরি করতে পারবে না। ফলে জীবদেহে কোষগুলি যেমন সংখ্যায় বাড়বে না—দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে, তেমনই জীব থেকে জীবও আর সৃষ্টি হবে না। রুদ্ধ হয়ে যাবে বংশবৃদ্ধির ধারা। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা এমনই যে, ডি এন এ-র অবিচ্ছিন্ন ভাঙন চলছেই। পৃথিবীতে অব্যাহত রয়েছে প্রাণস্রোত।

সেচ ও অল্টম্যান প্রমাণ করেছেন, প্রোটিন-এনজাইমের সাহায্য ছাড়াই আর এন এ নিজেকে ভেঙে অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করে। এই ভাঙন চলেছে ভাইরাস থেকে মানুষ—সকলের ক্ষেত্রেই। ডি এন এ-র উপর আর এন এ-র এখানেই জিত। তাই 'ডিম আগে না হাঁস আগে'-র মতোই প্রশ্ন উঠেছে—পৃথিবীর প্রথম প্রাণ-অণু হওয়ার দাবিদার কে ? ডি এন এ না আর এন এ ? সেচ ও অল্টম্যানের আবিষ্কারে আর এন এ-র পাল্লাই এখন ভারী। এবং শেষ পর্যন্ত আর এন এ যদি আদিমতম প্রাণ-অণু হিসাবে নিশ্চিত প্রমাণিত হয়, তা হলে জীববিজ্ঞানের অনেক অধ্যায়ই নতুন করে লিখতে হবে। এই আবিষ্কারের আর-একটি মস্ত সম্ভাবনা হল, অনুঘটক জাতীয় আর এন এ-র সাহায্যে ভাইরাসবাহী ক্ষতিকর আর এন এ অণুগুলি ধ্বংস করা যাবে। প্রতিরোধ করা যাবে ভাইরাসঘটিত নানা রোগ।

ক্যানসার-গবেষণায় নতুন আলো

ক্যানসারের বীজ সুপ্ত রয়েছে মাছি থেকে মানুষ প্রতিটি প্রাণীর দেহে ? চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবারে যাঁরা নোবেল পেলেন তাঁদের গবেষণায় সেরকম আভাসই পাওয়া গেছে। ক্যানসার গবেষণায় নতুন এক দিগন্ত খুলে দেওয়ার জন্য সুইডেনের নোবেল কমিটি এই পুরস্কার দিচ্ছেন দুই মার্কিন চিকিৎসককে। এঁরা হলেন সানফ্রানসিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ হ্যারল্ড এলিয়ট ভারমুস (৪৯)

এবং ডাঃ জে মাইকেল বিশপ (৫৩)। প্রায় তিন দশকের যৌথ গবেষণায় এঁরা আবিষ্কার করেছেন, সমস্ত প্রাণীর কোষেই রয়েছে ক্যানসার সৃষ্টিকারী জিন। এ-ধরনের জিনকে বলা হয় অনকোজিন। ভাইরাসের মধ্যে প্রথম অনকোজিনের সন্ধান পাওয়া যায়। রেট্রোভাইরাস নামে এক শ্রেণীর জীবাণু নিয়ে দীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দুই বিজ্ঞানী মোটামুটি প্রমাণ করেছেন, অনকোজিন কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মকাণ্ডে সাহায্যই করে। কিন্তু কিছু-কিছু রাসায়নিক পদার্থ, ধূমপান, বিকিরণ ইত্যাদির প্রভাবে অনকোজিন ক্ষতিগ্রস্ত হলে উলটোপালটা আচরণ করতে থাকে এবং কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়, যার ফলে দেখা দেয় ক্যানসার।

সাতের দশকের মাঝামাঝি বিশপ ও ভারমুস প্রথম লক্ষ করেন, মুরগির দেহে ক্যানসার সৃষ্টিকারী রউস সারকোমা ভাইরাসের অনকোজিন আসলে বিগড়ে যাওয়া একধরনের স্বাভাবিক জিন। আর এ-জাতীয় স্বাভাবিক জিন রয়েছে মানুষসহ সমস্ত প্রাণীর শরীরেই। তারপর থেকে মানুষের দেহে এ-পর্যন্ত চল্লিশটিরও বেশি অনকোজিনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

রেট্রোভাইরাস শ্রেণীর জীবাণু কীভাবে প্রাণীদেহে ক্যানসার সৃষ্টি করে বিশপ, ভারমুস এবং তাঁদের সহগবেষকরা তাও জেনেছেন। এই ভাইরাস কোনও প্রাণীর শরীরে ঢুকে তার

টমাস সেচ

অনকোজিন ওই প্রাণীর দেহকোষের ডি এন এ-র মধ্যে চালান করে দেয়। ফলে কোষগুলি একসময় ক্যানসারদুষ্ট হয়ে পড়ে।

ভাইরাস, সিগারেটের ধোঁয়া বা কিছু-কিছু রাসায়নিক (কারসিনোজেন)—যে-কোনও কারণেই অনকোজিন থেকে ক্যানসারের উদ্ভব হোক, না কেন, ব্যাপকতর গবেষণায় সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলে ক্যানসার প্রতিরোধ ও নিরাময়ের নতুন রাস্তা খুলে যাবে। নানা দেশে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা

এলিয়ট ভারমুস, মাইকেল বিশপ

এই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন অক্লান্তভাবে। ভারমুস ও বিশপ ইঁদুরের দেহে অনকোজিন ঢুকিয়ে দিয়ে ক্যানসার সৃষ্টির পিছনে আরও কী-কী রহস্য আছে তা উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে খানিকটা সাফল্যও এসেছে। এডস্ রোগের ভাইরাস নিয়েও পরীক্ষা চালাচ্ছেন ডাঃ ভারমুস।

স্লো বা ফাস্ট হয় না যে ঘড়ি

কী সেই আশ্চর্য ঘড়ি? কে তার আবিষ্কারক? এ-ঘড়ি অবশ্যই স্প্রিং বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে না। চলে পরমাণুর কম্পনে। তাই এর নাম পরমাণু-ঘড়ি বা অ্যাটমিক ক্লক। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টার হিসাব রাখতে প্রচলিত ঘড়ির পেন্ডুলামের বদলে পরমাণু-ঘড়িতে কোনও নির্দিষ্ট পরমাণুর স্বাভাবিক দোলন বা কম্পনকে কাজে লাগানো হয়।

১৯৬৭ সালে পৃথিবীর সব দেশ থেকে সময় গণনার বিশেষজ্ঞরা ফ্রান্সে এক সম্মেলনে মিলিত হন এবং পরমাণু-কম্পনের ন্যূনতম যে হার অর্থাৎ পারমাণবিক সেকেন্ডকে সময়ের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসাবে মেনে নেন। তারপর থেকেই ক্রমশ পরমাণু-ঘড়ির উন্নয়ন ঘটতে থাকে। বর্তমানে সিসিয়াম পরমাণুর স্বাভাবিক কম্পনের সঙ্গে অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের মাইক্রোওয়েভকে মিলিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক সময় গণনা করা হয়। কম্পনশীল কোনও বস্তু প্রতি সেকেন্ডে যতবার আন্দোলিত হয় সেটাই তার কম্পাঙ্ক। আর মাইক্রোওয়েভ হল অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, টিভি সম্প্রচার ও টেলি-যোগাযোগে ছবি, শব্দ, কথাবার্তা এই তরঙ্গের আকারেই স্থান থেকে স্থানান্তরে যায়। মাইক্রোওয়েভ ও সিসিয়াম পরমাণুর কম্পনকে এক ছন্দে মিলিয়ে যে ঘড়ি এখন প্রচলিত, তিন লক্ষ বছরে তা একটি সেকেন্ডও স্লো বা ফাস্ট হয় না। এর থেকেও বহুগুণে উন্নত পরমাণু-ঘড়ি তৈরির গবেষণায় অসামান্য সাফল্যের জন্য পদার্থবিদ্যায় এবার নোবেল পাচ্ছেন দু'জন মার্কিন এবং একজন জার্মান বিজ্ঞানী। এঁরা হলেন আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নরম্যান র‍্যামজে, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের হানস্ ডেমেল্ট এবং পশ্চিম জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্ফ গ্যাং পল। এঁদের বয়স যথাক্রমে ৭৪, ৬৭ এবং ৭৬। তিনজনেই গবেষক পদার্থতত্ত্ববিদ।

পরমাণুর গঠন নির্ণয়ে নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য র‍্যামজেকে নোবেল পুরস্কার

দেওয়া হচ্ছে। কম্পনশীল তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র প্রয়োগ করে পরমাণুকে বিভিন্ন শক্তি-স্তরে উত্তেজিত করার এমন একটি নতুন কৌশল তিনি বের করেছেন, যার সাহায্যে পরমাণুর গঠন আরও নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। কৌশলটির নাম হাইড্রোজেন-মেজার। লেজার-রশ্মি জাতীয় এই বিকিরণের সাহায্যে স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের মধ্যে পরমাণুকে আলোকিত বা উত্তেজিত করলে এর গঠন আরও ভালভাবে বোঝা যায়। পরমাণু-ঘড়ি নির্মাণেও হাইড্রোজেন-মেজার ব্যবহার করা হচ্ছে। এর সাহায্যে সিসিয়াম পরমাণুকে এমনভাবে উত্তেজিত করা হয় যে, এই পরমাণু যে কোনও দুটি শক্তি-স্তরের মধ্যে অবিশ্বাস্য দ্রুত বেগে আনাগোনা বা লাফালাফি করতে থাকে। এই লাফালাফির হার প্রতি সেকেন্ডে ৯, ১৯২, ৬৩১, ৭৭০। অকল্পনীয় এই কম্পনের জন্যই একেবারে নিখুঁত সময় গণনায় সিসিয়াম পরমাণুর জুড়ি নেই।

ডেমেল্ট এবং পল যে কাজের জন্য নোবেল পাচ্ছেন, তার নাম 'আয়ন-ট্র্যাপ'—আয়ন ধরা ফাঁদ। বিদ্যুতাহিত ((Charged) পরমাণুকে বলা হয় আয়ন। এই দুই বিজ্ঞানী এমন একটি পদ্ধতি বের করেছেন, যার সাহায্যে অনেক আয়নের ভিড় থেকে যে-কোনও একটিকে ধরে ফেলা যায়। নোবেল কমিটি বলেছেন, নিখুঁত সময় গণনায় আয়ন-ট্র্যাপ হাইড্রোজেন-মেজারের থেকে অনেক বেশি কার্যকর। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজির বিজ্ঞানীদের ধারণা, আয়ন-ফাঁদের সাহায্যে আগামী এক দশকের মধ্যেই এমন পরমাণু-ঘড়ি বানানো সম্ভব হবে, হাজার কোটি বছরেও যার সময়ে একটি সেকেন্ডও হেরফের হবে না। হাজার কোটি বছর হল অপার রহস্যময় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স।

সিডনি অল্টম্যান

ডাকটিকিট

মহাকাশ অভিযান

চাঁদে মানুষের পৌঁছনোর পর কুড়ি বছর কেটে গেছে। চাঁদের মাটি এখনও ধরে রেখেছে নীল আর্মস্ট্রং আর এডউইন অলড্রিনের পদচিহ্ন। চাঁদের প্রথম তিনজন মানুষের স্মরণে তাই আমেরিকা ও ভারতসহ বহু দেশ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। চলতি বছরেও আমেরিকা ও পোল্যান্ড মানুষের চন্দ্রাভিযানের কুড়ি বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি করে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। মহাকাশ অভিযানকে কেন্দ্র করে বিশ্বের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশের কৃতিত্ব রাশিয়ার। বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ উপলক্ষে ওই ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর। প্রথম মহিলা মহাকাশযাত্রী রাশিয়ার ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভার সম্মানে পূর্ব জার্মানি একটি 'সি-টিনান্ট' ডাকটিকিট প্রকাশ করে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন। আমেরিকা দশ সেন্ট মূল্যের প্রথম চন্দ্রবিজয়ের ডাকটিকিট ছাড়াও স্কাইল্যাব, জেমিনি, পাইওনিয়ার, ভয়েজার, মার্কারি প্রভৃতি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ও অন্যান্য মহাকাশ অভিযানের স্মরণীয় মুহূর্তগুলি প্রতিটি ডাকটিকিটেই মূর্ত করে রেখেছে।

অ্যাপোলো উপগ্রহ

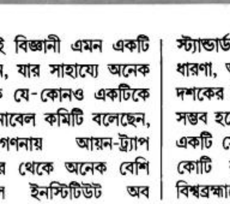

রাকেশ শর্মা যে মহাকাশযানে পাড়ি জমিয়েছিলেন

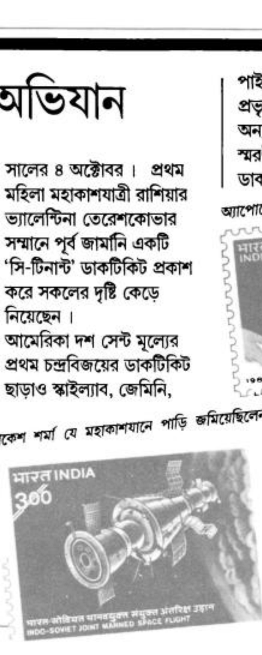

চন্দ্রবিজয় উপলক্ষে ভারতের ডাকটিকিট

আর্যভট্ট, রোহিণী, অ্যাপোলো প্রভৃতি উপগ্রহ উৎক্ষেপণকে কেন্দ্র করে ভারতে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। ভারত-রাশিয়া যৌথ-উদ্যোগে গঠিত মহাকাশ অভিযানের স্মরণীয় দিনটি হল ১৯৮৪ সালের ৩ এপ্রিল। ওই দিন প্রথম ভারতীয় মহাকাশযাত্রী রাকেশ শর্মা দু'জন সোভিয়েত মহাকাশযাত্রীর সঙ্গে আকাশ-পথে পাড়ি দেন। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ভারত ৩০০ পয়সা মূল্যের একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। ওই ডাকটিকিটের দশটি ফার্স্ট-ডে কভার ওই মহাকাশযানে চড়ে আকাশপথে ঘুরেও এসেছে। তারই একটি নমুনা বর্তমানে দিল্লির ডাক-জাদুঘরে রয়েছে।

কবিতা রায়

হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড

চঞ্চল পাল

গরিব বাড়ির ছেলে হান্স। ডেনমার্কের অধীনে লাঙ্গেল্যান্ড নামের ছোট একটা দ্বীপের ছোট্ট শহর রুদ্‌জোবিং। সেখানে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ তো দূরের কথা, ভাল স্কুলও নেই। তবে একটি পাঠশালা আছে। সেই পাঠশালাতেই পড়ে হান্স ও তার ছোট ভাই। সেখানে লেখাপড়ার মান খুব একটা উঁচু নয় বটে, তবে প্রধান শিক্ষক যেমন ছাত্রদরদী তেমনই শিক্ষকতায় নিবেদিতপ্রাণ। স্কুলের প্রাথমিক পাঠ শেষ হতেই হান্সের বাবা দুই ছেলেকেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন, বললেন, "এবার হাতের কাজ-টাজ শিখে রোজগারের দিকে মন দাও।"

কিন্তু দুই ভাইয়েরই তখন পড়াশোনায় খুব আগ্রহ। তার ওপর প্রধান শিক্ষক তাদের ছাড়তে চাইলেন না। কারণ দুই ভাইয়ের মেধা ও অনুসন্ধিৎসা দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে, পড়াশোনা করলে ওরা অনেক উন্নতি করতে পারবে। তাই তিনি হান্সের বাবার কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন যাতে কাজকর্মের অবসরে দুই ভাই তাঁর কাছে গিয়ে পড়াশোনা করে। প্রধান শিক্ষকের অনুরোধ হান্সের বাবা ফেলতে পারলেন না।

দুই ভাই তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। তাদের প্রচণ্ড আগ্রহে আর প্রধান শিক্ষকের আন্তরিক তত্ত্বাবধানে তারা লেখাপড়ায় এত এগিয়ে গেল যে, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তারা সহজেই পাশ করে গেল। হান্সের বয়স তখন ১৭ (১৭৯৪)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি পরীক্ষাতেও ফল হল একই রকম। হান্সের ভাইয়ের ঝোঁক ছিল আইনের দিকে, তাই তিনি বেছে নিলেন আইনজীবীর পেশা। শেষ বয়সে ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

হান্স কিন্তু বেছে নিলেন অন্য পথ। ছোটবেলা থেকে হান্সের কাছে প্রকৃতি ছিল বিস্ময়ের রাজ্য। প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির বিপুল বৈচিত্র্য দেখে তাঁর মনে হত—এসব বোধ হয় ছন্নছাড়া ঘটনা নয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও ছন্দ আছে। এই অজানা ছন্দকে জানার জন্য তাঁর তৃষ্ণা বেড়েই চলল। তাই অনিবার্যভাবেই তিনি দর্শনশাস্ত্রে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠল দার্শনিক হওয়া। বিশেষত জার্মান দর্শনশাস্ত্রে তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। ২২ বছর বয়সে তিনি কান্ট-এর দর্শন নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পেলেন।

এর দু' বছর বাদে (১৮০১) হান্স বেড়াতে গেলেন জার্মানিতে। আসল উদ্দেশ্য ছিল জার্মান দর্শন সম্বন্ধে আরও কিছু খোঁজখবর নেওয়া। ঘটনাচক্রে তাঁর আলাপ হয়ে গেল একজন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিকের সঙ্গে। ভদ্রলোকের নাম ফ্রেডরিখ উইলহেম যোসেফ শেলিং। শেলিং হান্সের ছেলেবেলার ধারণাকে একবাক্যে সমর্থন করলেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত রকম শক্তি আছে তা একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। উদাহরণস্বরূপ শেলিং মন্তব্য করলেন যে, বিদ্যুৎশক্তি ও চৌম্বকশক্তির ধর্মে অনেক মিল আছে। ওরস্টেড জিজ্ঞেস করলেন যে, এর চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেছে কি না। শেলিং বললেন, "এটা অনুভূতির ব্যাপার। তবে বিজ্ঞানীরাও এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন।"

এর পর থেকে হান্সের মাথায় ঘুরতে লাগল কীভাবে বিদ্যুৎশক্তি আর চৌম্বক শক্তির মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন শক্তিতত্ত্বের একীকরণ নিয়ে অনেক বিজ্ঞানীই মাথা ঘামাচ্ছিলেন। হান্সও ভিড়ে গেলেন এই দলে। পাশ্চাত্য দর্শন পরীক্ষালব্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই বিজ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের বিরোধ খুব কম। তখনকার দিনে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক বিষয় দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হত। তাই দর্শন পড়তে গিয়ে হান্সের পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞানও হয়েছিল যথেষ্ট। ২৯ বছর বয়স থেকে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান পড়াবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

একদিন ক্লাসে হান্স ছাত্রদের আকর্ষণ বিকর্ষণ নিয়ে বোঝাচ্ছিলেন। এর জন্য তিনি নিয়ে এসেছিলেন একটি হালকা চুম্বকশলাকা। কুড়ি বছর আগে আলেজান্দ্রো ভোল্টা বৈদ্যুতিক কোষের আদিরূপ আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছেন। এইরকমই একটি ব্যাটারি হান্স নিজে তৈরি করেছিলেন। সেটির দুটি প্রান্তে ধাতব তার সংযোগ করে তিনি দেখাতে চাইছিলেন, কেমন করে বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরি হয়। কথার ফাঁকে এক সময় হান্স চুম্বকশলাকাটিকে তারের কাছে রেখে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, চুম্বকশলাকাটি হঠাৎ আপনাআপনি ঘুরে গেল। কাণ্ড দেখে হান্স শলাকাটিকে আবার তারের ওপর রাখতে গেলেন। মনে হল

হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড

শলাকাটিকে কেউ যেন ছিটকে ফেলে দিচ্ছে। বুঝতে পারলেন বৈদ্যুতিক তার আর চুম্বক শলাকাটির মধ্যে কোনও অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। এবার তারটিকে ব্যাটারি থেকে খুলে ফেললেন। তখন শলাকাটিকে তার ওপর রাখতে গেলে কোনও প্রতিক্রিয়াই হল না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে ভেসে উঠল বিদ্যুৎশক্তি আর চৌম্বকশক্তির সম্পর্ক। এতদিন জানা ছিল চুম্বকই চুম্বকশলাকাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে। এখন তো দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎশক্তিও চুম্বকশলাকাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। তা হলে কি বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে তারটি পরোক্ষভাবে চুম্বক হয়ে যায়? অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি কি চৌম্বকশক্তির আবেশ সৃষ্টি করছে?

মাথায় উঠল হান্সের খাওয়া-দাওয়া, ক্লাস নেওয়া। পরীক্ষাগারে গিয়ে চুম্বকশলাকাটিকে একবার তারের উপর দিকে, একবার নীচের দিকে, একবার পাশে রেখে দেখতে লাগলেন। লক্ষ করলেন, শলাকাটি উপর দিকে রাখলে একদিকে সরে যায় আর নীচের দিকে রাখলে অন্যদিকে সরে যায়। আবার তারের দুই প্রান্ত ব্যাটারির দুই প্রান্তে বদলাবদলি করে লাগালে চুম্বকশলাকাও বিক্ষিপ্ত হয় উলটো দিকে।

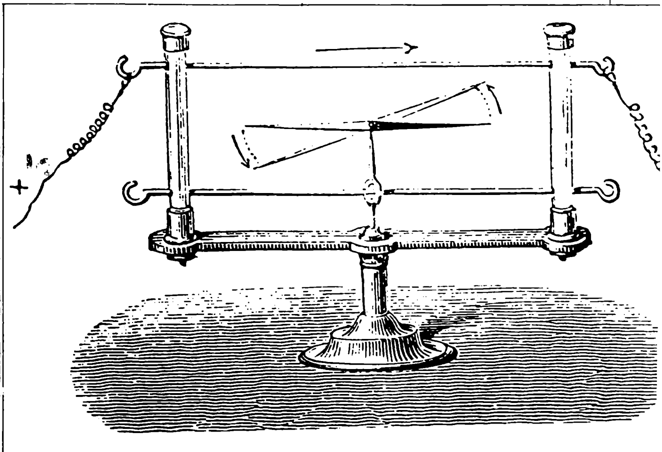

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ পরীক্ষার জন্য ওরস্টেড-এর উদ্ভাবিত যন্ত্র

ছেলেবেলা থেকে হান্সের কাছে প্রকৃতি ছিল বিস্ময়ের রাজ্য। প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির বিপুল বৈচিত্র্য দেখে তাঁর মনে হত—এসব বোধ হয় ছন্নছাড়া ঘটনা নয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও ছন্দ আছে। এই অজানা ছন্দকে জানার জন্য তাঁর তৃষ্ণা বেড়েই চলল। তাই অনিবার্যভাবেই তিনি দর্শনশাস্ত্রে আগ্রহী হয়ে উঠলেন।... ২২ বছর বয়সে তিনি কান্ট-এর দর্শন নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পেলেন।

কয়েক মাস ধরে এ-ব্যাপারে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করে তিনি লিখে ফেললেন একটি গবেষণাপত্র। বিদ্যুৎ আর চুম্বকের এই সম্পর্ক হাতেনাতে করে দেখানোর জন্য তিনি মাথা খাটিয়ে তৈরি করলেন একটা সরল যন্ত্র। এই যন্ত্রটিতে ছিল দুটি সমান্তরাল ধাতব দণ্ড। একটি উপরে ও একটি নীচে আনুভূমিকভাবে রাখা। এই দুই দণ্ডের মাঝখানে একটি চুম্বকশলাকা। যে-কোনও একটি দণ্ডকে ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত করলে দেখা যাবে চুম্বকশলাকার বিক্ষেপ।

হান্সের গবেষণা যেদিন প্রকাশিত হল, সেদিনই সারা বিশ্বে পড়ে গেল হইচই। দর্শন আর বিজ্ঞান যেন প্রত্যক্ষভাবে হাত মেলাল। বিশ্বের অন্যান্য শক্তির মধ্যে ঐক্যসাধনের প্রয়াস আরও জোরদার হল বিজ্ঞানীদের মধ্যে। সবচেয়ে বড় কথা, বিজ্ঞানে শুরু হল একটি নতুন অধ্যায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তৈরি হল একটি নতুন দৃষ্টিকোণ, পরিভাষায় এল একটি নতুন নাম 'তড়িৎচুম্বক' বা 'ইলেকট্রোম্যাগনেট'। আজ মানুষের হাতে এত যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা সরঞ্জাম, এর প্রত্যেকটির মধ্যেই রয়েছে তড়িৎচুম্বক আর তার মধ্যে কাজ করছে তড়িৎচুম্বকীয় বলের নিয়মকানুন। অবশ্য এই নিয়মকানুনের গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করে তড়িৎ চুম্বকীয় বিজ্ঞানকে অনেক এগিয়ে দিয়েছেন আঁদ্রে অ্যামপিয়ার ও মাইকেল ফ্যারাডে। কিন্তু হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেডই আবিষ্কার করেছিলেন এর প্রথম সূত্রটি।

হান্সের জন্ম ১৭৭৭ সালে। ১৮২০ সালে যখন তাঁর আবিষ্কার প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৩। এর পর আরও তিন দশক তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান পেয়েছেন। ১৮৫১ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর পাণ্ডিত্য, খ্যাতি ছিল গগনচুম্বী, অর্থের পরিমাণও ছিল বিস্ময়কর। আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, একদিন দারিদ্র্যের জন্য তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে, হাই স্কুলে পড়বার সৌভাগ্য তাঁর কোনওদিন হয়নি, শ্রমিকের ছেলে হয়ে দু'বেলা তাঁর পুষ্টিকর খাবার জুটত না।

প্রতিভার বিকাশ কোনও একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেডও তার ব্যতিক্রম নন। পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়েও ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। বিশেষত জলের চাপ ও ঘাত নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদার্থবিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তা ছাড়া, মূলত যিনি দার্শনিক, তাঁর নজর শুধুমাত্র জড় জগতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের জটিলতা নিয়ে তাঁর লেখা সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায় যে, হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড ছিলেন শুধুমাত্র জড় বিজ্ঞানের নয়, সমাজ বিজ্ঞানেরও একজন চিন্তানায়ক।

দেবপুত্র কণিষ্কের কথা

চিত্রা দেব

কণিষ্কের কথা মনে আছে ? কুষাণ সম্রাট দিগ্বিজয়ী বীর কণিষ্ক। যাঁর মাথা কাটা মূর্তিটা ইতিহাসের পাতায় অনেকবার চোখে পড়েছে। সেই কণিষ্ক। ছোটবেলায় ছবি দেখে খুব দুঃখ হত। প্রাচীনকালের অধিকাংশ রাজাই কেমন দেখতে ছিলেন জানা যায় না, সম্রাট কণিষ্কের একটা বড়সড়, সুন্দর মূর্তি মথুরায় যদি-বা পাওয়া গেল, তার মাথাটাই গেল হারিয়ে। মূর্তিটা আছে দিল্লির মিউজিয়ামে। যাক সে কথা, ওই মূর্তির মতোই রাজাধিরাজ কণিষ্কের জীবনের প্রায় সবটাই আমাদের অপরিচিত। এমনকী কে তাঁর পিতা, কে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন, কিছুই জানা যায় না। যদিও তিনি মহাপরাক্রমশালী বীর ছিলেন, রোম সাম্রাজ্যে তাঁর দূত গিয়েছিল, রোমানদের মতো তিনি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন নিজের রাজ্যে এবং ভারতে কুষাণ রাজারাই প্রথম স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন, তবু ইউরোপের কেউ তাঁর নাম শোনেনি। আর আমরাই-বা কতটুকু জানি তাঁর সম্পর্কে ? কণিষ্ক বেঁচে আছেন তিব্বত, চিন ও মঙ্গোলিয়ার কিংবদন্তিতে। বৌদ্ধদের কাছে সম্রাট অশোকের পরেই প্রিয় নাম হচ্ছে সম্রাট কণিষ্ক।

সত্যিকথা বলতে কি, কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছেন কণিষ্ক। তাঁর আগে, দু'জন কুষাণ রাজার নাম শোনা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় কদফেসিসের। এঁরা কেউই ভারতের রাজা ছিলেন না। মধ্য এশিয়ার অনেক অংশ জুড়ে ছিল কুষাণ সাম্রাজ্য। আফগানিস্থান, পাকিস্তান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও চিনের কিছু অংশ এবং কাশ্মির কুষাণ রাজাদের অধীনে ছিল, কণিষ্কের আমলে ভারতের অধিকাংশই চলে যায় তাঁর হাতে। ছোট-ছোট অগুনতি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করায় কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তার করা সহজ হয়।

ভীম কদফেসিসের পরে রাজা হন কণিষ্ক। সেজন্য তাঁকে দ্বিতীয় কদফেসিসের ছেলে ভাবাই সঙ্গত। কিন্তু প্রাচীনকালে লোকে ভাবত কণিষ্ক দৈবশক্তিসম্পন্ন রাজা এবং আসলে একজন 'দেবপুত্র'। সে গল্পও পরে শোনাব। কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ারে। কণিষ্কের রাজত্বকাল নিয়েও সন্দেহ আছে। আমরা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার মশাইয়ের মতটা গ্রহণ করতে পারি। তাঁর মতে, কণিষ্কের প্রথম রাজ্যবর্ষ থেকেই শকাব্দ আরম্ভ হয়, এই শকাব্দ শুরু হয়েছে ৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং এখনও আছে। বৌদ্ধ সাধুরা বলেন, চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন সম্রাট কণিষ্ক, কাশ্মিরে। আর এখানেই নতুন বৌদ্ধধর্মমত মহাযানবাদ প্রকৃত মর্যাদা পায়। কণিষ্ক প্রথম জীবনে মোটেই বুদ্ধভক্ত ছিলেন না। এ নিয়ে দু-একটি গল্প শুনিয়েছেন চিনের পরিব্রাজকেরা। তাঁরা বলেন, "শাক্যমুনি বুদ্ধ একবার শিষ্যদের নিয়ে পুরুষপুরে বেড়াতে আসেন। তখন শহরের বাইরে একটা একশো হাত উঁচু বিরাট অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে প্রিয় ভিক্ষু আনন্দকে বলেছিলেন, আমার নির্বাণের চারশো বছর পরে কণিষ্ক নামে একজন রাজা এই দেশের রাজা হবেন আর এখানে তিনি একটি স্তূপ তৈরি করে আমার অস্থি ও দেহভস্ম সেখানে রাখবেন।"

সত্যিই কণিষ্ক একদিন রাজা হলেন। দেশ জয় করতে করতে পুরুষপুরে এলেনও। বিজয়ী রাজারা সবসময় বিজিত দেশের

ধনসম্পদ নিয়ে চলে যান। কণিষ্ক ঠিক করলেন বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র যা পুরুষপুরের একটি বিহারে রাখা আছে, সেটিও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। পাত্রটি সাধারণ নয়। চাররকম দামি পাথর দিয়ে তৈরি করা। চকচকে এই পাত্রে দু'কুনকে চাল ধরে। এর বাইরের দিকটা নানা রঙের পাথরে উজ্জ্বল, তবে কালো রং-ই বেশি। সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি মোটা। কিংবদন্তি, গরিব ভক্তেরা সামান্য একটি ফুল দিলেও পাত্র ভরে যায়, ধনীদের লক্ষ-লক্ষ পুষ্পের ডালি দিয়েও পাত্র ভরা যায় না। কণিষ্ক এমন একটি অদ্ভুত জিনিস স্বদেশে নিয়ে যাবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারলেন না। বৌদ্ধ না হলেও কোনও ধর্মের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। কারও ধর্মেও হস্তক্ষেপ করতেন না। রাজার ইচ্ছেয় কে বাধা দেবে ? আর দিলেই বা নিরস্ত্র ভিক্ষুদের কথা শুনছে কে ? নির্দিষ্ট দিনে একটি সাজানো থালার ওপরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে একটি হাতির পিঠে চাপানো হল, সঙ্গে-সঙ্গে কী আশ্চর্য ! হাতিটি সেখানে বসে পড়ল, তাকে কিছুতেই ওঠানো গেল না।

"ঠিক আছে।" কণিষ্ক বললেন, "গাড়ি নিয়ে এসো।"

এল চার চাকার রথ। ভিক্ষাপাত্র তার ওপরে রেখে গাড়িতে জুড়ে দেওয়া হল আটটি মহাশক্তিশালী হাতি। কিন্তু এবারেও সেই একই ঘটনা ঘটল। হাতিরা হাজার চেষ্টা করেও গাড়িটি নড়াতে পারল না, চাকাও ঘুরল না। এবার কণিষ্ক নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

বুঝলেন বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করার উপযুক্ত সময় এখনও আসেনি, তিনি সেখানেই একটি স্তূপ ও বিহার তৈরি করে দিলেন। সেখানেই হল তাঁর রাজধানী।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে কণিষ্ক দেখলেন, একটা ধবধবে সাদা খরগোশ লাফাতে-লাফাতে যাচ্ছে। ভারী সুন্দর দেখতে। তিনি তখনই তার পিছু নিলেন, শিকার করবেন কিংবা জ্যান্ত ধরবেন বলে। খরগোশটা ছুটতে ছুটতে এসে শ্রীবুদ্ধ যে গাছের তলায় বসে কণিষ্কের কথা বলেছিলেন, সেখানে হারিয়ে গেল। কণিষ্ক অবাক। এদিক-ওদিক খুঁজছেন, হঠাৎ দেখেন, একটি রাখাল ছেলে আপনমনে একটা ছোট্ট স্তূপ তৈরি করছে। কণিষ্ক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "খোকা কী করছ?"

ছেলেটি বলল, "আমি স্তূপ তৈরি করছি। তথাগত বলেছিলেন, একজন বিজয়ী রাজা একটা স্তূপ তৈরি করবেন। আমি তোমাকে সেকথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।"

কণিষ্ক শুনে খুশি হলেন। বললেন, "ঠিক আছে, আমি এই স্তূপটিকে ঘিরে একটি বড় স্তূপ তৈরি করব।" এদিকে রাজার স্তূপ যত বড় হয়, রাখালের স্তূপও আপনা-আপনি উঁচু হয়। কণিষ্ক আবার বুঝতে পারলেন দেবতার ইচ্ছের কাছে নত হতে হয় তাই তিনি স্তূপ উঁচু করা বন্ধ করলেন। ইতিহাস বলে, দুটি স্তূপই তৈরি করেছিলেন কণিষ্ক, মধ্যেরটি চারশো হাত উঁচু, লোকে একে বলত 'কণিষ্ক চৈত্য'।

বৌদ্ধধর্ম নিয়ে কণিষ্ক পাঠ ও আলোচনা শুরু করলেন, কিন্তু দেখলেন, নানা মুনির নানা মত। এক-একজন আচার্য এক-এক রকম বৌদ্ধধর্মের কথা বলেন। তা হলে আসল কোনটা? সত্যি-সত্যি বুদ্ধ কী বলতে চেয়েছিলেন? একজন সাধু বা অর্হৎকে তিনি প্রশ্ন না করে আর পারলেন না।

অর্হৎ পার্শ্ব বললেন, "বুদ্ধের নির্বাণের পর অনেক বছর কেটে গেছে, কাজেই তিনি কী বলেছিলেন, আজকের আচার্যেরা তা জানেন না। এঁরা নিজেদের গুরুর কাছে যা শুনেছেন তাই বলেছেন।"

শুনে কণিষ্ক খুব দুঃখ পেলেন এবং এক ধর্মমহাসভা ডাকবার ব্যবস্থা করলেন, যাঁরা ত্রিপিটক চর্চা করে প্রকৃত সত্য কী তা জানাতে পারবেন। হলও তাই। কাশ্মিরে এই সভা হল। বসুমিত্র সভাপতি। পাঁচশোজন যতি বা ত্রিপিটক বিশেষজ্ঞ বহু শ্লোক রচনা করলেন। তারপর কণিষ্ক তাম্রপত্রে এই শ্লোকগুলি খোদাই করে একটি স্তূপের মধ্যে রেখে দিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেলেন। যাবার সময় কাশ্মিরের পশ্চিমদ্বার থেকে বেরিয়ে পুব দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে বসে রাজ্যটি ভিক্ষুদের দান করে গেলেন। তিব্বতে এবং চিনে কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বিখ্যাত সিল্করোড বা চিন থেকে পারস্য পর্যন্ত যে বাণিজ্যপথটি ছিল, সেই পথটির ধারে-ধারে তৈরি হল, অনেক বৌদ্ধ স্তূপ। মূর্তি গড়ায় কণিষ্কের উৎসাহ ছিল, তাঁর সময়েই যে অনেক জায়গায় বুদ্ধের মূর্তি তৈরি হয় তার প্রমাণও আছে। তাই

'দেবতাদের প্রিয় অশোক' ও 'দেবপুত্র কণিষ্ক' বৌদ্ধদের এত প্রিয় ছিলেন।

কণিষ্কের দৈবক্ষমতার গল্প শুনিয়েছেন আর-একজন, তিনি হচ্ছেন আলবেরুণী। সেও বেশ মজার গল্প। কণিষ্ক তখন দিগ্বিজয়ী রাজা। নানা দেশ থেকে রাজারা উপহার পাঠান। এমনিতে কণিষ্ক বেশ ভাল লোক ছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করে। একবার কান্যকুব্জরাজ তাঁকে কিছু উপহার পাঠালেন। তার মধ্যে ছিল একটা সুন্দর কাপড়। সম্রাটের মনে হল, এত সুন্দর কাপড় তিনি দেখেননি। ভারতবর্ষের কাপড় বিখ্যাত। কণিষ্ক তাড়াতাড়ি তাঁর নিজস্ব দরজিকে ডেকে পাঠালেন. সেই কাপড়ের একটা রাজপোশাক তৈরি করাবেন বলে। রাজ্যের সেরা দরজি এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "সূচিক, তুমি যত শীঘ্র সম্ভব এই কাপড় দিয়ে আমার পোশাক তৈরি করে দাও।" দরজিকে সেকালে বলা হত সূচিক।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। সম্রাট প্রতিদিন ভাবছেন আজ তাঁর নতুন পোশাক আসবে। পোশাক আর আসে না। কী হল? পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে সূচিককে ধরে আনা হল। সূচিক সেই কাপড়টা নিয়েই কাঁপতে কাঁপতে এল। বলল, "মহারাজ রক্ষা করুন, আমি নির্দোষ। আমি কোনও অপরাধ করিনি।"

"তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। আমার পোশাক কই? সাতদিনেও তৈরি হল না?"

"প্রভু, আমি মরে গেলেও এই কাপড় দিয়ে আপনার জামা তৈরি করতে পারব না।"

"তার মানে?"

"মহারাজ, কাপড়খানি মহামূল্যবান কিন্তু এর এক জায়গায় দুটি পায়ের ছাপ আছে। যেভাবেই কাটি না কেন ওই মানুষের পায়ের ছাপ দুটি পড়বে কাঁধের ঠিক নীচে। বহু চেষ্টা করেও তাই আমি আপনার পোশাক তৈরি করতে পারিনি।"

কণিষ্ক বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। কান্যকুব্জের রাজা কৌশলে তাঁর পিঠে পদাঘাত করেছেন। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। দরজিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি সেনাপতিকে সেনা সাজাতে বললেন। এই অপমানের উত্তর দিতেই হবে।

রাজাধিরাজ কণিষ্ক সসৈন্যে ভারতের দিকে যাত্রা করেছেন শুনে ঘর-ঘরে হাহাকার পড়ে গেল। কান্যকুব্জের রাজা শুকনো মুখে মন্ত্রীর কাছে এলেন. "মন্ত্রীমশাই, সর্বনাশ হয়েছে। আমি ধনেপ্রাণে মারা যাব। কণিষ্কের হাত থেকে আপনি বাঁচান।"

বৃদ্ধ মন্ত্রী সব শুনে চটে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, আপনি সর্বনাশ করেছেন। একজন শান্তশিষ্ট রাজাকে রাগিয়ে দিয়েছেন। কণিষ্ককে পায়ের ছাপ আঁকা কাপড় পাঠানো খুব অন্যায় হয়েছে।"

"যা হয়ে গিয়েছে, তার তো কোনও উপায় নেই। একটা ভুল করে ফেলেছি, এখন পারো তো আমাকে বাঁচাও।"

মন্ত্রী বহুক্ষণ ভাবলেন। কণিষ্কর সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। শেষে বললেন, "যা বলি শুনুন। আপনি আমার নাক-কান কেটে আমাকে বিকলাঙ্গ করে দিন। তারপর দেখি কী করতে পারি!"

প্রিয় মন্ত্রীর নাক-কান কাটতে রাজার খুব খারাপ লাগল। কিন্তু কী করবেন? নিজের ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্যই তাঁকে এখন মন্ত্রীর কথা শুনতে হল। মন্ত্রীকে সেখানে ফেলে রেখে রাজা রাজ্যের অন্য জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। বিকলাঙ্গ মন্ত্রী যাত্রা করলেন কণিষ্কের পথে। পথেই দেখা হল রাজার সেনাবাহিনীর সঙ্গে। তাঁরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল কণিষ্কের কাছে। কণিষ্ক জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি? এখানে কী করছ? তোমার অবস্থাই বা এরকম হল কী করে?"

মন্ত্রী বললেন, "রাজাধিরাজ, আমি চিরদিন আমার প্রভু কান্যকুব্জরাজকে সুপরামর্শ দিয়ে এসেছি। বলেছি সম্রাট কণিষ্কের আনুগত্য স্বীকার করতে, কিন্তু তিনি তা শোনেননি। আপনার পক্ষপাতী বলে তিনি আমাকে দেখতে পারতেন না। এখন আপনি রাজ্য আক্রমণ করবেন জানতে পেরে আমাকে রাজদ্রোহের শাস্তি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই, তাই আপনার কাছে এসেছি।

কণিষ্ক বললেন, "শীঘ্রই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। আমি কান্যকুব্জরাজকে যমালয়ে পাঠিয়ে কান্যকুব্জ অধিকার করব।"

"আপনার জয় হোক," বলে হাতজোড় করে নমস্কার করে মন্ত্রী বললেন, "কিন্তু তা তো হবার নয়!"

"কেন?"

"আপনার আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি রাজ্যের বাইরে এক গুপ্ত জায়গায় পৌঁছেছেন। সেখানে সহজে পৌঁছবার একটা মাত্র দুর্গম পথ আছে, মরুভূমির মধ্যে দিয়ে।"

"বেশ তো, তাই যাব। সঙ্গে নেওয়া হবে প্রয়োজনীয় পানীয়। তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।"

মন্ত্রী কণিষ্ককে এক বিশাল মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন। পথ আর ফুরোয় না। নির্দিষ্ট দিন এল। পানীয় জল ফুরোল। ধুধু মরুভূমি ফুরোয় না। কণিষ্ক কান্যকুব্জর মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "তুমি পথ ভুল করোনি তো?"

মন্ত্রী হেসে বললেন, "রাজাধিরাজ, শত্রুশিবির দূরে বটে, কিন্তু আপনার সর্বনাশের সময় এসে গেছে। আমরা মরুভূমির মাঝখানে এসেছি। এখান থেকে প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরতে পারে না। জলাভাবে আপনারা সকলে মরবেন। এখন আমাকে যা শাস্তি দেবার দিন। আমি বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী নই।"

কণিষ্ক সব বুঝতে পারলেন। তাঁর সেনাদলে হাহাকার পড়ে গেল। কিন্তু কণিষ্ক একা বেরিয়ে পড়লেন একটা বর্শা হাতে, ঘোড়ার পিঠে চেপে। ঘুরতে ঘুরতে একটা নিচু জমি দেখতে পেয়ে তিনি সেখানে গিয়ে বর্শা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। অনেকখানি বর্শা বিঁধে গেল আর সম্রাট দেখলেন, একটা জলের রেখা বেরিয়ে আসছে। সবাই দেবানুগৃহীত রাজার জয়ধ্বনি দিল।

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আপনি দৈবশক্তির অধিকারী। দেবতার সঙ্গে আমি ছলনা করতে চাইনি মানুষের বিরুদ্ধেই কূটকৌশল প্রয়োগ করেছি। আমাকে এবং আমার প্রভুকে যা শাস্তি দেবার হয় দিন।"

কণিষ্ক হেসে তাঁর প্রভুভক্তির প্রশংসা করে তাঁকে মুক্তি দিয়ে বললেন, "আমি পুরুষপুরে ফিরে যাচ্ছি। তোমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করি, কিন্তু তোমার প্রভু উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছেন।"

কণিষ্ক দেশে ফিরলেন। মন্ত্রীও কান্যকুব্জে ফিরলেন। ফিরে দেখেন, যেদিন কণিষ্ক জলের জন্য মাটিতে বর্শা পুঁতেছিলেন সেদিনই রাজার দেহ থেকে হাত-পা খসে পড়ে গেছে। বুঝলেন, দেবতাই তাঁকে শাস্তি দিয়েছেন।

সম্রাট কণিষ্ক এভাবেই বেঁচে আছেন কিংবদন্তি আর লোককথার মধ্যে।

সাহায্য নিয়েছি : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ. অমু।

১. আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব।
২. ড. দীনেশচন্দ্র সরকার : প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী
৩. ফা-হিয়েনের দেখা ভারত : কৃষ্ণ চৈতন্য মুখোপাধ্যায়. সম্পাদিত।
৪. হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত : প্রেমময় দাশগুপ্ত. সং.
৫. হিউয়েন সাঙের দৃষ্টিতে বৌদ্ধভারত : বারিন্দবরণ ঘোষ. সম্পাদিত।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ফুটবল মরসুম সামনে । কয়েকদিন বাদেই মেলচেস্টার রোভার্সের প্রথম বিভাগে গৌরবময় প্রত্যাবর্তন ! কিন্তু ম্যানেজার-খেলোয়াড় রয় রেস সমস্যায় জর্জরিত···
ক্রিকেট, সুন্দর ক্রিকেট ?
রয় রেস তা মনে করে না
ক্যাভেলিয়ার্সের সঙ্গে খেলার রোমাঞ্চকর জয়ের মূল্য দিচ্ছে রোভার্স !
বিজয়োৎসবে মত্ত জনতার হুল্লোড়ে ভার্নন এলিয়ট আহত
রোভার্সের রয়
বেচারা ভার্নন ! এ নিশ্চয় ভেবেছিল একপাল হাতি ওকে পায়ে মাড়াচ্ছে ! পেশী ছিঁড়ে অন্তত দু'মাস ওর খেলা বন্ধ থাকবে !
খুব অন্যায় ব্যাপার, রয় । খেলোয়াড়রা কেউ কিন্তু ক্রিকেট খেলায় জখম হয়নি···
অথচ আমাদেরই কিছু অত্যুৎসাহী সমর্থকের হাতে জখম হল ভার্নন !
কারমোডিস ক্যাভেলিয়ার্সের সঙ্গে খেলায় ভার্নন এলিয়ট একাই জখম হয়নি···
শুধু এই আশাই করতে পারি কাল যোগ্যতার চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভার্নন আর চার্লি উত্তীর্ণ হবে ।
কিন্তু !
উহুহ !
খুব লাগছে, না ? ঠিক আছে, চার্লি, যথেষ্ট হয়েছে !
চার্লির আশা ছাড়ো, রয় ! ওর কণ্ঠার ভাঙা হাড় এখনও ভাল করে জোড়া লাগেনি !
মার্ভিনের অবস্থা কী, ট্যাফ ?
একটা উঠতি ক্রিকেট-বল লেগে মার্ভিন ওয়ালেসের হাতের হাড়ে চিড় ধরেছে···
ও হালকাভাবে অভ্যাস করতে পারে, কিন্তু ভারী ট্যাকলিং চলবে না !
মার্ভিনেরও একই হাল !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে হলে

অমর দাশ

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নানা পদে কর্মী নিয়োগ করা হয়। ভারত সরকারের গেজেটে এবং বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আগামী বছর এই ধরনের কী কী পরীক্ষা নেওয়া হবে, সে-সম্পর্কে আলোচনা করা হল এবারের কেরিয়ার গাইড বিভাগে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে পারে তার জন্য কী কী বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়, সে-কথাও উল্লেখ করা হল।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভবন

ফোটো : জগদীশ যাদব

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নাম আমাদের অনেকেরই জানা। কিন্তু কমিশনের কাজ কী এবং এর দ্বারা আমরা কীভাবে উপকৃত হতে পারি সবাই জানি না। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা সংস্থায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগ করা হয়। তাঁরা বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাহিদামতো বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করেন। ভারত সরকারের গেজেটে এবং বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। তারপর আবেদনপত্র গ্রহণ, বাছাই, পরীক্ষা গ্রহণ, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ পর্ব শেষ করে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করেন।

এবার আমরা ১৯৯০ সালে কখন কী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেসব পরীক্ষা দিতে হলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার সে বিষয়ে আলোচনা করছি। বছরের শুরু থেকে পর-পর যেসব পরীক্ষা হবে সেই ক্রম অনুসারে আলোচনা করছি।

ইউনিয়ন সার্ভিস কমিশন সারা বছরই বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ করেন। যেমন, সিভিল সার্ভিসেস এগজামিনেশন, ফরেস্ট সার্ভিস এগজামিনেশন, এঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস এগজামিনেশন, জিওলজিস্টস এগজামিনেশন, ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমি এগজামিনেশন, কমবাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এগজামিনেশন, কমবাইন্ড মেডিকেল সার্ভিসেস এগজামিনেশন, প্রভৃতি।

কমবাইন্ড মেডিকেল সার্ভিসেস এগজামিনেশন

এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা হবে একদিন। এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং এমপ্লয়মেন্ট নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে এম· বি· বি· এস· পাশ করতে হবে। বয়স হওয়া চাই ১ জানুয়ারি, ১৯৯০ তারিখের হিসেবে ৩০ বছরের কম। যাঁরা এ-বছর এম· বি· বি· এস· ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরাও কিছু শর্তাধীনে পরীক্ষায় বসতে পারবেন। তবে চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে তাঁদের ইন্টার্নশিপ শেষ করতে হবে।

জিওলজিস্টস এগজামিনেশন

তিনদিনের এই পরীক্ষা নেওয়া হবে আগামী ২৯ মার্চ। দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৯। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে ২৮ অক্টোবর'৮৯। এবার জানা দরকার কারা এ পরীক্ষায় বসতে পারবেন। এই পরীক্ষায় বসতে হলে জিওলজি অথবা অ্যাপ্লায়েড জিওলজি বা মেরিন জিওলজি নিয়ে স্বীকৃত যে-কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম·এসসি পাশ করতে হবে। পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স ২১ বছর থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সের হিসেব করতে হবে ১ জানুয়ারি, ১৯৯০ তারিখের হিসেবে। যাঁরা ফাইনাল পরীক্ষার্থী, তাঁরাও শর্তাধীনে পরীক্ষায় বসতে পারবেন।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমি এবং নেভাল অকাদেমি এগজামিনেশন (মে, ১৯৯০)

এই পরীক্ষার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এসব নিশ্চয়ই সকলেই জানেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমির আর্মি, নেভি এবং এয়ার ফোর্স বিভাগে ভর্তির পরীক্ষায় বসতে হলে ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় পাস করতে হবে। তবে নেভাল অকাদেমির কোর্সের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে। সেক্ষেত্রে প্রার্থীকে ফিজিকস, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিকস নিয়ে ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। প্রার্থীর বয়স হবে ষোলো বছর ছ' মাস থেকে উনিশ বছরের মধ্যে। বয়সের হিসেব করতে হবে ২ জানুয়ারি,১৯৯১ তারিখের ভিত্তিতে। এই পরীক্ষার ক্ষেত্রেও, যাঁরা এ-বছর উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় বসবেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে ৪ নভেম্বর, ১৯৮৯। আবেদন করার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৯।

কমবাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এগজামিনেশন (মে, ১৯৯০)

দু' দিনের এই পরীক্ষা নেওয়া হবে আগামী ১৯ মে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে ২৫ নভেম্বর। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ দিন ৮ জানুয়ারি, ১৯৯০। শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স— নেভাল অকাদেমির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে ফিজিকস ও ম্যাথমেটিকস সহ স্নাতক হতে হবে। এ ছাড়া এঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকরাও আবেদন করতে পারবেন। ইন্ডিয়ান মিলিটারি অকাদেমি এবং অফিসার্স ট্রেনিং অকাদেমির ক্ষেত্রে যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলেই আবেদন করা যাবে। তবে এয়ার ফোর্স অকাদেমির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে ফিজিকস অথবা ম্যাথমেটিকস সহ গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। এ ছাড়া যেসব প্রার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এসব বিষয় ছিল, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। মিলিটারি অকাদেমির ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ১৯ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে ; নেভাল এবং এয়ার ফোর্স অকাদেমির ক্ষেত্রে ১৯ থেকে ২২ বছরের মধ্যে এবং অফিসার্স ট্রেনিং অকাদেমির ক্ষেত্রে ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সবক্ষেত্রেই বয়সের হিসেব ধরতে হবে ১ জানুয়ারি,১৯৯১ তারিখের ভিত্তিতে। এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেসব প্রার্থী ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন তাঁরা শর্তাধীনে আবেদন করতে পারবেন।

সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) এগজামিনেশন

একদিনের এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১০ জুন। এই পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৯। আবেদন করার শেষ দিন ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯০। এই পরীক্ষার নিয়মকানুন নিয়ে কেরিয়ার গাইড বিভাগে আমরা আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যে-কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ২১ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। বয়সের হিসেব ধরতে হবে ১ অগস্ট, ১৯৯০ তারিখের ভিত্তিতে। ডিগ্রি পরীক্ষায় বসবেন এমন ছাত্রছাত্রীরাও শর্তাধীনে এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন।

ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভিস এগজামিনেশন

চারদিনের এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ জুন, ১৯৯০। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বেরোবে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৯। আবেদন করার শেষ তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০। ইকনমিকস কিংবা স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে যাঁরা ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করেছেন এমন প্রার্থীরা ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিসে বসতে পারবেন। স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভিসে বসতে হলে প্রার্থীকে স্ট্যাটিসটিকস, ম্যাথমেটিকস অথবা ইকনমিকস বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। প্রার্থীর বয়সসীমা হওয়া চাই ২১ বছর থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। বয়স ধরতে হবে ১ জানুয়ারি ১৯৯০ তারিখের হিসেবে। এ-বছর যাঁরা এসব বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পরীক্ষায় বসবেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন।

স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেনটিসেস এগজামিনেশন

তিনদিনের এই পরীক্ষা নেওয়া হবে ৮ জুলাই ১৯৯০ তারিখে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বেরোবে ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯০ তারিখে। আবেদন করার শেষ দিন ১২ মার্চ

১৯৯০। ম্যাথমেটিকস এবং ফিজিকস অথবা কেমিস্ট্রি বিষয় নিয়ে যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ ১০+২ পর্যায়ের পরীক্ষায় পাশ করেছেন, তাঁরা এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন। তবে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করতে হবে, বয়ঃসীমা ১৬ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। বয়স ধরতে হবে ১ জানুয়ারি, ১৯৯০ তারিখের হিসেবে। যেসব ছাত্রছাত্রী এসব বিষয় নিয়ে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন কিংবা বি·এসসি প্রথম বর্ষের ক্লাসে পড়ছেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন।

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসেস এগজামিনেশন

ছ'দিনের এই পরীক্ষা শুরু হবে ৫ অগস্ট ১৯৯০ তারিখে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯০ তারিখে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৬ মার্চ, ১৯৯০। বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিস, ফিজিকস, স্ট্যাটিসটিকস, জুলজি— যে-কোনও একটি বিষয়সহ স্নাতক হলে এই পরীক্ষায় বসা যাবে। তা ছাড়া যাঁদের এগ্রিকালচার-এ ডিগ্রি আছে কিংবা ফরেস্ট্রিতে ডিগ্রি আছে অথবা এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি আছে, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ২১ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। বয়স ধরা হবে ১ জুলাই, ১৯৯০ তারিখের ভিত্তিতে।

এঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস এগজামিনেশন

এই পরীক্ষা নেওয়া হবে ৬ অগস্ট, ১৯৯০। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বেরোবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ তারিখে। আবেদন করার শেষ দিন ২৩ এপ্রিল। যাদের এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি আছে তাঁরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন। এ ছাড়া যাঁরা ওয়ারলেস কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিকস, রেডিও ফিজিকস, অথবা রেডিও এঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে এম-এসসি পাশ করেছেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। বয়স হওয়া চাই ১ অগস্ট, ১৯৯০ তারিখের হিসেবে ২০ বছর থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। যেসব প্রার্থী এ-বছর এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কিংবা সমতুল পরীক্ষায় বসবেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন।

কমবাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এগজামিনেশন (অক্টোবর, ১৯৯০)

একদিনের এই পরীক্ষা নেওয়া হবে ৭ অক্টোবর, ১৯৯০ তারিখে। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ২৮ এপ্রিল, ১৯৯০। আবেদনপত্র জমা দিতে হবে ১১ জুন তারিখের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের নিয়মকানুন মে-টার্মের পরীক্ষার মতোই।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমি এবং নেভাল অকাদেমি এগজামিনেশন (অক্টোবর, ১৯৯০)

একদিনের এই পরীক্ষা নেওয়া হবে ২১ অক্টোবর, ১৯৯০। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে ১৯ মে, ১৯৯০। দরখাস্ত জমা দিতে হবে ২ জুলাই তারিখের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়ঃসীমা সব-কিছুই মে-টার্মের পরীক্ষার অনুরূপ।

সিভিল সার্ভিসেস (মেইন) এগজামিনেশন (১৯৯০)।

তিন সপ্তাহ মেয়াদের এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে। যাঁরা সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশ করবেন, তাঁরাই শুধু এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন।

আমরা যেসব পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করলাম, এর মধ্যে ডিফেন্স সার্ভিসেসের পরীক্ষা ছাড়া অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে তপসিলি জাতি উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমা পাঁচ বছর পর্যন্ত ছাড় আছে।

এবার দু-একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা বিষয়ে আলোচনা করছি। যেমন ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এগজামিনেশন। দুটি আবশ্যিক বিষয়। জেনারেল ইংলিশ এবং জেনারেল নলেজ। এ ছাড়া দুটি ঐচ্ছিক বিষয়। এগ্রিকালচার, বটানি, কেমিস্ট্রি, সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং, জিওলজি, এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিকস, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিকস, জুলজি— বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রার্থী পছন্দমতো দুটি বিষয়ে পরীক্ষায় বসতে পারেন।

পরীক্ষার ফি আটচল্লিশ টাকা। তপশিলিদের ক্ষেত্রে বারো টাকা। এ ছাড়া লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে পার্সোন্যালিটি টেস্ট নেওয়া হয় ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস কিংবা স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভিসের ক্ষেত্রেও লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিসে পরীক্ষায় বসতে হলে পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষায় বসতে হবে। (ক) জেনারেল ইংলিশ, (খ) জেনারেল স্টাডিজ, (গ) জেনারেল ইকনমিকস-১ (পার্ট -১ এবং পার্ট- ২), (ঘ) জেনারেল ইকনমিকস-২ (পার্ট- ১ এবং পার্ট-২), (ঙ) ইন্ডিয়ান ইকনমিকস (পার্ট-১ এবং পার্ট-২)।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভিসের পরীক্ষায় বসতে হলে পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। (ক) জেনারেল ইংলিশ, (খ) জেনারেল স্টাডিজ, (গ) স্ট্যাটিসটিকস-১, (ঘ) স্ট্যাটিসটিকস-২, (ঙ) স্ট্যাটিসটিকস-৩।

পরীক্ষার ফি আটচল্লিশ টাকা। তপসিলি ক্ষেত্রে বারো টাকা।

স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেনটিসেস এগজামিনেশনের প্রার্থীদের সাতটি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। যেমন— (১) ইংলিশ, (২) জেনারেল নলেজ, (৩) ফিজিকস, (৪) কেমিস্ট্রি (৫), ম্যাথমেটিকস-১, (৬) ম্যাথমেটিকস-২, (৭) সাইকোলজিক্যাল টেস্ট।

প্রশ্নপত্রের মান সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের মতো হয়। সব বিষয়েই অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন থাকে। ম্যাথমেটিকস-১ পেপারে থাকে অ্যালজেবরা, এলিমেন্টারি মেনচুরেশন, ট্রিগনোমেট্রি, অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি। ম্যাথমেটিকস-২ পেপারে থাকে ডিফারেন্সিয়াল এবং ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাস, স্ট্যাটিসটিকস এবং ডাইনামিকস।

পরীক্ষার ফি ছত্রিশ টাকা। তপসিলিদের ক্ষেত্রে ন' টাকা।

বিভিন্ন পরীক্ষার নিয়মকানুন, আবেদনের ফর্ম— সেক্রেটারি, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ঢোলপুর হাউস, শাহজাহান রোড, নতুন দিল্লি-১১০০১১ ঠিকানার অফিস থেকে দু' টাকার মানিঅর্ডারের বিনিময়ে পাওয়া যেতে পারে। তবে যেসব পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র প্রোফর্মা অনুযায়ী টাইপ করে পাঠাতে হয় (যেমন সিভিল সার্ভিসেস এগজামিনেশন, কমবাইন্ড মেডিকেল এগজামিনেশন প্রভৃতি) বাদে অন্যান্য পরীক্ষার ফর্ম পাওয়া যায়।

মোটামুটিভাবে সব তথ্য জানার জন্য ভারত সরকার প্রকাশিত 'হ্যান্ডবুক অব এগজামিনেশন কনডাকটেড বাই ইউ·পি·এস·সি' বইয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ইউনিয়ন সার্ভিস কমিশনের প্রকাশিত 'ক্যানডিডেটস ম্যানুয়েল ফর ইউ· পি· এস· সি অবজেকটিভ টাইপ এগজামিনেশনও পরীক্ষার্থীদের কাছে খুবই উপযোগী। এসব বই ভারত সরকারের বুক ডিপো (৮নং কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা- ৭০০০০১) থেকে পাওয়া যায়।

ভাল চাকরি দিয়ে জীবন শুরু করতে হলে স্নাতক পর্যায় থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে, কেননা স্নাতক স্তরের অনেক বিষয় নিয়ে এইসব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসা যায়।

অসম্ভবের খেলা

এই মজার খেলাটা দেখিয়ে খুব সহজেই তোমার বন্ধুদের অবাক করে দিতে পারো। খেলাটা তৈরি করতে গেলে লাগবে একটা বড় আয়তক্ষেত্রের মাপে কাগজ। কাঁচি, ছুঁচ-সুতো আর দুটো বড় মাপের বোতাম।

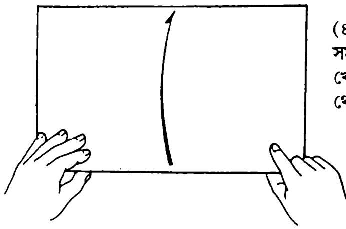

(১) কাগজটা লম্বালম্বি ভাঁজ করো।

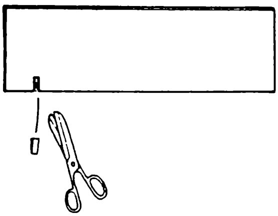

(২) ছবিতে যেভাবে দেখানো আছে সেইভাবে কাঁচি দিয়ে একটু কেটে নাও। পরে ভাঁজ খুলে ফ্যালো।

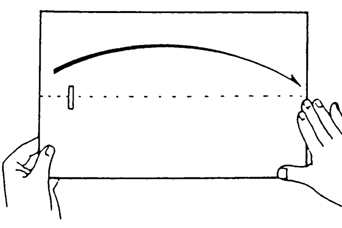

(৩) বাঁ দিক থেকে পুরো কাগজটা ডান দিকে ভাঁজ করো।

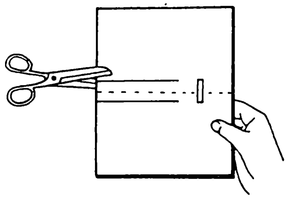

(৪) এবার ভাঁজের দিক থেকে পর পর দুটো সমান্তরাল রেখায় কাঁচি দিয়ে কেটে নাও। খেয়াল রাখবে, উপরের ছোট কাটা অংশ থেকে কিছুটা ব্যবধান যেন থাকে।

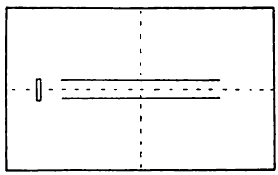

(৫) কাগজটার সব ভাঁজ খুলে ফ্যালো।

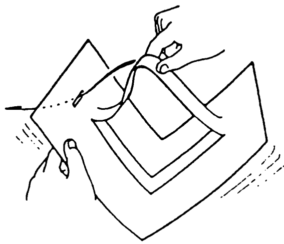

(৬) ছবিতে যেভাবে দেখানো আছে সেভাবে কাগজটা ভাঁজ করে সরু স্ট্রিপটা উপরের ফুটো দিয়ে বার করে একটা ফাঁস বানিয়ে নাও।

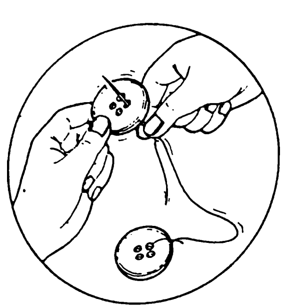

(৭) একটা মোটা সুতোর দু' দিকে দুটো কোটের বোতাম লাগিয়ে নাও।

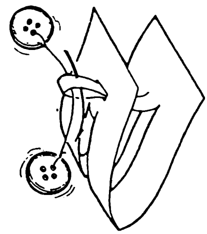

(৮) এই ভাবে বোতামটা ঢুকিয়ে নাও।

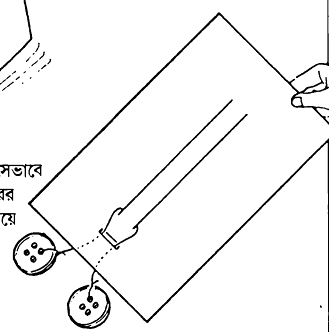

(৯) কাগজটা সমান করে খুলে নাও। এবার বন্ধুদের বলো, কাগজ এবং সুতো না ছিঁড়ে বোতামটা বার করতে হবে। যদি না পারে, তা হলে তুমি ৬নং এবং ৮নং ছবির মতো ফাঁসটা বড় করে বোতামটা বার করার কায়দাটা শিখিয়ে দাও।

কবির

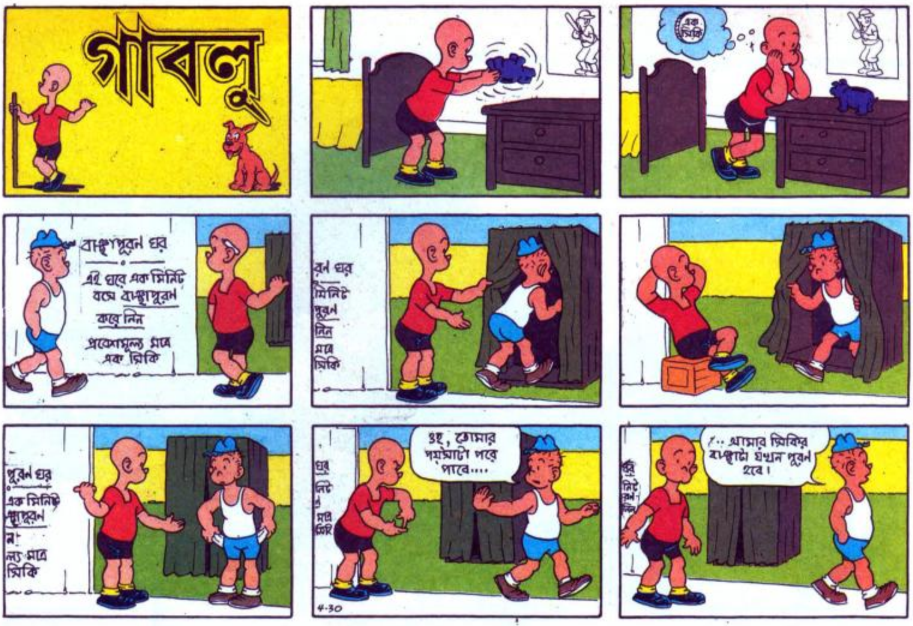
গাবলু
এক সিকি
বাঞ্ছাপূরণ ঘর
এই ঘরে এক মিনিট বসে বাঞ্ছাপূরণ করে নিন
প্রবেশমূল্য মাত্র এক সিকি
উহু, তোমার পয়সাটা পরে পাবে....
....আমার সিকির বাঞ্ছাটা যখন পূরণ হবে।
4-30

গাবলু
7-2

আর্গোস

শিশিরকুমার দাশ

তখন আমার বয়স সবে ছয় কি সাত। আমার বেশ মনে আছে তার কয়েকদিন আগেই আমার জন্মদিন ছিল। বিকেলবেলা আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় আমরা খেলা করছিলাম। গীতা তখন ছড়া কাটছিল—

পোসং পাবই পোসং পা
ডাকুগুনে কেয়া কিয়া ?
শ'রুপায়ে কে ঘড়ি চুরাঈ
পুলিশ বুলায়ী রাজাকী মাঈ—

এমন সময় ছোট্দার চিৎকার শুনে ছুটে এলাম। ছোটদার আবার একটু লাগলেই বেশি চেঁচায়। দু'দিন আগেই পড়ে গিয়ে হাত কেটেছিল। ভাবলাম আবার বুঝি একটা-কিছু হল। হয়তো হাতই ভাঙল। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে দোতলায় গেলাম। যেই ঘরে ঢুকেছি, অমনি একটা ছোট্ট সাদা ধপধপে কুকুরের বাচ্চা আমার দিকে ছুটে এল। আমার আবার কুকুর দেখলেই ভয় হয়। আমি তাই ভয়ে দু'পা পিছিয়ে এলাম। কুকুরটা কিন্তু আমাকে কামড়াল না। আমাকে দেখেই ভয় পেয়ে কিঁউ-কিঁউ করে অন্য দিকে ছুটে গেল। কুকুরটা দেখে কিন্তু খুব সুন্দর লাগল। ছোটদা বললে, "আমাদের কুকুর।"

আমি বললাম, "আমাদের কুকুর! সত্যি-সত্যি, প্রসাদজেঠু কুকুর দিয়েছেন ?"

হয়েছে কি, কয়েকদিন আগে আমরা প্রসাদজেঠুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওঁদের একটা ভারী সুন্দর কুকুর আছে। দুধের মতো সাদা। তার কয়েকটা বাচ্চা হয়েছিল দু-তিনদিন আগে। আমি তখন বলেছিলাম আমরা একটা বাচ্চা পেলে পুষব। বেশ মজা হবে। বেশ খেলা করা যাবে। কুকুরদের তো শিখিয়ে নেওয়া যায়। কানামাছি খেলা যদি শিখিয়ে নেওয়া যায় তো খুব ভাল হয়।

আমি কিন্তু ভাবিইনি যে সত্যি-সত্যি প্রসাদজেঠু আমাদের একটা কুকুর দিয়ে দেবেন। আজ কাকু গিয়েছিলেন ওঁদের বাড়ি। সেখান থেকে একটা বাচ্চা নিয়ে এসেছেন। প্রসাদজেঠুও সঙ্গে এসেছেন, দেখলাম ভেতরের ঘরে বসে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন।

কুকুরটার বয়স এখন একমাস, না একমাসও নয়, ঠিক আঠাশ দিন। কিন্তু কেমন ডাগরটি হয়ে উঠেছে, কেমন সুন্দর তাকায়, কেমন পুতুল-পুতুল ভাব। বাঃ কী মজা! আমার কিন্তু প্রথমটা বেশ ভয় করছিল। গায়ে হাত দেব? কামড়ে দেবে না তো? গা-টা কেমন তুলতুলে, ঘেন্না করবে না তো। না, না, ঘেন্না নয়, তবে আমি তো আগে কোনওদিন কুকুরের গায়ে হাত দিইনি, ওর লাগবে না তো! কাকু বললেন, "এই দ্যাখ্, কীভাবে ধরতে হয়।" আমি কাকুর দেখাদেখি পেটের তলা দিয়ে হাত দিয়ে, আর-এক হাতে গলার কাছটায় জড়িয়ে কোলে তুলে নিলাম। একটু ভয়-ভয় করছিল, কিন্তু কুকুরটা আমাকে তো কামড়াল না, বেশ মিটমিট করে তাকাল। আরামেই শুয়ে রইল হাতের মধ্যে। আমারও ভয় কেটে গেল। কোল থেকে নামালাম, আবার কোলে তুলে নিলাম। কুকুরটা আলমারির নীচে গিয়ে ঢুকে পড়ল। আমি নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কাছে যাবার চেষ্টা করতেই আবার বেরিয়ে এল। বেরিয়েই রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। আমিও দৌড়ে গিয়ে আবার কোলে তুলে নিলাম। আমাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

এর মধ্যে কখন জানি না আমার অন্য দু'জন বন্ধু, যাদের সঙ্গে একটু আগে খেলছিলাম, তারা এসে গেছে। গীতা আর অলকা। তাদের সঙ্গে পাশের বাড়ির সঞ্জীব। ছোটদার বন্ধু। ছোটদা বোধহয় ডেকে এনেছে। সবাই বলছে, "বাঃ! কী সুন্দর!" গীতা বলল, "একটু গায়ে হাত দেব? কামড়াবে না তো?"

আমি বললাম, "না, না, ও তো ছেলেমানুষ, কামড়াবে কী রে।"

কিন্তু গীতা যেই ওর গায়ে হাত দিয়েছে অমনি কিঁউ-কিঁউ করে উঠেছে। আর গীতা 'ও বাবা গো' বলে দু'পা লাফিয়ে পিছিয়ে পড়ল। গীতার আওয়াজ শুনে মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে, আর কাকুকে ডেকে বললেন, "ঠাকুরপো, কুকুর-টুকুর এ-বাড়িতে চলবে না। আমার যথেষ্ট কাজ আছে, আমি আবার কুকুর সামলাতে পারব না।"

আমার বড় রাগ হল। কত কষ্ট করে একটা সুন্দর কুকুর পেয়েছি এতদিন পরে। তা মা বোঝেনই না।

আমি বললাম, "কাজ আমি করে দেব।"

মা বললেন, "তুমি তো কাজ করে উলটে যাবে। এখন কুকুর এলে তোমার পড়াশুনো মাথায় উঠবে, এমনি তো সারাদিন খেলা।"

প্রসাদজেঠু শুনতে পেয়ে বললেন, "না, না, ও থাকুক। ক'দিন পরে দেখবেন, ওকে ছাড়তেই পারবেন না। ওরা একেবারে মানুষের মতো।"

মা বললেন, "সেইজন্যই তো। কুকুর পোষার দুঃখ আছে অনেক। বড় বেশি মায়া পড়ে যায়।"

বাবা বললেন, "তা ছেলেমেয়েরা যখন চায়, তখন থাক না। ভালই হবে। মণিপুরীর সঙ্গে খেলা করবে।"

বাবা আমাকে মণিপুরী বলে ডাকেন মধ্যে-মধ্যে। কারণ, বাবার ধারণা আমার চেহারাটা মণিপুরীদের মতো।

মা বললেন, "ঠিক আছে। চারদিক নোংরা করবে, কাপড়চোপড় কাটবে, দ্যাখো, সামলে রাখো তোমাদের জামা-জুতো। লোকজন এলে ঘেউ-ঘেউ করবে।"

কাকু বললেন, "ভালই তো। চোর এলে তো জানা যাবে।"

মাস দুয়েক আগে আমাদের পাড়ায় বেশ বড় একটা চুরি হয়ে গেছে। অবিনাশ ভট্টাচার্যদের বাড়িতে। তারপর থেকে তাঁরা একটা কুকুর পুষেছেন। ইয়া বড় বুল ডগ, দেখলেই ভয় হয়—বাবা গো। একদিন আমাকে প্রায় খেয়েই ফেলত। বিচ্ছিরি কুকুর।

মা বললেন, "হ্যাঁ, চোর তাড়াবে ওই কুকুর? পুঁচকে, ওকে কে সামলায় তার ঠিক নেই।" বলেই মা রান্নাঘর থেকে একটা বাটি-ভর্তি দুধ নিয়ে এলেন। আমি তো বাটিতে দুধ খাই না, হঠাৎ আবার দুধের বাটি কেন। না, আমার জন্য নয়। মা ডাকলেন, "অ্যাই, এদিকে আয়—তু—তু···"

ছোটদা বললে, "তু-তু করছ কেন? এ কি বেড়াল? এ হল কুকুর। এর সঙ্গে কথা বলতে হবে ইংরেজিতে—কাম্-কাম্— ড্রিঙ্ক।"

মা বললেন, "তুই থাম। কুকুরের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় আমাকে শেখাসনি।" বলেই কড়া সুরে ডাকলেন, "আয়। দুধ খেয়ে নে।"

ও মা, কী আশ্চর্য, সত্যি-সত্যি কুকুরটা আলমারির তলা থেকে বেরিয়ে একটু লাজুক-লাজুক মুখে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়াল, একবার পা দুটো শুঁকল। তারপর চুকচুক্ করে দুধটা খেয়ে নিল। মা বেশ খুশি হয়ে বললেন, "বা, লক্ষ্মী ছেলে! দেখলি তো কেমন সুন্দর দুধ খেয়ে নিলে। তোদের মতো ঝামেলা নেই।"

কুকুরকে মা বলে দিলেন 'লক্ষ্মী ছেলে'। কোনও কাণ্ডজ্ঞানই নেই।

দুধটা খাওয়ার পর মা বললেন, "এইটে তোর বাটি, বুঝলি। এই বাটিতে দুধ খাবি।"

কুকুরটা কী বুঝলে জানি না। মা যেই বাটিটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, কুকুরটা হঠাৎ মা'র ঝুলে পড়া আঁচলটা কামড়ে ধরল। মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "অ্যাই, ছাড়, ছাড়, তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কী, ছাড়াবি তো···।"

ছোটদা কিছু করার আগেই মা'র আঁচলের একটা অংশ কুকুরটা দাঁত দিয়ে খুবলে নিয়েছে। মা আঁচলটা দেখেই, "যা বলেছিলাম," বলে রেগে উঠলেন। "দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে," বলে মা এগিয়ে গেলেন। সত্যি-সত্যি মারবেন নাকি। আমি ভাবছি ছোট্ট কুকুর, কান্নাকাটি শুরু না করে! কুকুরটা ভয় পেয়ে চট্ করে বাবার চেয়ারের তলায় লুকিয়ে পড়ল। ওই ঘরে প্রসাদজেঠু বসে আছেন। এখানে গিয়ে বোধহয় মা আর মারধোর করবেন না। কুকুরটা চেয়ারের তলা থেকে একবার মুখ বাড়াল। মাকে দেখেই আবার মুখ লুকিয়ে নিল।

"আবার লুকনো হচ্ছে, হতভাগা।" মা'র ধমক শুনে কুকুরটা একেবারে গুড়ি মেরে শুয়ে পড়ল। ওর রকমসকম দেখে মা হেসে ফেললেন। ছোটদা মা'র দিকে তাকিয়ে দেখছিল। মাকে হাসতে দেখে বললে, "তা হলে আমরা কুকুর পুষছি। ওর শোবার জায়গা কোথায় করা যায়, মা?"

মা বললেন, "আমার মাথায়।"

এর মধ্যে কুকুরটা বেরিয়ে এসেছে চেয়ারের তলা থেকে। দৌড়ে ঢুকে গেল আমাদের শোবার ঘরে। আর পেছনে-পেছনে মা ছুটলেন।

॥ দুই ॥

কুকুরটা ধপধপে সাদা। শুধু চোখের নীচে একটা ছোট্ট কালো দাগ। দেখলেই ভাল লাগে। প্রসাদজেঠু বলে গেলেন, "এরা হল পমেরিয়ানদের বংশধর। এদের বলে স্পিত্‌জ। খুব বড় হবে না। তবে বড় খরগোশের চেয়ে একটু বড় হবে। সাত-আট মাসের মধ্যেই বেশ ভাল চেহারা হবে। বেশি বড় হবার দরকার কী? তা হলে আমার সঙ্গে খেলার অসুবিধা হবে। আমি তো আর নেকড়ে বাঘের সঙ্গে খেলতে চাই না।"

সবই বলল, "কী নাম রাখা যায়?"

আমি বললাম, "ওর নাম থাক রিনি।" আসলে রিনি নামটা আমার খুব ভাল লাগে। আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে থাকে, তাকে আমার খুব ভাল লাগে, সে অবশ্য আমাকে চেনে না। একদিন তার মা তাকে রিনি বলে ডাকছিলেন। তাই জানি তার নাম রিনি। কিন্তু ছোটদা বললে, "রিনি তো মেয়েদের নাম। আমাদের কুকুর তো মেয়ে নয়। কাজেই মেয়ের নাম দেওয়া ঠিক হবে না।"

হ্যাঁ, কথাটা তো ঠিক। যদিও ছোটদার বলার ধরনটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। আমি বললাম, "বেশ তো। তুই একটা নাম বল না।"

ছোটদা মাথা চুলকে বলল, "ওর নাম দে—ধর-ধর-গোল্‌ডি।"

আমি মুখ ভেংচে বললাম, "কী নাম হল!"

ছোটদা বলল, "গোল্‌ড থেকে গোল্‌ডি।"

আমি বললাম "বাজে নাম।" আমি বললাম, "গোল্‌ডি সেনগুপ্ত একটা নাম হল!"

ছোটদা বলল, "তুই আবার সেনগুপ্ত জুড়ছিস কেন?"

আমি বললাম, "বা রে, আমাদের কুকুর, আমরা সেনগুপ্ত, আমাদের কুকুরও সেনগুপ্ত।"

ছোটদা হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, "বোকা, তোর মাথায় কিছু নেই। কুকুরেরা আবার সেনগুপ্ত হয় নাকি!"

না-হবার কিছু কারণ আছে? আমি তো বাপু কিছুই বুঝি না। কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, "দ্যাখ, দাদুকে আমি খুব ভালবাসি।"

ছোটদা বলল, "সে তো আমিও ভালবাসি, তা হয়েছে কী?"

আমি বললাম, "দাদুর নামটা আমাদের কুকুরকে দিলে কেমন হয়?"

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেলেন কথাটা। বললেন, "তোদের কি বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না কোনও কালে? দাদুর নাম দিবি কুকুরকে?"

কাকু খবরের কাগজ পড়ছিলেন পাশে বসে। হঠাৎ কাকুর হাত থেকে খবরের কাগজটা ছিটকে পড়ল আর-একটা ভীষণ জোরে হাঁচি হল। তারপর দেখি কি কাকু হো-হো করে হাসছেন। একেবারে বাড়ি ফাটিয়ে, পাড়া কাঁপিয়ে হাসি। কাকু প্রচণ্ড জোরে হাসেন মধ্যে-মধ্যে। কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর হাসি আমি কখনও দেখিনি। পাগল হয়ে গেলেন নাকি! খবরের কাগজে কি কোনও মজার খবর আছে! মা-ও অবাক হয়ে কাকুকে দেখছেন, "হল কী তোমার?"

পাশের ঘরে বসে বাবা টাইপ করছিলেন। বলে উঠলেন, "এ-রকম হিপোপটেমাসের মতো হাসছিস কেন রে, পটল?"

কাকুর নাম পটল। কাকু আমার চুল টেনে বললেন, "বেড়ে বলেছিস বাচ্চু। তোর মাথা আছে।"

অন্যসময় কাকু বলেন, আমার নাকি মাথা নেই।

কাকু মাকে বললেন, "শুনেছ বউদি, তোমার মেয়ে কুকুরের নাম কী দিচ্ছে?" বলেই কাকু আবার পেটে হাত দিয়ে হাসতে আরম্ভ করলেন।

আমি বুঝলাম যে দাদুর নামটা কুকুরের নাম হওয়া উচিত নয়। যদিও ওঁদের আপত্তি যে কেন তা আমি বুঝতে পারলাম না।

কাকু বললেন, "শোন, ওর নাম রাখ ডায়মন্ড।"

ছোটদা বললে, "গুড়, নিউটনের কুকুরের নাম।"

মা বললেন, "ইংরেজি নামের দরকার কী?"

ছোটদা বলল, "তা হলে নাম দাও হীরক।" আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হীরককুমার সেনগুপ্ত, কেমন নাম হবে?"

আমি চুপ করে রইলাম। আমার বাবা বেশি বলে দরকার নেই। এত হাসাহাসির কী আছে বাপু!

কাকু বললেন, "না, বাচ্চুর এ নামটা পছন্দ হচ্ছে না। এক কাজ কর, তোরা এর নাম রাখ ···" কাকু কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখে বললেন, "আর্গোস!"

আমি বললাম, "কী বললে? খরগোশ?"

কাকু বললেন, "খরগোশ নয়, আর্গোস, আর-গোস।"

মা বললেন, "সেই ইংরেজি নাম?"

কাকু এবার বিরক্তির সুরে বললেন, "দূর ছাই। কে বলেছে ইংরেজি। এটা হল গ্রিক নাম। এর মানে হল "সাদা, বুঝেছিস।"

ছোটদা বললে, "সাদা, মানে হোয়াইট?"

কাকু বললেন, "ইয়েস সার! হোয়াইট। কিন্তু শুধু তাই নয়, আরও অনেক ব্যাপার আছে। তোদের সেই গল্প বলেছিলাম মনে আছে—অডিসেউসের গল্প। সেই যে ইথাকার রাজা, ট্রয়ের যুদ্ধের পর পনেরো-ষোলো বছর পরে নানা দেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত নিজের রাজ্যে ফিরেছিল, মনে আছে?"

আমার একটু-একটু মনে পড়ছিল।

কাকু বললেন, "মনে নেই, অডিসেউস যখন নিজের দেশে ফিরল, কেউ তাকে চিনতে পারেনি। এতদিন কেটে গেছে, দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা, গায়ে ছেঁড়া জামা, পায়ে ছেঁড়া জুতো—চেহারাও পালটে গেছে, কী করেই বা চিনবে লোকে বল? কিন্তু একজন, মানে—একটা কুকুর কিন্তু চিনতে পারল তাকে।"

ছোটদা মুরুব্বির মতো বলল, "হ্যাঁ কুকুর তো মাস্টারদের, মানে প্রভুদের, কখনও ভোলে না।"

কাকু বললেন, "ঠিক। অডিসেউসের কুকুর তার প্রভুকে ভোলেনি। এতদিন পরে প্রভুর সঙ্গে দেখা যেই হল, অমনি তার পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'বার মুখ তুলে তাকাল, তারপর, সব শেষ, আর নড়ল না।"

আমি জানতে চাইলাম, "কেন? কী হল?"

ছোটদা বলল, "বুঝলি না? মরে গেল। হি ডায়েড।"

আমি তারপর ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তা, আমাদের কুকুরের নাম সেজন্য···"

কাকু বললেন, "আর্গোস রাখতে হবে কেন?" আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "সে তোর ইচ্ছে। আমি শুধু একটা সাজেসশান দিলাম। ওই যে অডিসেউসের কুকুরটার কথা বললাম, তার নাম ছিল আর্গোস। এ হল হোমারের দেওয়া নাম।"

হোমারটা আবার কে? জিজ্ঞেস করলে ধমক খাব কি না কে জানে। তবু ছোটদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হোমার কী?"

ছোটদা অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "সে একটা কঠিন ব্যাপার, এখন নয়, পরে বুঝিয়ে দেব।"

কাকু বললেন, "না, না, কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। হোমার হলেন গ্রিকদের সবচেয়ে পুরনো কবি। আমাদের যেমন বাল্মীকি।"

"বাল্মীকির কথা আমি জানি, রামায়ণের গল্প জানি।"

"হ্যাঁ, সেই হোমারের লেখা বই, পড়বি, বড় হলে পড়বি। তার

মধ্যে আছে আর্গোসের কথা। ভেবে দ্যাখ দিকি, কত ভাল কুকুর, প্রভুভক্ত। তাই তোদের কুকুরের নাম থাক আর্গোস।"

আমার অবশ্য এখনও একটু খুঁত খুঁত, যাকগে, আর্গোস শব্দটা মন্দ নয়, খরগোশ-খরগোশ লাগে। আচ্ছা, যার নাম দেওয়া হচ্ছে তার কোনও মতামত নেই বুঝি। আমার খুব খারাপ লাগে। মা-বাবা বেশ খুশিমতো নাম দিয়ে দেন। কেন, ছেলেমেয়ের বুঝি নিজের কোনও ইচ্ছে নেই। এই ধরো না আমার নামটাই, আমার কিন্তু ঠিক, ওমা, আমি খেয়ালই করিনি, কুকুরটা ছোটদার পেন্সিলটা কামড়াচ্ছে। আমি বললাম, "ছোটদা তোর পেন্সিল..."

ছোটদা চেঁচিয়ে উঠল, "আর্গোস।"

সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটা পেন্সিল ফেলে দিয়ে আমার পেছনে এসে লুকিয়ে পড়ল। তার মানে কি তা হলে এই যে, ও বুঝতে পেরেছে ওর নাম আর্গোস! কান খাড়া করে শুনছিল অবশ্য। হয়তো নামটা পছন্দ হয়নি, তাই পেন্সিল কামড়াচ্ছিল। এমন সময় দরজায় কে যেন টোকা দিল। আর কুকুরটা ভৌ ভৌ করে দরজার দিকে দৌড়ল। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "চুপ করে বোস্, আর্গোস।"

সত্যি-সত্যি, চুপ করে গেল। তা হলে বোধহয় নামটা পছন্দ হতেও পারে। আর্গোস সেনগুপ্ত? না, না, ওর অতবড় নামের দরকার কী? ও তো আর ইস্কুলে যাচ্ছে না। ওকে তো আর নামসই করতে হবে না। আমি আবার ডাকলাম, "আর্গোস।" এবার ল্যাজ নাড়াল। ছোটদা দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন আমাদের পাশের বাড়ির ভদ্রলোক, ভাটনগর। তিনি এসেছেন বাবার কাছে। কুকুর দেখে বললেন, "বাঃ, তোমাদের তো খুব সুন্দর কুকুর! কী নাম রেখেছ এর?"

ছোটদা কিছু বলার আগেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হোমার।" বলেই জিভ কেটেছি। তখন দেখি ছোটদা বলছে, "আর্গোস। হোমারের দেওয়া নাম।"

ভাটনগর সাহেব বললেন, "আর-গোস। অঃ, তা হোমারটা কী?"

আমি এবার বুক ফুলিয়ে বললাম, "হোমার গ্রিকদের বাল্মীকি। ওদের রামায়ণে একটা কুকুরের নাম আছে আর্গোস। আমাদের কুকুরের নামও তাই আর্গোস।"

ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন, "বেশ, বেশ।"

আমার এবার মনে হল, বেশ নাম, আর্গোস আর্গোস খরগোশ। আমি ওর মুখের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললাম, "তোর নাম পছন্দ হয়েছে, তাই না রে আর্গোস?"

আর্গোস আমার গাল চেটে দিল।

॥ তিন ॥

মাস তিনেকের মধ্যে আর্গোস বেশ বড়-সড় হয়ে উঠল। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে কী বলব। হঠাৎ কোথাও শব্দ শুনলে উঠে দাঁড়ায় বিদ্যুৎ-গতিতে। কান দুটো খাড়া হয়ে ওঠে। চোখগুলো জ্বলজ্বল করে। গায়ের সাদা লোমগুলো ফুলে-ফুলে ওঠে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়, যেন রাজপুত্তুর।

মা বলেন, "ওর একটা চোখ ট্যারা। ওই ট্যারা চোখটার জন্যই ওকে আমার আরও ভাল লাগে।" ছোটদার বাঁ চোখটাও একটু ট্যারা। মা কখনও-কখনও আদর করে আর্গোসকে ডাকে 'টেরুবাবু'।

আমাদের বাড়ির সামনেই কিরোজিমল কলেজের মস্ত বড় মাঠ। বিকেলবেলা ওই মাঠে আমি আর্গোসকে নিয়ে যাই। গীতা-অলকার সঙ্গে আমরা কানামাছি খেলি। আর্গোস কখনও দৌড়োয়। কখনও চুপচাপ বসে থাকে। মাঠের এক কোণে অশোকগাছগুলোর নীচে কখনও-কখনও কাকদের মেলা বসে। আর্গোস ভৌ ভৌ করে ছুটে যায় সেই দিকে। কাকগুলো চিৎকার করতে করতে উড়ে পালায় চারদিকে। অনেক সময় ও আমার কোনও কথাই শোনে না। মালীদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমি তখন দৌড়ে-দৌড়ে ওকে জাপটে ধরি, চামড়ার দড়ি, মানে, লিস দিয়ে বাঁধি। যেদিন গীতা-অলকা দেরি করে আসে, সেদিন আমি ওর সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়োই। মাঠের মধ্যে যেদিকটায় ঘন ঘাস, সেখানে অনেক রকম প্রজাপতি। আর্গোস প্রজাপতি ধরার জন্য দৌড়োয়। প্রজাপতি ফুড়ুত করে উড়ে পালায়। ওরাও বোধহয় আর্গোসের সঙ্গে খেলা করতে চায়। নীল-সবুজ-হলুদ রঙের প্রজাপতিগুলো ঠিক নাকের সামনে ডানা মেলে উড়তে থাকে, আর্গোস হঠাৎ পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে সামনের পা দুটো তুলে, প্রজাপতি ধরে ফেলল বুঝি, কিন্তু প্রজাপতিরা আরও ওপরে উড়ে যায়। আর্গোস একবার পেছন ফিরে আড়চোখে দেখে নেয়, আমি দেখছি কি না, তারপর আবার ছুটতে থাকে। মাঠের শেষ দিকে ঘন ঘাসের জঙ্গল। সেখানে অনেক বকুল গাছ, আমগাছ। জায়গাটা সবসময় ছায়ায় অন্ধকার। সেইখানে ঘাসের মধ্যে আর্গোস লুকিয়ে পড়ে। আমি চেঁচিয়ে ডাকি, "আর-গোস, আ-র-গোস।" হঠাৎ সবুজ ঘাসের ভেতরে যেন ঢেউ ওঠে, তারপর হঠাৎ একটা সাদা মুখ বেরিয়ে আসে। কালো-কালো চোখ। আমি বলি, "ফিরে আয়।" অমনি আবার ঘাসের মধ্যে ডুবে যায় আর্গোস। যেন বলতে চায়, কই ধরতে পারলে না তো!

আমি রাগ করি। বলি, "বেরিয়ে আয়, আমি চলে যাচ্ছি।" আর্গোস ঘাসবন থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু যেন আমাকে চেনেই না এমন ভাব দিয়ে শাঁ করে দৌড়ে চলে যায় কলেজের গেটের দিকে। আরে, আরে, ওদিকে যে বড় রাস্তা, রাস্তায় বাস, ট্যাক্সি, সাইকেল, স্কুটার। আমাকে জ্বালানোর শেষ নেই। এখনও তো রাস্তা পার হতে শেখেনি। ওই রাস্তায় গেলে যে চাপা পড়বি সে খেয়ালই নেই। আমার ভয় হয়। এমন সময় হঠাৎ দেখি আমার ফ্রকের পেছন ধরে টান মারছে আর্গোস। আরে, কখন ফিরে এসেছে! ওর মাথায় শুধু দুষ্টুমি।

একদিন দেখি কলেজের প্রিন্সিপাল আসছেন। সঙ্গে তাঁর মোটা কালো ইয়া এক কুকুর। তাকে দেখে আর্গোস ভয় পেয়েছে। পাবেই তো। দেখলেই ভয় হয়। প্রিন্সিপালের কুকুর ভীষণ চেঁচাচ্ছে আর প্রিন্সিপাল ধমক দিচ্ছেন। আর্গোসও একবার চেঁচিয়ে উঠল। আর কথা নেই। সেই কালো কুকুর প্রিন্সিপালের হাত থেকে লিস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায় আর কি! আর্গোসের এত বড় আস্পর্ধা। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। প্রিন্সিপাল বললেন, "ভয় নেই, ভয় নেই।"

আমি আর্গোসকে কোলে তুলে নিলাম।

প্রিন্সিপাল বললেন, "ডোন্ট্ বি অ্যাফ্রেড।" প্রিন্সিপালের বাড়ির চাপরাশি এসে প্রিন্সিপালের হাত থেকে লিসটা নিয়ে কুকুরটাকে একটু দূরে নিয়ে গেল।

প্রিন্সিপাল বললেন, "কুকুর পুষছ। ভেরি গুড। আসলে কী জানো, কুকুরকে ট্রেনিং দিতে জানতে হয়। ধরো, আমার কুকুর, যা বলব, তা শুনবে। হঠাৎ চাপরাশির হাত ছাড়িয়ে কুকুরটা আমাদের দিকে ছুটে এল। প্রিন্সিপাল চেঁচিয়ে উঠলেন, "ক্রুশো, ক্রুশো। ডোন্ট গো দেয়ার।"

আমার তো প্রাণ শুকিয়ে গেল। আমাদের কাছে এসে প্রিন্সিপালের কুকুর তার লম্বা মুখটা হাঁ করে আমার সামনে পা তুলে দাঁড়াল। লকলকে জিভটা বেরিয়ে এল। চোখ দুটো লাল।

প্রিন্সিপাল বললেন, "ভয় নেই, গো অ্যাওয়ে।" কিন্তু কুকুর নড়ল না। আবার চাপরাশি এসে টেনে নিয়ে গেল।

প্রিন্সিপাল বললেন, "দেখলে তো, কী রকম ট্রেনিং ! যেতে বললাম, চলে গেল। তোমরাও কুকুরকে ভাল করে ট্রেনিং দেবে।"

বাজে কথা। 'যেতে বললাম চলে গেল'—আমাদের কামড়ে দিচ্ছিল একটু হলেই। চাপরাশিটা ওকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল।

প্রিন্সিপাল বললেন, "এ হল খাস্ বিলিতি কুকুর। এই দ্যাখো, কীরকম ট্রেনিং।" ওঁর হাতের বলটা ছুঁড়ে দিলেন, দিয়েই বললেন, "ক্যাচ ইট্।" কুকুরটা ওঁর দিকে তাকিয়ে গ্যাঁক করে উঠল, বল ক্যাচ করার কোনও ইন্টারেস্টই নেই। চাপরাশিটা অবশ্য বাঁ হাত বাড়িয়ে বলটাকে লুফে নিল। ও বোধহয় ভাল ক্রিকেট খেলত এক সময়ে। প্রিন্সিপাল এবার ধমক দিয়ে বললেন, "নটি ডগ্। কাম হিয়ার। কাম্ হিয়ার।"

কুকুরটা কিছুতেই কাছে এল না। দূরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি বললাম, "বোধহয় ইংরেজি ভাল বুঝতে পারছে না। হিন্দিতে বলুন।"

প্রিন্সিপাল এবার বেশ রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কাম হিয়ার! উইল ইউ ?"

ক্রুশো শুয়ে রইল।

প্রিন্সিপাল একটু অপ্রস্তুত হলেন। আমি বললাম, "বোধহয় রাগ করেছে।"

প্রিন্সিপাল বললেন, "নো-নো। ইয়েস, ইউ আর রাইট। বোধহয় রাগ করেছে।" বলেই মিষ্টি সুরে বললেন, "অল রাইট ক্রুশো, অল রাইট, ইউ লাই ডাউন।"

শুয়েই তো আছে, তাকে আবার 'লাই ডাউন' বলার দরকার কী। কী জানি বাবা! কিন্তু প্রিন্সিপালের ক্রুশো উঠে দাঁড়াল।

প্রিন্সিপাল চেঁচাতে লাগলেন, "লাই ডাউন, আই সে, লাই ডাউন।"

কুকুর প্রিন্সিপালের দিকে তাকিয়ে এমন জোরে একটা চিৎকার করল যে, তিনি ভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেলেন। চাপরাশি কুকুরটাকে টেনে ধরে থাকল। প্রিন্সিপাল চাপরাশিকে খুব বকতে লাগলেন হিন্দিতে। বেচারার কী দোষ জানি না। বললেন, "গেট আউট।"

কাকে চলে যেতে বললেন ? চাপরাশিকে না তাঁর কুকুরকে ? না আমাদের ? আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, "হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি।"

চাপরাশি কুকুরটাকে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। এতক্ষণ পরে আমি আর্গোসকে কোল থেকে নামালাম। আর্গোস সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়তে লাগল।

আমি ডাকলাম, "আর্গোস, ফিরে আয়।"

আর্গোস দৌড়ে ফিরে এল।

প্রিন্সিপাল বললেন, "দেখলে তো, কেমন ট্রেনিং দিলাম!"

উনি কি ট্রেনিং দিলেন আমি তো বুঝলাম না। যাক্‌গে, গুরুজনদের সঙ্গে তো তর্ক করতে নেই, তা তাঁরা যতই বোকার মতো কথা বলুন না কেন!

আমি বললাম, "হ্যাঁ, খুব ভাল ট্রেনিং।"

প্রিন্সিপাল আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে এগোলেন। আমিও আর্গোসকে বললাম, "চল্, তোকে ট্রেনিং দেব বাড়ি গিয়ে।"

আর্গোস ভৌ ভৌ করে উঠল। দেখি দূরে ছোটদা সাইকেলে করে যাচ্ছে। আর্গোস দৌড়তে শুরু করল। আমি বললাম, "কাম হিয়ার।" কিন্তু আর্গোস ছুটতেই লাগল। আমি পেছনে দৌড়তে-দৌড়তে বললাম, "দেন, ডোন্ট কাম হিয়ার। ইউ রান।" আর্গোস ছুটতে লাগল। আমি খুশি হলাম। বললাম, "আর্গোস, রান, রান।"

হঠাৎ আর্গোস থেমে গেল। আমি বললাম, "তা হলে, ডোন্ট রান।"

॥ চার ॥

কাকুকে বললাম, "তোমাদের প্রিন্সিপালের ট্রেনিং কীরকম জানো, আসতে বললে শুয়ে পড়ে, দাঁড়াতে বললে দৌড়োয়। এই হল ট্রেনিং। তবে হতে পারে যে ও এখনও ভাল ইংরেজি শেখেনি।"

কাকু বললেন, "সেটা ঠিক বলেছিস। প্রিন্সিপাল সাহেবের ইংরেজিটা এখনও বুঝতে পারছে না। আগে খাস সাহেবের কুকুর ছিল তো।"

আমাদের আর্গোসের ওসব সমস্যা নেই। ও শুধু বাংলা শেখে। ওর হিন্দি, ইংরেজি এসব শিখে কী হবে।

ছোটদা বলল, "থ্রি ল্যাংগুয়েজ ফরমুলা জানিস তো!"

আমি আবার সেটা কী জিনিস জানতাম না।

ছোটদা বুঝিয়ে দিলে, প্রত্যেক ভারতবাসীকে তিনটে ভাষা শিখতে হবে, মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা আর ইংরেজি ভাষা। আর্গোস তো ভারতবাসী, কাজেই শুধু মাতৃভাষায় কাজ চলবে না। বিশেষ করে আমরা তো বাংলাদেশের বাইরে থাকি। হিন্দি শিখতেই হবে। আর্গোস অবশ্য হিন্দি একটু-একটু বোঝে। গীতা, অলকা তো ওর সঙ্গে হিন্দিতেই কথা বলে, ইংরেজিটা তেমন জানে না। ভাটনগর-সাহেবও চান আর্গোস শিখুক হিন্দি।

দু'-তিনদিন ছোটদা আর্গোসের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে আরম্ভ করল। কিন্তু ছোটদা বলল, "আর্গোসকে দিয়ে হবে না। 'কাম হিয়ার' বললে সে আঁচড়ে দেয়, 'গো দেয়ার' বললেও যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে থাকে। "ব্রিং দ্য নিউজ পেপার" বললে দেওয়ালে টিকটিকি খোঁজে। অথচ মা যেই ডাকেন 'দুধ খাবি আয়', সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে দুধ খেয়ে মুখটা মার শাড়িতে মুছে চলে আসে। হিন্দিতেও বিশেষ আগ্রহ নেই আর্গোসের। ভাটনগর-সাহেব, "ক্যায়সা হো কুত্তা" বলেছিলেন, সেদিন নাকি আর্গোস ওঁর এক পাটি চপ্পল তক্তপোশের নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। উনি বলেছিলেন, "তুমহারে কুত্তা শয়তান হ্যায়।" তখন আর্গোস নাকি ভৌ ভৌ করে তেড়ে গিয়েছিল। তাতে মনে হয় হিন্দিতে বকলে আর্গোস বুঝতে পারে।

কাকু বলেছিলেন প্রিন্সিপালের কুকুর টিভি দ্যাখে, ক্ল্যাসিকাল গান শোনে। নিশ্চয়ই ওয়েস্টার্ন মিউজিক। আর্গোস কিন্তু হিন্দি গান বেশ পছন্দ করে। প্রিন্সিপালের কুকুর ক্ল্যাসিকাল গান তন্ময় হয়ে শোনে, অন্তত প্রিন্সিপাল তাই বলেন। আমাদের আর্গোসের কিন্তু কোনও আগ্রহ নেই ওতে। তা ছাড়া প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, তাঁর কুকুর লেখাপড়া পছন্দ করে, কেউ আজেবাজে কথা বললে রাগ করে। কাকু নাকি একদিন প্রিন্সিপালের বাড়ি গিয়ে দেখেছিলেন কুকুরটা টেবিলে বসে আছে, আর-একটা পা দিয়ে অক্সফোর্ড ইংরেজি ডিক্শনারির পাতা ওলটাচ্ছে। কাকু অবশ্য অনেক সময় বানিয়ে বানিয়ে বলেন। কিন্তু আর্গোসের সামনে বই থাকলে ও একটু শোঁকে ঠিকই, কিন্তু কখনও চাটেনি। মা'র একটা বই একদিন অবশ্য আর্গোস চেটেছিল। কিন্তু আসল কারণ হল, বইটার ওপর টম্যাটো সস্ পড়ে গিয়েছিল একটু। না, আর্গোসের কোনও ট্রেনিংই হল না ঠিকমতো। বাবা সেদিন খেতে-খেতে উঠে গিয়েছিলেন টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলতে। ফিরে এসে দেখলেন, আর্গোস টোস্টটা খাচ্ছে। টেবিলের ওপর উঠে টোস্ট নিয়ে টেবিলের নীচে বসে খেয়ে ফেলল। সত্যি, কী অন্যায়! বাড়িতে কোনও ভদ্রলোক এলে এমন চেঁচায় যে, তাঁরা ভাবেন আমরা কুকুরকে কোনও শিক্ষা দিইনি।

সবচেয়ে বড় কথা, স্নান করতে চায় না। স্নান করার কথা শুনলেই

আলমারির তলায় গিয়ে লুকোবে। একদিন তো স্নানের পর মা'র আঙুল কামড়ে দিল। মা-ও অবশ্য দিয়েছেন থাপ্পড়।

মারও সেই এক কথা, আর্গোসের কোনও ট্রেনিং হচ্ছে না। অন্যদের কুকুর কত ভদ্র। বল ছুঁড়ে দিলে কুড়িয়ে আনে। খবরের কাগজ নিয়ে আসে। কাদের বাড়ির কুকুর নাকি চিঠি নিয়ে ডাকবাক্সে পোস্ট করে আসে। কাদের বাড়ির কুকুর নাকি বাইরের লোক এলে ফ্যান চালিয়ে দেয়। কোনও-কোনওটা পা বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে। আর আমাদের আর্গোস শুধু খেয়ে-খেয়ে ধিঙ্গি হচ্ছে। লোকজন এলে অসভ্যের মতো চিৎকার করে। থামতে বললেও থামে না। বাবার কাফ-সিরাপের শিশিটা ভেঙে দিয়েছে, কাফ-সিরাপও খেয়েছে বোধহয় কিছুটা। আর খাবার দেরি হলেই মেজাজ দেখায়, ঠিক আমাদের মতো। আসলে আমাদের পাশের বাড়ির ঘোষালমশাইয়ের জন্যই এইসব। সেদিন ভদ্রলোক মন্দির থেকে পুজোর প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছিলেন, ভাবলেন আমাদের এখানে বসে একটু আড্ডা দিয়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন, তাই আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। উনি আবার কুকুর, বেড়াল, টিয়া পাখি দু' চক্ষে দেখতে পারেন না। "পটল, আছ না কি হে," বলে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছেন আর আর্গোসও ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওঁর ওপর। উনি এমন চেঁচিয়ে উঠেছেন যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। ছোটদা ছুটে গেছে চিৎকার শুনে। ছোটদাকে দেখে উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আগে কুত্তাকো বাঁধো।" উনি আবার উত্তেজিত হলেই হিন্দি বলতে আরম্ভ করেন আর ওঁর হিন্দি শুনলেই আমার হাসি পায়।

ছোটদা ক্যাবলার মতো মুখ করে বললে, "কী হয়েছে কাকাবাবু ?"

ঘোষালমশাই বললেন "পহেলে কুত্তাকো বাঁধো। তারপর অন্য কথা।"

ছোটদা আর্গোসের কান ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। ঘোষালমশাই বলতে আরম্ভ করলেন, "দ্যাখো, কুত্তা-টুত্তার ভয় পাই না আমি। আমি এক সময় বাঘ শিকার করেছি।"

এ-কথা আগেও বলেছেন উনি। ওঁর বাড়িতে একটা বাঘছাল আছে। তার ওপরে বসে সন্ধেবেলা উনি ধ্যান করেন খালি গায়ে। কাকুর মত হল, এই বাঘছালের সঙ্গে ওঁর বাঘ শিকারের কোনও সম্পর্ক নেই। উনি চিড়িয়াখানার বাইরে কোনও সত্যি বাঘ দেখেননি। তবে বাঘের মাসি দেখেছেন অনেক।

ঘোষালমশাই চেয়ারে বসে বললেন, "যাদের বাড়িতে অসভ্য কুকুর থাকে, তাদের লিখে দেওয়া উচিত—'বিওয়ার অব ডগস্'। ভয় আমি পাই না। তবে কামড়ে দিলে জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে। তা তোমরা অ্যান্টি-ব্যাডিস্ ইনজেকশান দিয়েছ তোমাদের কুত্তাটাকে ?" বারবার আর্গোসকে 'কুত্তা' বলাটা আমার ভাল লাগছিল না। তবে বাংলায় কুকুর, হিন্দিতে কুত্তা, ব্যাপার তো একই।

ঘোষালমশাই নিরামিষ খান। তিনি চান কুকুরকেও নিরামিষ খাওয়ানো উচিত। ডাল, ভাত, উচ্ছে, ট্যাঁড়শ সেদ্ধ খাওয়ানো উচিত। তিনি এখনও আমাদের সাধুর কাছে নিয়ে যাবেন বললেন, সেখানে কুকুর তো কুকুর, নেকড়ে বাঘ, হায়না সবাই কলা, শশা, বাতাসা খায়। আমার ওইরকম জায়গায় যাবার খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল উনি এসব বাজে কথা বলছেন। কিন্তু আমাদের কুকুরকে আমরা কী খাওয়াব সেটা নিয়ে ওঁর অত মাথা-ব্যথা কেন আমি বুঝতে পারছিলাম না।

মা ঘোষালমশাইকে চা দিলেন। ঘোষালমশাই চা খেতে-খেতে বললেন, "আমি নিজের চোখে একবার একটা বাঘকে চা খেতে দেখেছি।"

কাকু প্রচণ্ড জোরে হাসতে লাগলেন। আমারও হাসি পেয়েছিল।

ঘোষালমশাই বললেন, "হাসছ যে বড় পটল। কতটুকু দেখেছ জগতের ?

"পালামৌতে এক সাধুর আশ্রমে একটা বাঘ থাকত, সে সকালে চা খেত। সেই বাঘ মারা যাবার পর..." হঠাৎ ঘোষালমশাই আঁতকে উঠলেন। আমি ভাবলাম বুঝি বাঘের কথা বলতে বলতে একটা কিছু ভয়ানক ব্যাপার মনে পড়েছে তাঁর।

"হতচ্ছাড়া, কুত্তা," বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

যখন তিনি বাঘ-সিংহের শশা, কলা খাওয়ার কথা বলছিলেন, ঠিক তখনই তাঁরই পেছনে বসে তাঁর আনা প্রসাদের ঠোঙা থেকে আর্গোস খাচ্ছিল। কী প্রসাদ ছিল জানি না, কিন্তু বেশ কিছুটা বোঁদে ছিল। কারণ, ঘোষালমশাই চেঁচাতে লাগলেন, "সমস্ত বোঁদে খেয়ে ফেলেছে রাক্ষুসে কুত্তা।"

সত্যি-সত্যি ঠোঙাটার পাশে একটা কলা পড়ে আছে, আর্গোসের সেটা ভাল লাগেনি বোঝা যাচ্ছে। আর বোঁদে যে সমস্ত খেয়ে ফেলেছে সেটা বুঝতে পারলাম ঘোষালমশাইয়ের চিৎকার থেকে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ, আর্গোসের তো মিষ্টি খাওয়ার কথা নয়, গায়ের সব লোম উঠে যাবে। প্রসাদজেঠু বলে দিয়েছিলেন। অন্তত অসুখ করবে নিশ্চয়ই। ঘোষালমশাইয়ের চেঁচামেচিতে আর্গোস বুঝতে পেরেছে কাজটা ঠিক হয়নি। তাই খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘোষালমশাই বোঁদের শোক ভুলতে পারছেন না। চেঁচাতে লাগলেন, "কত বড় বড় কুত্তা দেখেছি। তোমাদের তো বলতে পারো নেড়িকুত্তা, তারা টেবিল-চেয়ারে বসে স্যুপ খায়, তাদের কী ম্যানার্স। কিছু মনে কোরো না পটল। কুকুর দিয়ে তাদের মনিবকে চেনা যায়। তোমাদের যে রকম ম্যানার্স, তোমাদের কুকুরেরও সেই ম্যানার্স হবে। এটা হতে বাধ্য।

মা তখনই ঘোষালমশাইয়ের কথাবার্তা খুব পছন্দ করেন না। আজ মা বললেন, "আপনার বোঁদে কুকুরে খেয়েছে কিন্তু তার জন্য আপনি আমাদের এমনভাবে কথা শোনাচ্ছেন কেন ? আমাদের দোষ স্বীকার করছি। আমাদের কুকুর টেবিল-চেয়ারে বসে স্যুপ খেতে শেখেনি জানি। কিন্তু আমরা কুকুরকে আপনার বোঁদে খেতে শিখিয়েও দিইনি।"

মা রাগের মাথায় একটা ছড়ি নিয়ে, "কোথায় গেল হতচ্ছাড়া," বলে ঘরে ঢুকে গেলেন আর কিছুক্ষণ পরে কিঁউ-কিঁউ শব্দ শুনলাম। বুঝলাম আর্গোসকে মা ছড়ি দিয়ে কয়েক ঘা দিয়েছেন।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। বোঁদে খাওয়াটা সত্যিই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ও তো ছেলেমানুষ, ওর তো বোঁদে খেতে ইচ্ছে করতেও পারে। তা নিয়ে অত হইচই করার কী দরকার ছিল ঘোষালমশাইয়ের। উনি অবশ্য ওইরকমের। কাকুও খুব চটে গেছেন ওঁর ওপরে। আসলে ঘোষালমশাই মধ্যে-মধ্যে খাপছাড়া কথা বলেন। কেউ-কেউ বলে, ওঁর মাথা খারাপ। মাকে রেগে যেতে দেখে উনি বললেন, "না না, বোঁদে খেতে শিখিয়ে দেবেন কেন আপনি। এ হল কুকুরদের স্বভাব। তাই বলছিলাম সাবধানে থাকবেন, কুকুর তো। বোঁদে খেলেই ওরা পাগল হয়ে যায়। এই দেখুন না, প্রিন্সিপালের কুকুর পাগল হয়ে মরেই গেল।"

ছোটদা বললে, "প্রিন্সিপালের কুকুর পাগল হয়ে···"

"বলছি কী তবে। পাগল হয়ে প্রথমেই প্রিন্সিপালকে কামড়ে দিয়েছে। তাই প্রিন্সিপাল ওকে ছোরা মেরে দিয়েছেন।"

আমি বললাম, "প্রিন্সিপাল কুকুরকে ছোরা মেরে দিয়েছেন, সে কী ?"

"হ্যাঁ, প্রিন্সিপালও যে পাগল হয়ে গেছেন। সাবধান, সাবধানে থেকো। বোঁদে খেয়েছে তোমাদের কুত্তা, ওটাও পাগল হয়ে যাবে।"

ঘোষালমশাই বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

আমি ভয়ে-ভয়ে মা'কে বললাম, "আর্গোস যদি পাগল হয়ে যায় !"

মা বললেন, "আর্গোস কী হবে জানি না। কিন্তু আমি পাগল হয়ে যাব।"

।। পাঁচ ।।

বিকেল বেলা আর্গোস মার খেয়েছিল। সন্ধেবেলা মা দুধ দিয়েছিলেন খেতে। আর্গোস রাগ করে খায়নি। আমি দু'-তিনবার ডাকলাম, "আর্গোস-খরগোশ।" একবার আমার দিকে শুধু মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু খাটের তলা থেকে বেরোল না। মা বললেন, "থাক শুয়ে খাটের তলায়। ওর আবার রাগ হয়েছে !"

সত্যি-সত্যি রাগ হয়েছে।

আমারও কেন জানি না রাত্রে খিদে পেল না। বাবা বকলেন, মা বকলেন। কিন্তু খিদে না পেলে কী করে খাই। আমি বললাম, "শরীর খারাপ তাই খেতে ইচ্ছে করছে না।"

কিন্তু কাকু মাকে বললেন, "ওই যে আর্গোস না খেয়ে শুয়ে আছে, ওর তাই খিদে নেই।"

মা কিছু বললেন না।

খাওয়ার পর আমি চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কিছুক্ষণ পরে মনে হল, একবার দেখে আসি, আর্গোস কী করছে। পা টিপে-টিপে বাইরে এলাম। আমাদের শোবার ঘরের সামনেই একটা সরু বারান্দা। দেখি সেখানে আর্গোস বসে আছে। আমাকে দেখেই কাছে এসে হাত চাটতে লাগল। আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললাম, "আর্গোস, তুই রাগ করেছিস ?"

আর্গোস ব্র-র-র-র এইরকম একটা শব্দ করল।

আমি বললাম, "মা তোকে মেরেছেন বলে খাসনি ? মা তো আমাদেরও অনেক সময় মারেন। খিদে পেয়েছে ? খাবি ?"

আমার যেন মনে হল আর্গোস বলছে, 'খুব খিদে পেয়েছে।'

আমি বললাম, "আয়, আমার পেছনে-পেছনে আয়।"

আমি খুব আস্তে-আস্তে রান্নাঘরে ঢুকলাম। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তারপর দেখলাম একটা জানালার ফাঁক দিয়ে একটু আলো আসছে। খুব আস্তে-আস্তে খুঁজে বার করলাম বিস্কুটের কৌটো। হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা বিস্কুট বার করলাম, "এই নে, বিস্কুট খেয়ে নে।"

আর্গোস কুট-কুট করে বিস্কুট খেতে শুরু করল।

বিস্কুট খাওয়া শেষ হতেই আমি বললাম, "জল খাবি ?"

আর্গোস উঠে দাঁড়াল। আমি অন্ধকারে একটা কোণে হাত দিতেই একটা থালা কি বাটি কি গ্লাস গড়িয়ে পড়ল, আর ঝন্-ঝন্-ঝন্ শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দাঁতে-দাঁত চেপে বসে রইলাম। সে শব্দ কি সহজে থামতে চায়। বুঝলাম বিপদ আসছে। আর্গোস যাতে না চেঁচায় সেজন্য ওর মুখটা চেপে ধরলাম। তারপর শুনলাম মার গলা, "কে ?"

আমি চুপ, মানে আমরা দু'জনেই চুপ। এবার শুনলাম খুট করে শব্দ হল, আলো জ্বলে উঠল। মা এগিয়ে আসছেন রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের আলো জ্বলল। আমরা দুটি চোর। আমার হাতে তখনও একটা বিস্কুট। আর্গোসের পায়ের সামনে বিস্কুটের টুকরো। মা আর্গোসের মুখের দিকে আর আমার মুখের দিকে তাকালেন। আর্গোস খুব নিরীহ-নিরীহ মুখ করে চলে যাবার চেষ্টা করছিল। মা বললেন, "দাঁড়াও।" আর্গোস দাঁড়িয়ে রইল। মা আস্তে-আস্তে দুধ ঢাললেন আর্গোসের বাটিতে। আর্গোসের সামনে বাটিটা রেখে দিলেন। আর্গোস চুকচুক করে দুধ খেয়ে নিল। দুধ খেয়েই যেমন ও লাফালাফি করে, তেমনই লাফালাফি করল মা'র পায়ের কাছে, শাড়িতে যেমন মুখ মোছে, তেমনই মুখ মোছার চেষ্টা করল। মা বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, এবার যাও।" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও, শুয়ে পড়ো।"

আমি শুতে চলে গেলাম। আর্গোস বুক ফুলিয়ে, আমার দিকে না তাকিয়ে মা'র পেছনে-পেছনে চলে গেল। আর্গোসের চোখগুলো কেমন সুন্দর টলটল করছিল দেখলে মায়া হয়।

।। ছয় ।।

বেশ কয়েক মাস পরে। একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলাম খসখস শব্দ। আমাদের বাড়ির পেছন দিকে একটা বড় নিমগাছ আছে। সেই গাছ থেকে যখন টিনের চালের ওপর পাতা ঝরে পড়ে তখন মনে হয় যেন বৃষ্টি পড়ছে। ভাবলাম বুঝি নিমপাতা

ঝরছে। চুপ করে শুয়ে থাকলাম। তারপর শব্দটা বাড়তে লাগল। বুঝলাম সত্যি-সত্যি বৃষ্টি হচ্ছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ মনে হল আর্গোস আমার হাত টানার চেষ্টা করছে। মুখ দিয়ে আমার কানের কাছে কিছু বলার চেষ্টা করছে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে আর্গোস, কী হয়েছে?"

আর্গোস এবার দু' পা তুলে খাটের ধারটা ধরে মুখ তুলে দাঁড়াল। মা ঘুমোচ্ছেন পাশে। বেশি শব্দ হলে জেগে উঠবেন। তাই বললাম, "আর্গোস, বিরক্ত করিস না।"

কিন্তু আর্গোস মা'র পায়ের কাছে গিয়ে মুখ দিয়ে ঠেলতে লাগল। আমি তখন উঠে পড়লাম। ঠিক সেই সময় একটা বিদ্যুৎ চমকাল, আর দেখতে পেলাম আকাশভর্তি ফ্যাকাসে মেঘ, আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কয়েক সেকেন্ড পরেই প্রচণ্ড মেঘের শব্দ। আর-একটা শব্দও যেন শুনলাম। কিন্তু সেটা বোধহয় আমার ভুল। আবার বিদ্যুৎ চমকাল। মনে হল নিমগাছের নীচে একটা যে ছোট ঘর আছে, আগে ওখানে একটা গ্যারাজ ছিল, এখন ওখানে যত রাজ্যের ভাঙাচোরা জিনিস ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। তার ওপর দিয়ে যেন একটা ছায়া-মতো কিছু সরে গেল। আমার ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। তারপর আবার বিদ্যুৎ চমকাল, দেখলাম কেউ কোথাও নেই, নিমের একটা লম্বা ডাল হাওয়ায় দুলছে। আর হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। আর্গোস জানালার ধারে দু' পা উঁচু করে জানালার বাইরে মুখ বাড়াবার চেষ্টা করছে। পাগল! ওর বোধহয় ওই বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ দেখে বেশ মজা লাগছে, তাই আমাদেরও ঘুম থেকে জাগাতে চাইছে।

আমি শুয়ে পড়লাম। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। ঘুমটা জমবে ভাল। কাল রবিবার, ইস্কুলে যেতে হবে না। আমিও দেরি করে উঠব। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আবার। এবার আর্গোসের চিৎকার শুরু হয়েছে—ভৌ ভৌ। মাও উঠে বসেছেন। বোধহয় দরজা খোলার একটা শব্দ হল। রাত্রে কে দরজা খুলছে। বাবা বাড়িতে নেই। জয়পুরে গেছেন কী কাজে। মা ডাকলেন, "ঠাকুরপো।" কাকু আবার ঘুম-কাতুরে। বৈঠকখানায় কাকু ঘুমোচ্ছিলেন, মা ঠেলা দিতেই উঠে পড়লেন। মা বললেন,, "দ্যাখো তো কে?"

গায়ের ওপর পাতলা চাদর টেনে ছোটদা বেশ আরামে ঘুমোচ্ছিল। আমি একটা ঠেলা মারতেই উঠে বসল, "কী চাস!" ঘুমের মধ্যে বলে উঠল, "নট-আউট।" ছোটদা আবার ঘুমোলেই ক্রিকেটের স্বপ্ন দ্যাখে।

আমি বললাম, "খেলা নয়, ওঠ। চোর এসেছে।"

ততক্ষণে আলো জ্বলে উঠেছে। ছোটদা উঠে বসেছে। আর কাকু একটা লাঠি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। রান্নাঘরের একটা দরজা আছে, সেই দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়, সেদিকটায় সেই ভাঙা গ্যারাজ আর নিমগাছ। আর্গোস চেঁচিয়ে চলেছে। ছোটকাকু আর আর্গোস যেই ঢুকেছে অমনি একটা লোক পেছনের সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। রান্নাঘরে ঢোকার দরজাটায় শিকল তোলা ছিল, তাই লোকটা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারেনি। আর আর্গোসও রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকতে পারেনি। তাই মাকে আর আমাকে জাগাবার চেষ্টা করছিল।

কিছুক্ষণ কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু ঝিরঝির করে বৃষ্টি আর টিনের চালের ওপর পুটপাট শব্দ। কিন্তু আর্গোস খালি মাটি শুঁকছে আর দৌড়ে পেছনের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু দরজাটা কেউ বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আমাদের শোবার ঘরের জানালা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দেখতে পেলাম সেই জানালা থেকে বেশ দূরে, রান্নাঘরের পেছনের দরজার পাশে কার্নিসের নীচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে বর্ষাতি। অন্ধকারের মধ্যে মিশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, "ওই যে চোর, চোর।"

এমন সময় দেখি কি টিনের চালের ওপর আর-একটা লোক লাফিয়ে পড়ল ঝুপ করে। আর আমাদের রান্নাঘরের পাশের লোকটা, তার কাঁধে একটা বড় ঝোলা, দৌড়ে পালাতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কাকু রান্নাঘরের পেছনের দরজাটা খুব জোরে টানতেই হঠাৎ খুলে গেছে। আর্গোস সঙ্গে-সঙ্গে এক লাফে বাইরে।

বৃষ্টির মধ্যে সেই লোকটার, মানে চোরটার, ঝোলাসুদ্ধু, চালের ওপর উঠতে গিয়ে একটু পা পিছলে গেছে। টাল সামলে নিয়ে সে যখন চালের ওপর উঠতে যাবে, তখন আর্গোস গিয়ে লাফিয়ে কামড়ে ধরেছে তার প্যান্ট। লোকটা ওই টিনের চাল থেকে লাফ দিয়ে চলে যাবে সামনের গলিতে। সেখান থেকে পাঁচিল পেরোলেই কলেজের মাঠ। ঠিক পালিয়ে যেত। ওর সঙ্গে আর-একটা লোক ছিল, সে তো পালিয়েই গেছে। এই লোকটা আর্গোসের মুখে অন্য পা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল। আর্গোস ছিটকে পড়ল দূরে। আর লোকটা এবার টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। আর্গোস আবার লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। লোকটা ততক্ষণে টিনের চালের ওপর উঠে পড়েছে। অত উঁচুতে আর্গোসের পক্ষে লাফিয়ে ওঠা তো সম্ভব নয়। কিন্তু আর্গোস লাফিয়ে উঠে কামড়ে ধরেছে তার কাঁধ থেকে ঝুলে-থাকা ব্যাগ। বাইরে বেশ অন্ধকার। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দেখতে পেলাম টিনের চালের ওপর একটা লোক, তার কাঁধ থেকে ঝুলছে ব্যাগ, আর সেই ব্যাগ ধরে ঝুলছে আর্গোস।

ইতিমধ্যে আমাদের চেঁচামেচিতে পাশের বাড়ির কারও কারও ঘুম ভেঙে গেছে। কয়েকটা বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। ভাটনগর-সাহেব দৌড়ে এসেছেন। তিনিও বাইরে বেরিয়ে চোর ধরতে গেছেন। সঙ্গে ছোটকাকু তাঁর হাতের লাঠিটা টিনের চালের ওপর ছুঁড়ে মারবেন ভাবছেন বোধ হয়। রকমসকম দেখে চোরটা ঝোলা ব্যাগটা ফেলে দিয়ে লাফ মারল চাল থেকে পাশের গলিতে। ব্যাগসুদ্ধু আর্গোস পড়ল মাটির ওপর, সেখানে অবশ্য একটু ঘাস ছিল, আর বৃষ্টির জল জমে ছোট্ট একটা ডোবা হয়ে গেছে। জল ছিটকে পড়ল চারদিকে। চোর পালাল।

কাকু তখন চোরের পেছনে ছুটতে চান। কোনওরকমে টিনের চালের ওপর উঠে পড়লেন। কিন্তু নীচে ছিল চোরদের মোটর সাইকেল। কাকুর চালে ওঠার আগেই মোটর সাইকেলে চেপে দুই চোরাই হাওয়া।

আর্গোস আর উঠছেই না। উঠবে কী করে। জলের মধ্যে পড়েছে। ওর গায়ের ওপর অতবড় একটা ব্যাগ। ভাটনগর-সাহেব গিয়ে ব্যাগটা তুললেন। ছোটদা আর আমি আর্গোসকে ধরে আনলাম। আর্গোস ঘরের মধ্যে ঢুকে গা ঝাড়তে লাগল। মা তাড়াতাড়ি একটা গামছা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আর্গোসের গা মুছে দিলেন। কিন্তু আর্গোসের ততক্ষণে বেশ ঠাণ্ডা লেগেছে। আমি একটা ওষুধ জলে গুলে খাইয়ে দিলাম।

এদিকে দেখি ঘরের মধ্যে আরও লোকজন এসে পড়েছে। আমাদের পাড়ায় থাকেন এক বুড়ো ভদ্রলোক। তিনি রাত সাড়ে চারটের সময় বেড়াতে বেরোন। দিল্লি ইউনিভার্সিটির পাশে একটা পাহাড়ি জায়গা আছে। যেখানে ময়ূর আছে, বাঁদর আছে। ভোরবেলা অনেক লোক সেখানে বেড়াতে যায়। ব্যায়াম করে। এই বুড়ো ভদ্রলোক রোজ ভোর রাতে গান গাইতে গাইতে বেড়াতে বেরোন। উনি সাধারণত রাত্রে ঘুমোন না, দিনের বেলা সারাদিন খাটিয়াতে বসে-বসে ঝিমোন। উনি আমাদের বাড়ির হইচই শুনে এসে পড়েছেন

ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ক্যামেরা
Snapper
Snapper 35
SPECIAL LENS
Snapper 300
Snapper 300F
Snapper 110E
স্ন্যাপার আপনার পয়সার পুরোপুরি মূল্য উসুল করে। মডেলের বিরাট শ্রেণী—আর, এমন একেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় এ, যার দরুণ এক অতুলনীয় ক্যামেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যেই তো অন্য যে কোনো ক্যামেরার তুলনায়, স্ন্যাপার অনেক বেশী লোকেদের হাসিমুখের দেয় পরিচয়।
Snapper ক্যামেরা
হাসিমুখের দেয় পরিচয়!
আগফা গেভার্ট ইণ্ডিয়া কর্তৃক মার্কেট করা হয়েছে।
ULKA-11402 BEN

আর 'ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ ভজ মূঢ়মতে' গান গাইছেন। সেই সময় হুড়মুড় করে ঢুকলেন সেই ঘোষালমশাই, আর্গোস যাঁর বোঁদে খেয়ে ফেলেছিল একদিন।

কাকু তখন পুলিশে খবর দিতে যাবেন কি যাবেন না এই নিয়ে মার সঙ্গে আলোচনা করছেন। আর্গোস খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে গেল ঘোষালমশাইয়ের দিকে। ছোটদা চট করে আর্গোসকে ধরে টেনে নিয়ে গেল। ঘোষালমশাই বললেন, "পটল, চোর কি পালিয়েছে ?"

কাকু বললেন, "আপনি কি ভেবেছেন চোর এখানে বসে চা খাচ্ছে, না, আমাদের বিছানায় কম্বল গায় ঘুমোচ্ছে ?"

ঘোষালমশাই বললেন, "মজা কোরো না পটল। জানো, আমাদের বাড়ি চোর ঢুকেছিল !" বলেই তিনি ডাকলেন, "বালু, ইধার আও।"

বালু হল ঘোষালমশাইয়ের কাজের লোক। অন্ধ্রপ্রদেশের ছেলে, পনেরো-ষোলো বছর বয়স। দিল্লিতে অল্পদিন এসেছে। এখনও ভাল করে হিন্দি বলতে পারে না।

ঘোষালমশাই বললেন, "বালু ভোর রাতে উঠেছিল। বৃষ্টি হচ্ছে দেখে জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে কি, বাইরের ঘরের দরজা খোলা। তারপর দেখেছে অটোমেটিক লকটা ভাঙা। পুরো জায়গাটাই অ্যাসিড-ফ্যাসিড দিয়ে জ্বালিয়ে, দরজা ভেঙে কেউ ঢুকেছিল। ও চিৎকার করে উঠতেই আমার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভেঙেই গিয়েছিল, আমি বিছানায় বসে-বসে উপনিষদ আবৃত্তি করছিলাম। আমার স্ত্রী আবার···"

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে ভাটনগর-সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "চোর নিয়েছে কিছু ?"

ঘোষালমশাই বললেন, "সর্বস্ব, সর্বস্ব।"

কাকু বললেন, "সর্বস্ব ? যথা···"

ঘোষালমশাই বললেন, "একটা ভি সি আর, বসার ঘরেই ছিল, ছোট জাপানি টেপরেকর্ডার—শোবার ঘরে ঢুকে কয়েকটা জামা-প্যান্ট, কোট, আর কী-কী গেছে জানি না, তবে আমার একটা বাঘের ছাল···"

ছোটদা বললে, "সেই বাঘ, যেটা আপনি শিকার করেছিলেন ?"

ভজ গোবিন্দম্ গান-গাওয়া বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "আপনি বাঘ শিকার করেন নাকি ?"

ঘোষালমশাই আমতা-আমতা করে বললেন, "সেসব কথা পরে হবে। আসল কথা হল, বালু দেখেছে, মোটর সাইকেলে দুটো লোক, তোমাদের বাড়িতে ঢুকেছে··· ।"

কাকু বললেন, "বালু দেখেছে ? কখন দেখেছে ? তা হলে এতক্ষণ বলেনি কেন ?"

ঘোষাল বললেন, "সে ঘণ্টাখানেক আগে। কিন্তু আমরা ভয়ে বেরোইনি, যদি ছোরা-টোরা মেরে দেয়। তাই বিছানাতেই··· ।"

"বসে-বসে উপনিষদ আবৃত্তি করছিলেন ?" কাকু বলে উঠলেন। "তা এখন এই খবর দিতে এসেছেন যে চোর আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে ?"

ঘোষালমশাই বললেন, "না, না, আপনাদের বাড়িতে আলো দেখলাম, চেঁচামেচি শুনলাম, আর ওই কুত্তাটার ভৌ ভৌ শুনে ভাবলাম যে পুলিশে খবর দেবার আগে তোমাকে বলে যাই।"

ভজগোবিন্দম গান-গাওয়া বুড়ো ভদ্রলোক এর মধ্যে আমাদের চেয়ারে বসে ঢুলছেন। হঠাৎ পুলিশের কথা শুনে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন, "পুলিশ এসে গেছে ?"

ভাটনগর বললেন, "কোথায় পুলিশ। পটলবাবু, তোমাদের কী-কী চুরি হল, তার লিস্ট করে ফ্যালো দিকি। পুলিশে বলতে হবে তো।"

আমাদের রান্নাঘরের দরজা দিয়ে চোর ঢুকেছিল। একজন ভেতরে, অন্যজন বাইরে। একজন জিনিসপত্র দেখে অন্যের হাতে তুলে দেবে, এই ছিল প্ল্যান। কিন্তু কিছু চুরি করার আগেই আর্গোস আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে।"

হঠাৎ ভাটনগর বললেন, "আচ্ছা, পটল, ওই ব্যাগের মধ্যে কী আছে দ্যাখো। ওটা তো চোর ফেলে গেছে !"

ছোটদা আর কাকু মিলে ব্যাগটা খুলে ফেললে। প্রথমেই বেরিয়ে এল কয়েকটা শার্ট আর একটা প্যান্ট। ঘোষালমশাই ঝুঁকে পড়লেন, "আরে, আরে, ওই তো, ওই তো আমার শার্ট। কানাডা থেকে আমার শ্যালক এনেছিল। টেরিলিন শার্ট। মেড ইন তাইওয়ান।"

কাকু এবার টেনে বার করলেন একটা ক্যামেরা আর একটা ভি সি আর। ঘোষালমশাই কেঁদে উঠলেন, "আমার, আমার। বালু, যাও তুমহারা মাতাজিকো বুলাও।"

বালু বুঝতে না পেরে বলল, "মেরি মাতাজি তো স্বর্গ চলী গয়ী।"

ঘোষালমশাই ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, "তুমহারা মাতাজি স্বর্গ কি নরক কাঁহা গিয়া ওহ্ হাম নেহি জানতা, তুমি মেরা—বিবিজি কো বুলাও। বোলো কি, ভি সি আর মিল গয়া।"

কাকু বললেন, "কিন্তু এসব জিনিসপত্র যে আপনার তার প্রমাণ কী ?"

ঘোষালমশাই বললেন, "ক্যা ! প্রমাণ। মেরা জিনিস তার প্রমাণ কী। পটল, তুমি কি বলবে যে আমি যে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল তার প্রমাণ কী ? ভেবেছ কী হে ?"

ঘোষালমশাইয়ের মেজাজ দেখে আর্গোস চেঁচিয়ে উঠল। তার লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। কাকুর সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে দেখে আর্গোস কাকুর পাশে এসে দাঁড়াল।

ঘোষালমশাই বলে উঠলেন, "শাট আপ, ইউ কুত্তা।"

আর্গোস আর-একবার শরীরটা ঝাড়া দিল।

ছোটদা বলল, "আর্গোসই তো এইসব জিনিসপত্র উদ্ধার করল।"

ঘোষালমশাই বললেন, "অ্যাঁ ?"

কাকু বললেন, "অ্যাঁ অ্যাঁ কী করছেন ?"

ইতিমধ্যে ঘোষালমশাইয়ের স্ত্রী খুব থলথলে মোটা হাতে শাঁখ নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকেই বললেন, "ভি সি আর পেয়েছ ?"

ঘোষালমশাই বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু পটল দিচ্ছে না। বলছে প্রমাণ দিতে হবে। ওরা পুলিশে দেবে বোধহয়।"

ঘোষালমশাইয়ের স্ত্রী বললেন, "বালু, শাঁখটা ধর তো।"

বালু এসে শাঁখটা ধরল।

"ডাকো তোমার মাকে। আর ওই হাড়জ্বালানো কুত্তাকে এখান থেকে সরাও।"

মা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন, "ঠাকুরপো, ওঁদের জিনিস ওঁদের দিয়ে দাও। ওই হাড়জ্বালানো কুত্তাই যে ওদের জিনিসগুলো উদ্ধার করেছে সেই কথাটা যেন ওঁদের মনে থাকে। ওঁদের যেতে বলো।"

ঘোষালমশাইয়ের স্ত্রী বললেন, "আমার মামাতো-ভাই বম্বেতে পুলিশে কাজ করে, তাকে খবর দেব···"

ভাটনগর-সাহেব বললেন, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, দিল্লির চোর বোম্বের পুলিশের ভয়ে আপনার জিনিস চুরি করে সেনগুপ্তর বাড়িতে রেখে গেছে। চোর আপনাদের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলতে এসেছিল।"

ঘোষালমশাইয়ের স্ত্রী বললেন, "আমার সঙ্গে রসিকতা করবেন না। বালু, উঠাও, সামান।"

কাকু ব্যাগটা সামনে ঠেলে দিয়ে বললেন, "দেখে নিন, এর মধ্যে আর কী আছে।"

ঘোষালমশাইয়ের স্ত্রী বসে পড়ে ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করলেন, আস্তে-আস্তে, আস্তে-আস্তে—একটি বড় দাড়ি। আর-একটা বিরাট পরচুলা।

কাকু বললেন, "এ দাড়িটাও বোধহয় আপনার। নিয়ে যান। দুটোই আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন।"

ঘোষালমশাই হেঁ-হেঁ করতে লাগলেন, "না-না, ওসব জিনিস চোরদের। আমাদের হল এই ভি সি আর, ক্যামেরা আর ওই শার্ট-প্যান্ট। না-না, তোমাদের কুত্তাটা খুবই ভাল। গুড ডগ।"

আর্গোস প্রচণ্ড জোরে হেঁচে উঠল।

ঘোষালগিন্নি বললেন, "আ মোলো যা, এ যে আমাদের মানুষের মতো হাঁচে!"

ভজগোবিন্দম গানগাওয়া বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "ওকে একটু আদা-চা খাইয়ে দাও। হ্যাঁ, পুলিশ-ফুলিশের হাঙ্গামায় যেও না। নিয়ে যেতে দাও ওর জিনিস।"

কাকু বললেন, "এই ব্যাগটাও নিয়ে যান। ব্যাগটা তো চোরের। ওরা হয়তো ব্যাগটা নিতে আসবে। তখন আপনি দাড়ি পরে আর আপনি পরচুলাটা পরে ওদের সঙ্গে ফোটো তুলে রাখবেন।"

ঘোষালগিন্নি বললেন, "ঢের হয়েছে, বড়দের সঙ্গে মজা করতে হবে না।"

ঘোষালমশাই হঠাৎ এগিয়ে এসে আর্গোসের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

আর্গোস একবার ভৌ করে উঠল।

ঘোষালমশাই বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, লা কুত্তো।"

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফ্রেঞ্চ ভাষায় কুত্তাকে বলে লা কুত্তো।"

মা ডাকলেন, "আয়, আর্গোস।"

আর্গোস গুটি-গুটি চলে গেল। ঘোষালমশাই বললেন, "না, তোমাদের কুত্তাটা ম্যানার্স শিখছে দেখছি। ওকে একদিন ভাল করে বোঁদে খাওয়াব।"

ঘোষালমশাই ব্যাগের মধ্যে সব জিনিস ভর্তি করে ডাকলেন, "বালু। সামান উঠাও।"

॥ সাত ॥

সকাল পৌনে আটটায় আমার ইস্কুলের বাস আসে। আমি ঠিক সাতটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে বাংলো রোডের মোড়ে অশ্বত্থগাছের নীচে দাঁড়াই। আমাদের বাসের ড্রাইভার সর্দার সুজন সিং। সাদা দাড়ি। হাতের কবজি ইয়া বড়। মাথায় লাল পাগড়ি। খুব আমুদে লোক। আমাকে খুব ভালবাসে। আমাকে একবার গুরুদাসপুরে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে বলেছে। আমার যদি কোনওদিন দেরি হয়ে যায় সর্দারজি আমার জন্য অপেক্ষা করে।

আজ আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। যখন ইস্কুলে যাই তখন মা দরজা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। আগে আমাকে অশ্বত্থতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন। এখন তো আমি বড় হয়ে গেছি। তাই একা-একা যাই। আজ আমি যেই বেরিয়েছি, আর্গোসও কোন ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছে। ওর আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু গাড়িঘোড়া দেখা চাই। একদিন কেলেঙ্কারি করবেই।

অশ্বত্থতলায় পৌঁছে দেখি বাস আসছে। এখান থেকে আমরা তিনটি মেয়ে বাসে উঠি। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু মমতা। আর রুচি

আকাশে ওড়ার কথা □ সতেরো

১৯০৯ : ব্লেরিও - ১১

লুই ব্লেরিওর প্রথম বিমানে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া ১৯০৯-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্লেরিও তাঁর নিজের তৈরি ব্লেরিও-১১ মনোপ্লেনে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরের কাছে লা ব্যারাক থেকে আকাশে উড়লেন ২৫ জুলাই ভোর ৪টা ৪১ মিনিটে। এই ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য তাঁর বিমান ছিল একেবারে অনুপযুক্ত, এঞ্জিনও ছিল কমজোরি। ২০ মাইল একটানা বিমানযাত্রায় ছিল যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি। মাঝপথে একবার এঞ্জিন বেশি গরম হয়ে গিয়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৃষ্টি এসে এঞ্জিন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ব্লেরিও নির্বিঘ্নে চ্যানেল পার হয়ে ভোর ৫টা ১৭ মিনিটে ইংল্যান্ডের ডোভার দুর্গের কাছে মাঠে নেমে এসে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। সমসাময়িক বৈমানিকরা বলেন, ব্লেরিও ছাড়া আর কেউ এই ধরনের হালকা বিমান ও কমজোরি এঞ্জিন নিয়ে চ্যানেল পার হওয়ার মতো বিপদসঙ্কুল অভিযান কল্পনাই করতে পারতেন না।

ব্লেরিওর এই অভিযানে ইংল্যান্ডে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। এক, ইংরেজদের আগে ফরাসিরা চ্যানেল পার হল। দুই, ইংল্যান্ড তার বিখ্যাত নৌবাহিনীর জন্য নিজেদের সুরক্ষিত মনে করত, এখন দেখা গেল আকাশপথেও তার বিপদ আসতে পারে।

ব্লেরিওর সফল অভিযানের দু'দিন পর ল্যাথাম আবার চেষ্টা করলেন চ্যানেল পার হওয়ার, কিন্তু এবারও সফল হতে পারলেন না। ইংল্যান্ডের মাত্র ১ মাইল আগে তাঁর বিমানের এঞ্জিন বিকল হয়ে গেল।

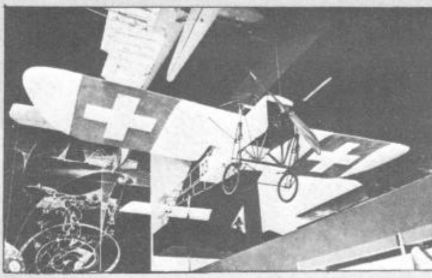

ব্লেরিও-১১ বিমান

ব্লেরিও-১১ বিমানের বিশদ বিবরণ :

নির্মাতা : লুই ব্লেরিও

লম্বায় : ২৬ ফুট বা ৮ মিটার,

ডানার আয়তন : ২৫ ফুট বা ৭.৮ মিটার

খালি অবস্থার ওজন : ৪৬০ পাউন্ড বা ২১০ কেজি

যাত্রী-সংখ্যা : একজন বৈমানিক

গতিবেগ : ঘণ্টায় ৩৬ মাইল বা ৫৮ কিমি

এঞ্জিন : একটি ২৫ অশ্বশক্তির অ্যানজানি

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুটিয়ানি। মমতা আগে ওঠে বাসে, ও একেবারে রোগা টিঙটিঙে। ও যদি পড়ে যায়, সেইজন্য আমি পেছনে থাকি। কিন্তু রুচি আমাকে ঠেলেঠুলে আগে উঠে যায়। ওর হাত দুটো লোহার মতো শক্ত। মমতা সবে বাসে উঠেছে, আমি উঠব-উঠব করছি। এমন সময় আর্গোসের ভৌ ভৌ। ও আমার পেছন-পেছন দৌড়তে-দৌড়তে এসেছে। ওর পেছনে রাস্তার তিন-চারটে কুকুর তাড়া করেছে। কী যে করি! বাস ছেড়ে দেবে, এখন আর আর্গোসকে ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসার সময় নেই। আর ওকে একলা ফেলে যাই কী করে। ওকে যে অন্যরা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে, কিংবা রাস্তায় ট্যাকসি বা বাসে চাপা পড়বে। কী জ্বালাতন, সত্যি! ভাববার সময় কোথায়? ভাবছি সর্দারজিকে বলব কি না!

বলব কী, বলার আগেই লাফিয়ে আর্গোস বাসে উঠে গেল। আমি জানালার ধারের সিটে বসি। আর্গোস একেবারে জানালার ধারের সেই সিটে গিয়ে বসে পড়ল। কী কাণ্ড!

রুচি দেখতে পেয়ে বলে উঠল, "অ্যাই সুজাতা, আমার ভাল নাম সুজাতা," বলে দেব মিসকে। মেরেছে।"

আমাদের ইতিহাস পড়ান যিনি, তিনি পরের স্টপ থেকে বাসে ওঠেন। তিনি এমনই ভাল মানুষ, কিন্তু রেগে গেলে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। খাতায় লাল পেন্সিল দিয়ে কেটেকুটে দশের মধ্যে দুই বসিয়ে দেন। কুকুর দেখলে নিশ্চয়ই খেপে যাবেন।

পরের স্টপে বাস থামার আগেই দেখি আর্গোস আমার পাশ থেকে নেমে পড়ল। আমি আর্গোসের দিকে খেয়াল রাখব, না মিসের দিকে। মিস তাঁর নীল ছাতাটা বন্ধ করে আস্তে-আস্তে উঠে পেছন দিকে বসবেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে রুচিটা বলবে। তখন কী বলব আমি সেইসব ভাবছি। কিন্তু রুচি তার আগেই বলছে, "সর্দারজি, সর্দারজি, দ্যাখো সুজাতা কুকুর নিয়ে উঠেছে বাসে। যদি কাউকে কামড়ে দেয়?"

সর্দারজি মুখ না ঘুরিয়ে বলল, "কুত্তা, কোনসা কুত্তা?"

আমি দেখি আর্গোস কোথাও নেই। মমতা আর্গোসকে খুব ভালবাসে। ওই বোধহয় পায়ের কাছে লুকিয়ে রেখেছে।

রুচি বলছে, "ওই তো মমতার পায়ের কাছে।"

আমি বললাম, "রুচি, আজ তোকে আমি ভাল কেক খাওয়াব। কাল ঘুগনি খাওয়াব। প্লিজ।"

রুচি বলল, "আমি তোর কেক চাই না। আজ আমি তোকে এমন শিক্ষা দেব দেখবি।"

সর্দারজি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বেটি, তেরা কুত্তা?"

আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম, "হ্যাঁ সর্দারজি। ও হঠাৎ উঠে এসেছে ভয়ের চোটে, কী করব?"

মমতাও বলল, "সত্যি সর্দারজি। ওকে বড় কুকুর তাড়া করেছিল..."

এর মধ্যে বাসটা থেমে গেল। সর্দারজি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল আর বলল, "কোঈ বাত নেই।"

মিস দাঁড়িয়েছিলেন নীল ছাতা মাথায়। তিনি আস্তে-আস্তে বাসে উঠলেন। অন্য কয়েকটি মেয়েও উঠল। বাস ছেড়েছে-কি-ছাড়েনি রুচি, কী হিংসুটে, বলে উঠল, "মিস, কুকুর, কুকুর আছে বাসের মধ্যে। আমাকে আঁচড়ে দিয়েছে। আপনাকে কামড়ে দেবে।"

মিস চমকে উঠলেন, "ডগ্, ইউ মিন, ম্যাড ডগ?"

রুচি বলল, "সুজাতার কুকুর।"

আমি বলার চেষ্টা করলাম, "হয়েছে কী, মানে।"

মিস বললেন, "শাট্ আপ। কোথায় কুকুর? কোথায়? দিস ইজ ভেরি ব্যা-ড্। বাসের মধ্যে—নো-নো। কোথায়?"

রুচি বললে, "ওই যে মমতা কৃষ্ণ লুকিয়ে রেখেছে। মমতার পুরো নাম মমতা কৃষ্ণ, রুচি আবার ওকে মমতা কৃষ্ণ বলে। আমি মমতার পায়ের দিকে তাকালাম, না, আর্গোস তো নেই। অন্য মেয়েরা বলল, "হ্যাঁ, একটা ছোট কুকুর উঠেছিল বটে, কিন্তু দেখছি না তো? সর্দারজি, কোথায় গেল, কুত্তাটা?"

সর্দারজি বলল, "ঢুঁড়ো-ঢুঁড়ো। জায়গা কাঁহা।"

রুচি প্রত্যেকটা সিটের তলায় উঁকি মেরে দেখল। কী আশ্চর্য আর্গোস কোথায়? তা হলে বাস যখন থেমেছিল তখন আর্গোস নেমে গেছে? হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে মিস উঠলেই ঝামেলা, তাই—কিন্তু, ওখান থেকে ও কি রাস্তা চিনে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে? বাড়ি অবশ্য দূর নয়, রাস্তাও সোজা। কিন্তু আমার তো চিন্তা হতে লাগল।

প্রতিমা বলল, "রুচি শুধু-শুধু সুজাতার নামে লাগাচ্ছিস কেন? কোনও কুকুর নেই এখানে।"

প্রতিমা খুব ভাল মেয়ে। ওকেই আজ কেক খাওয়াব।

রুচি ভেংচি কেটে বলল, "শুধু শুধু। তোর চোখ নেই—একটু আগেই জানালার ধারে বসে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিল কুকুরটা। আমি জানালার ধারে বসতে চাইলে দেয় না, আর কুকুরকে বসতে দিল।"

মিস এবার রেগে উঠলেন, "রুচি, মিথ্যে কথা বোলো না। কুকুর তো কর্পূর নয় যে উবে যাবে! কুকুর কি গ্যাস বেলুন যে উড়ে যাবে? চুপ করে বোসো।" বলে মিস একটা বই খুলে বসলেন।

রুচি বলল, "নিশ্চয়ই ম্যাজিক।"

মিস রেগে বললেন, "হোয়াট?"

রুচি বলল, "হ্যাঁ মিস, সুজাতার ভাই ভাল ম্যাজিক জানে। সুজাতা বোধহয়..."

ছোটদা সত্যি ভাল ম্যাজিক দেখায়। একদিন আমাদের দেখিয়েছিল, হাতের সব তাস উবে গেল। কিন্তু আমি তো ম্যাজিক-ফ্যাজিক জানি না।

মিস বললেন, "ডোনট বি সিলি! তোমরা আজকাল বড্ড ঝগড়া করছ।"

এর পর আর কোনও ঝামেলা হল না। কিন্তু আমি আর মমতা দু'জনেই খুব ভয় পেয়ে গেছি। ত্রিশ হাজারির কাছে আমাদের স্কুলের সামনে বাস এসে থামল। অন্যদিন আমি সকলের আগে নামার চেষ্টা করি। আজ সকলের শেষে নামলাম। যদি আর্গোস কোথাও লুকিয়ে থাকে। যখন নামছি, হঠাৎ সর্দারজি ডাকল, "বিটিয়া।"

আমি পেছন ফিরে দেখি সর্দারজির বিশাল খোলা কুর্তার নীচে আর্গোস বসে আছে। আর সর্দার মুচকি-মুচকি হাসছে।

ইস্কুলের গেট দিয়ে দল বেঁধে মেয়েরা যাচ্ছে। আমাদের মিসও ঢুকছেন। হঠাৎ সর্দারজির কোল থেকে লাফিয়ে আর্গোস সেই মেয়েদের ভিড়ে ঢুকে পড়ল। মেয়েরা "অ্যাই-অ্যাই-কুকুর, কোথা থেকে এল, সরে আয়, সরে আয়, ন-না, কামড়াবে না।" এইরকম নানা কথা বলতে বলতে এলোমেলো ভাবে দৌড়তে লাগল। মিসের হাত থেকে ঝুলন্ত ব্যাগটার তলা দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল আর্গোস ইস্কুলের মাঠের মধ্যে। ভোরের রোদ্দুরে মনে হল যেন একটা সাদা বক উড়ে গেল মাটির ওপর দিয়ে। এক ঝলকের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে!

রুচি চেঁচিয়ে উঠল, "মিস। ওই যে..."

মমতা রুচির কানের কাছে গিয়ে বলল, "ম্যাজিক!"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মনঃসংযোগের পরীক্ষা

কী কী জিনিস লাগবে

১· একটা টর্চের বাল্ব এবং হোলডার।
২· ১৬ সেন্টিমিটার মাপের তিন টুকরো ইলেকট্রিক তার।
৩· একটা ১·৫ ভোল্টের টর্চের ব্যাটারি।
৪· ফুলের তোড়া বাঁধার জন্য যে সরু তার ব্যবহার করা হয়, সেই তার একটা ৪৫ সেন্টিমিটার এবং একটা ১০ সেন্টিমিটার।
৫· একটা খালি জুতোর বাক্স বা এই ধরনের কোনও লম্বা পিস্‌বোর্ডের বাক্স।

২

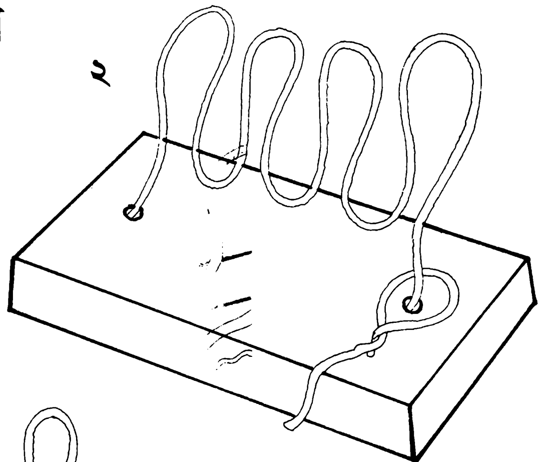

১

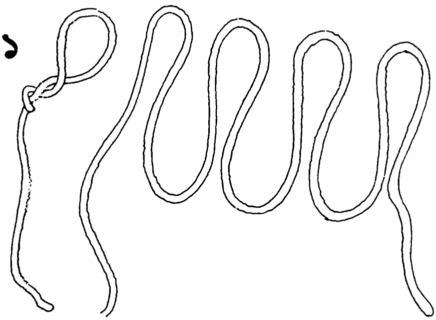

দুই ॥
বাক্সের ঢাকনার উপরের দিকটায় দুটো ফুটো করে ঢেউ খেলানো তারটা বসাও। ছবিটা দেখলে বুঝতে সুবিধে হবে।

এক ॥
১০ সেন্টিমিটারের সরু তারটার একটা মাথায় একটা ফাঁস তৈরি করো। ৪৫ সেন্টিমিটার মাপের তারটি ছবিতে যেভাবে দেখানো আছে সেই ভাবে ঢেউ খেলিয়ে বাঁকিয়ে নাও।

৩

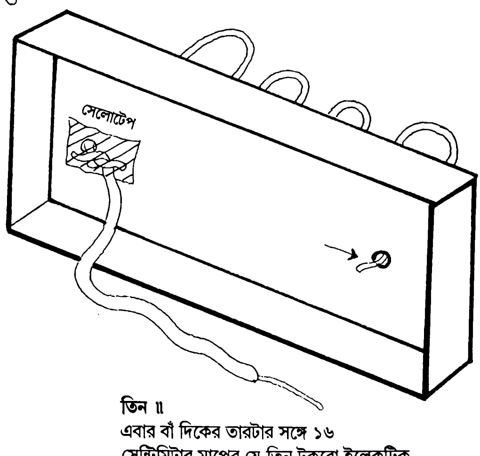

> **বিশেষ সতর্কতা**
>
> এই খেলায় টর্চের ব্যাটারি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা চলবে না। ইলেকট্রিক মেইন-এর সঙ্গে কোনওরকম সংযোগসাধন নিষিদ্ধ। এই নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

তিন ॥
এবার বাঁ দিকের তারটার সঙ্গে ১৬ সেন্টিমিটার মাপের যে-তিন টুকরো ইলেকট্রিক তার আছে, সেখান থেকে একটা তার নিয়ে জুড়ে, সেলোটেপ দিয়ে বোর্ডের সঙ্গে ভালভাবে লাগিয়ে নাও।

৫

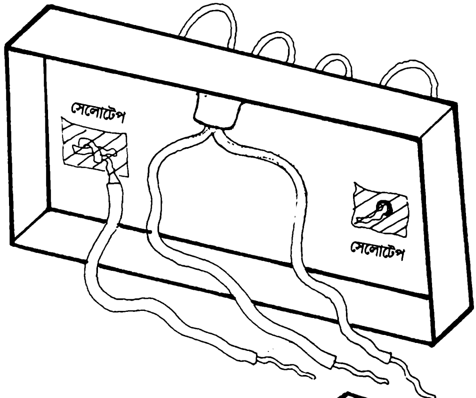

পাঁচ ॥
এবার সেই বাল্বসমেত হোলডারটা বাক্সের ঢাকনার একপাশে ফুটো করে সেলোটেপ দিয়ে এমনভাবে বসিয়ে নাও, যাতে বাল্বটা উপরের দিকে থাকে। ছবিটা ভালভাবে লক্ষ করো। হোল্ডারের থেকে একটা তার ঢাকনার এক পাশে ফুটো করে বার করে নাও।

৪

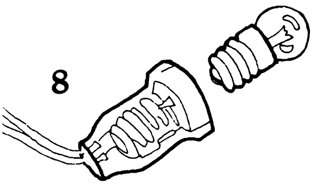

চার ॥
বাল্ব হোলডারের সঙ্গে অন্য যে দুটো ১৬ সেন্টিমিটার মাপের ইলেকট্রিক তার আছে সে দুটি জুড়ে ফ্যালো।

৬

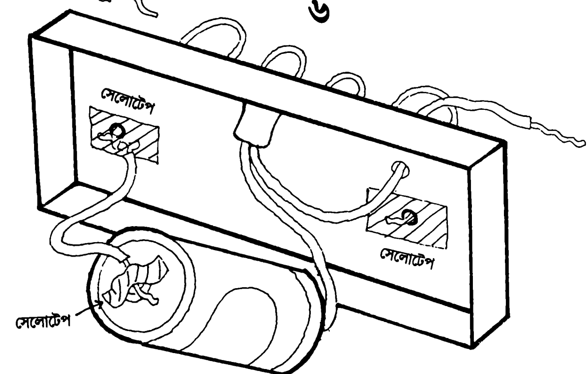

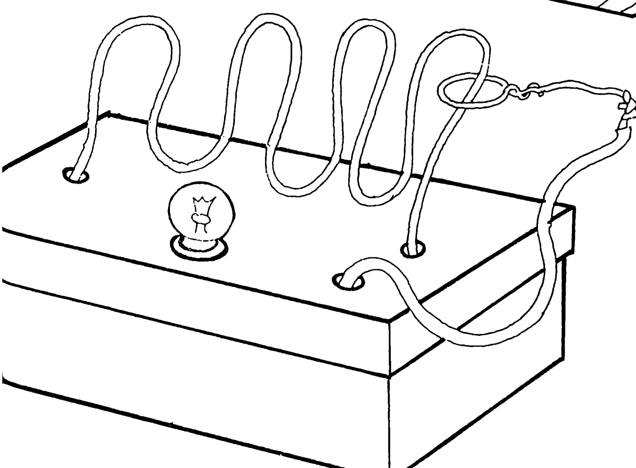

ছয় ॥
এবার তিন নম্বর ছবিতে যে ১৬ সেন্টিমিটারের তারটা আছে সেটা এবার ব্যাটারির আর একদিকে লাগিয়ে নাও। ব্যাটারিটা বাক্সের মধ্যে রেখে বাক্সের ঢাকনাটা এবার বন্ধ করে দাও। হোলডারের থেকে যে তারটা ফুটো করে ঢাকনার উপরের দিকে নেওয়া হয়েছিল সেটার সঙ্গে ফাঁস দেওয়া তারটা জুড়ে নাও।
এবার তোমার বন্ধুদের বলো, ওই ফাঁস দেওয়া তারটা ঢেউ খেলানো তারটার মাঝখান দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। খেলাটা খুব কঠিন। হাত কেঁপে গেলেই আর হবে না। তখন ঢেউ খেলানো তারের সঙ্গে ফাঁসের তার ছোঁয়া লেগে আলো জ্বলে উঠবে। দ্যাখো শেষ পর্যন্ত তোমার কোনও বন্ধু নিয়ে যেতে পারে কি না।

মনঃসংযোগ পরীক্ষার বাক্স এবার তৈরি

প্রশান্ত সেন

কাঁথি হাই স্কুল

১৮৫৭ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা ওই বছরেই। আবার, ওই বছরেই স্থাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এইসব সুবৃহৎ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কলকাতার অদূরে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় খুব নিঃশব্দে স্থাপিত হয় প্রথম বিদ্যালয় তথা অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল। জি· ডব্লু· বেলি নামের একজন লবণ-বণিক এবং তাঁর দেওয়ান শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী প্রমুখ কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী মানুষের প্রচেষ্টায় ২০ মার্চ তারিখে যে-বিদ্যালয়ের সূচনা হয়, আজও সেই স্কুল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট শহর কাঁথি। মহকুমা শহরগুলি সাধারণত যেমন হয় তেমনই। কোর্ট, থানা, সাইকেল-রিকশ, বাস আর মানুষজনের চলাচলে মফস্বল শহরটির প্রাণ-স্পন্দন বেশ অনুভব করা যায়। কলকাতা-দিঘা বাসপথে এসপ্ল্যানেড থেকে সবুজ বাসে চাপলে ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় কাঁথি—সাহেবরা যাকে বলত কণ্টাই। এখানেই রয়েছে সেই সুবিখ্যাত কপালকুণ্ডলার মন্দির।

১৮৬০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁথিতে আসেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। তখন পর্যন্ত তিনি নেহাতই এক সাধারণ ডেপুটি মাত্র। কাঁথিতে এসে তিনি বিদ্যোৎসাহী কিছু মানুষের অক্লান্ত শ্রম আর স্বপ্ন চাক্ষুষ করেছিলেন। যেজন্য তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ-কিছু নিষ্কর সরকারি জমি বিদ্যালয়কে দান করা হয়। সে-জমির ওপরই কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুবৃহৎ বিদ্যালয় ভবন, মস্ত খেলার মাঠ।

ভার্নাকুলার এবং অ্যাংলো-ভার্নাকুলার—দুটি বিভাগ নিয়ে চালু হয় স্কুল। ভার্নাকুলার বিভাগের মাইনে ছিল মাসিক ২ আনা এবং অ্যাংলো-ভার্নাকুলার বিভাগের ৮ আনা। ছাত্র ভর্তির ন্যূনতম বয়স ছিল ৬ বছর। বিদ্যালয়টি প্রথম থেকেই ছিল সরকার-অনুমোদিত। প্রথম বছরের ১৭ জুলাই তারিখের কর্মসমিতির সভায় ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুল উমাচরণ হালদারের উপস্থিতি সে-কথাই প্রমাণ করে। বিদ্যালয় পরিচালন-সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের অনুদানের অর্থে নির্বাহ হত শিক্ষক-বেতন এবং অন্যান্য ব্যয়-ভার। করণিকের কাজ করতে হত প্রধানশিক্ষককে, বিদ্যালয়ের দু'জন মালির মধ্যে একজনের কাজ ছিল চাঁদা আদায় করার জন্য ঘোরাঘুরি করা। দু'জন মালির বেতন ছিল ৫টাকা ৮ আনা।

১৮৬৪ সালে প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে বন্দরনগর খেজুরি সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যায়। বিদ্যালয়ের খড়ের চালাতেও আছড়ে পড়ে সেই বিধ্বংসী ঝড়। অস্থায়ী ভাবে লবণ-বণিকের একটি ঘরে উঠে আসে বিদ্যালয়। বিদ্যালয় মেরামত ও আসবাবপত্রের জন্য প্রয়োজন হয়

১৫০ টাকার। স্থানীয় মানুষজন এবং সরকারের কাছে অর্থ-সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। তখন বিদ্যালয়ের মাসিক খরচের হিসেব এরকম : প্রধানশিক্ষক—৫০ টাকা, সেকেন্ড মাস্টার— ২০ টাকা, পণ্ডিত— ২০ টাকা, দুই মালি— ৫ টাকা ৮ আনা, অন্যান্য খরচ—২ টাকা = মোট মাসিক ব্যয় ৯৭ টাকা ৮ আনা। ঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয়-গৃহ মেরামতি ইত্যাদির জন্য সরকার ৭৫ টাকা অনুমোদন করেন।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বিদ্যালয়টির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন।

বর্তমান বিদ্যালয়-গৃহ প্রায় প্রাসাদোপম। মাঝখানে বিস্তৃত খোলা জায়গা ঘিরে দু' দিক দিয়ে সারি-সারি শ্রেণীকক্ষ, অফিস ঘর, টিচার্স রুম, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি। শিক্ষকদের অভিমান, সমস্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধে, যোগ্যতা সত্ত্বেও জেলার প্রাচীনতম বিদ্যালয়টি এখনও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারল না। পরিত্যক্ত ল্যাবরেটরি দেখলে সত্যিই মনখারাপ হয়ে যায়।

১৯৭৬ সালে প্রধানশিক্ষক হয়ে এসেছেন তাপসরঞ্জন মাইতি। ১৯ জন সহ-শিক্ষক এবং ৫২৫ জন ছাত্র নিয়ে তাঁর সযত্ন অভিভাবকত্বে কাঁথি হাই স্কুল আজ মেদিনীপুর জেলার একটি বিশিষ্ট বিদ্যালয়। লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধুলো, শরীরচর্চা, নাটক, গান, আবৃত্তি, সাহিত্যচর্চা, বিতর্ক ইত্যাদি নানা দিকে বিদ্যালয়ের উৎসাহী ছাত্রেরা উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ক্রিকেটে 'থামস্ আপ' ট্রোফিতে এই স্কুল এ-বছর সাবডিভিশনাল চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। যুবকল্যাণ বিভাগের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্যামাশিস পাহাড়ী অধিকার করেছে দ্বিতীয় স্থান। লায়নস এবং রোটারি ক্লাব আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতা থেকে ছাত্ররা জিতে এনেছে পুরস্কার।

লেখাপড়াতে ছাত্ররা বেশ উল্লেখযোগ্য ফল করছে। এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৮২ জন। তার মধ্যে ৩৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছে প্রথম বিভাগে, ৪৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ২ জন তৃতীয় বিভাগে। ৫ জন পেয়েছে স্টার মার্কস। ইংরেজি শিক্ষক রণজিৎ মাইতি এ-বিদ্যালয়ে আছেন ১৯৭০ সাল থেকে। তাঁর মতে, নতুন ইংরেজি পাঠক্রমে ছেলেদের শুধু মুখস্থ-নির্ভর হয়ে থাকার সুযোগ নেই। ভাষা বোঝার এবং লেখার ক্ষমতা বাড়ছে এর ফলে নিঃসন্দেহে। পুরনো পাঠক্রমে খুব অল্প কিছু ছাত্রের মধ্যে এই প্রবণতা ছিল। কিন্তু

প্রধানশিক্ষক

এখন প্রশ্নের ধারা এমনই পালটে গেছে যে, কেবল মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করার কোনও সুযোগই নেই। তবে, এ-ক্ষেত্রে যে ইংরেজি শিক্ষকদেরও যথেষ্ট পরিশ্রমী এবং দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন, সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন। এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাঁর তিনজন ছাত্র লেটার মার্কস পেয়েছে (৮৬, ৮৫, ৮০) সে-জন্য তিনি স্বাভাবিক ভাবেই গর্বিত।

প্রধানশিক্ষক তাপসরঞ্জন মাইতির বিষয় ইংরেজি এবং ইতিহাস। ইংরেজি বিষয়ে তাঁরও মতামত একই। এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকের দায়িত্ব যে অসীম, এ-কথা তিনিও স্বীকার করেন।

বাংলার শিক্ষক লোকনাথ ষড়ঙ্গী ছাত্রদের বাংলা লেখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। বর্তমান বাংলা পাঠক্রমে ছাত্রদের সাহিত্যবোধ কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে বলে তিনি মনে করেন। তবে পরীক্ষায় নম্বর তুলতে বাংলার বর্তমান পাঠক্রম অনেকটাই সহায়ক। ছাত্রদের মধ্যে ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং ভালবাসা তৈরির চেষ্টা করেন তিনি। এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্বর্ণকমল ধাউড়িয়ার বাংলায় ১৪০ পাওয়ায় তিনি খুব আনন্দ পেয়েছেন।

অঙ্কের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বাগ তাঁর ছাত্রদের যে কোনও রকম 'অঙ্ক-আতঙ্ক' নেই, সেজন্য আনন্দিত। বস্তুত, সাধারণভাবে মেধাবী ছাত্ররাই এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। সে কারণে অঙ্ক তাদের কাছে কখনওই আতঙ্ক নয়। তিনি ছাত্রদের হোম টাস্ক করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। কেননা, অঙ্কে সাফল্য পেতে গেলে অবিরাম চর্চার কোনও বিকল্প নেই। এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাঁর ছাত্র আনন্দ মাইতি অঙ্কে পেয়েছে ৯৬ নম্বর। এ

স্কুলের নিজস্ব গ্রন্থাগারে ছাত্ররা পড়াশোনা করছে

ছাড়া আরও ১২ জন পেয়েছে লেটার মার্কস।

ইতিহাস-শিক্ষক বিভূতিভূষণ দাস ইতিহাস-শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানালেন, বর্তমানের ইতিহাস-পাঠক্রম কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং জটিল। সবচেয়ে বড় কথা, ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন খ্যাতিমান লেখকদের যা বইপত্র, তা অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রকম, ক্ষেত্রবিশেষে স্ববিরোধীও। সেখানে সুকুমার ছাত্রদের প্রবল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের মতো ইতিহাসে অনেক নম্বর পাওয়া যায় না, সেটাও ছাত্রদের ইতিহাস বিষয়ে কিছুটা নিস্পৃহ করে তোলে। ইতিহাস কেবল অতীত-কাহিনী নয়, ইতিহাসের আলোয় বর্তমানকে দেখার চোখ তৈরি হয় বলেই তাঁর বিশ্বাস। গত বছর তাঁর ছাত্র জয়েশ মাইতি ইতিহাসে লেটার মার্কস পেয়েছিল, জানালেন তিনি।

বিজ্ঞান-শিক্ষক পরমেশ্বর গিরি কাঁথি হাই স্কুলে এসেছেন ১৯৬১ সালে। এ-স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র তিনি। মাধ্যমিক পাঠক্রমে বিজ্ঞান যথেষ্ট বাস্তবমুখী বলে তিনি মনে করেন। তিনি বললেন, বিজ্ঞানে হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ মাধ্যমিক পাঠক্রমে না-থাকাটা দুর্ভাগ্যজনক।

প্রসঙ্গত সহ-প্রধানশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বাগ জানালেন, আগে এই বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী (পুরনো উচ্চ-মাধ্যমিক) পর্যন্ত পড়ানো হত। সে-কারণে তাঁদের একটি আধুনিক যন্ত্রপাত-বিশিষ্ট পরীক্ষাগার রয়েছে। কিন্তু বর্তমান পাঠক্রমের এই সীমাবদ্ধতার কারণে অত বড় ল্যাবরেটরিটি পড়ে-পড়ে প্রায় নষ্টই হচ্ছে। জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক চুনিলাল মাইতি এবং শ্রীকুমার গিরির মতামতও একই।

ভূগোল-শিক্ষক তিমিরবরণ পণ্ডার কোনও আপত্তি নেই বর্তমান পাঠক্রমে। এ-স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র তিনি। বর্তমান ভূগোল-পাঠক্রম যথেষ্ট আকর্ষক। তবে এ-ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের সচেতনতা, সক্রিয়তাই মূল কথা। কেননা, তাঁর মতে, ভূগোল কেবল একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়—এর মধ্যে নিহিত আছে ভূ-বিদ্যা, অঙ্ক, ইতিহাস, অর্থনীতি—অনেক বিষয়। সুতরাং ছাত্রদের সেভাবেই তৈরি করতে হবে। তবে, সেজন্যে ক্লাসে পড়াবার সময় দরকার কিছু 'অডিও-ভিসুয়াল এড্‌স'—ছাত্ররা যদি পাঠ্য বিষয়টিকে চাক্ষুষ দেখতে পায়, তা হলে তা তাদের মনে গেঁথে যাবেই। শিক্ষামূলক ভ্রমণে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বছরই শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়।

এ-বছর এই স্কুল থেকে তিনজন ছাত্র ভূগোলে লেটার মার্কস পেয়েছে। সর্বোচ্চ পেয়েছে কিশলয় মণ্ডল, ৮৭।

বিদ্যালয়ে প্রতি বছরই বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'কাঁথি হাই স্কুল পত্রিকা' নামে। ছাত্র এবং শিক্ষকেরা নিজেদের রচনায় সমৃদ্ধ করেন পত্রিকাটি। বার্ষিক উৎসবে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকরাও মেতে ওঠেন আনন্দযজ্ঞে। প্রধানশিক্ষক সেতারের ধুলো ঝেড়ে নতুন করে তার বাঁধেন। ১৯৮২ সালে বিদ্যালয়ের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সমাজের নানা দিকে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলসহ অনেক ছাত্রই কেবল বিদ্যালয়ের নয়, দেশেরও গর্ব। প্রধানশিক্ষক-সহ সকলেরই একমাত্র স্বপ্ন, বিদ্যালয় ক্রমে আরও ব্যাপ্তি লাভ করবে, উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানোর সুযোগ পেলে জেলার প্রাচীনতম বিদ্যালয়টি হয়ে উঠবে আরও গুরুত্বপূর্ণ, আরও প্রাণচঞ্চল।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

ফোটো : সরোজকান্তি মাইতি

জয়দীপ রাউত (দশম শ্রেণী)

মিত্রাজিৎ মল্লিক (নবম শ্রেণী)

ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল (অষ্টম শ্রেণী)

প্রথম ছাত্র

কাঁথি হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র জয়দীপ রাউত ৯০০-এর মধ্যে ৭০১ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ওর বাবা-মা ওকে পড়াশোনায় সাহায্য করেন। মা প্রাক্তন শিক্ষিকা। জয়দীপের প্রিয় বিষয় অঙ্ক। অঙ্কে সে পেয়েছিল ৯৭। রাত্রে একদম জাগতে না-পারলেও, এখন থেকেই সে ভোরবেলা ওঠা শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় তার একটু ভয় আছে। গত পরীক্ষায় পেয়েছিল ১২৯। গল্পের বই পড়তে অসম্ভব ভালবাসে সে। ঘনাদা, ফেলুদা, কাকাবাবু-সন্তু, পিণ্ডিদার গল্প তার প্রিয়। আবৃত্তি এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নেয়। 'আনন্দমেলা' তার প্রিয় পত্রিকা। আনন্দমেলায় এখন বিজ্ঞান, খেলাধুলো বিষয়ে অনেক আকর্ষক লেখা থাকে। আনন্দমেলার পোস্টার সংগ্রহ করা তার অন্যতম শখ। ব্যাডমিন্টন এবং দাবায়ও তার আগ্রহ। মোহনবাগানের সমর্থক জয়দীপ বড় হয়ে শারীরবিজ্ঞান নিয়ে উচ্চতর গবেষণার স্বপ্ন দ্যাখে।

৭৩৪ নম্বর পেয়ে অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উঠেছে মিত্রাজিৎ মল্লিক। বিজ্ঞান বিভাগেই তার আগ্রহ বেশি। সে অঙ্কে পেয়েছে ৯৩, শারীরবিজ্ঞানে ৮৫ এবং জীবনবিজ্ঞানে ৭৯। সারাদিনে ৮–৯ ঘণ্টা পড়াশোনা করেও সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বইও সে পড়ে। ক্রিকেট খেলে। জয়দীপের মতো সে-ও মোহনবাগানের অন্ধ ভক্ত। আনন্দমেলা তারও প্রিয় পত্রিকা। বড় হয়ে মিত্রাজিৎ এঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

৭১৩ নম্বর পেয়ে সপ্তম শ্রেণী থেকে প্রথম হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একই নম্বর পেয়ে প্রথম হয়ে সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে দু'জন—প্রদীপ্ত মাঝি এবং চন্দন দেবরায়। দু'জনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৫৬৭।

প্রদীপ্ত মাঝি ও চন্দন দেবরায় (সপ্তম শ্রেণী)

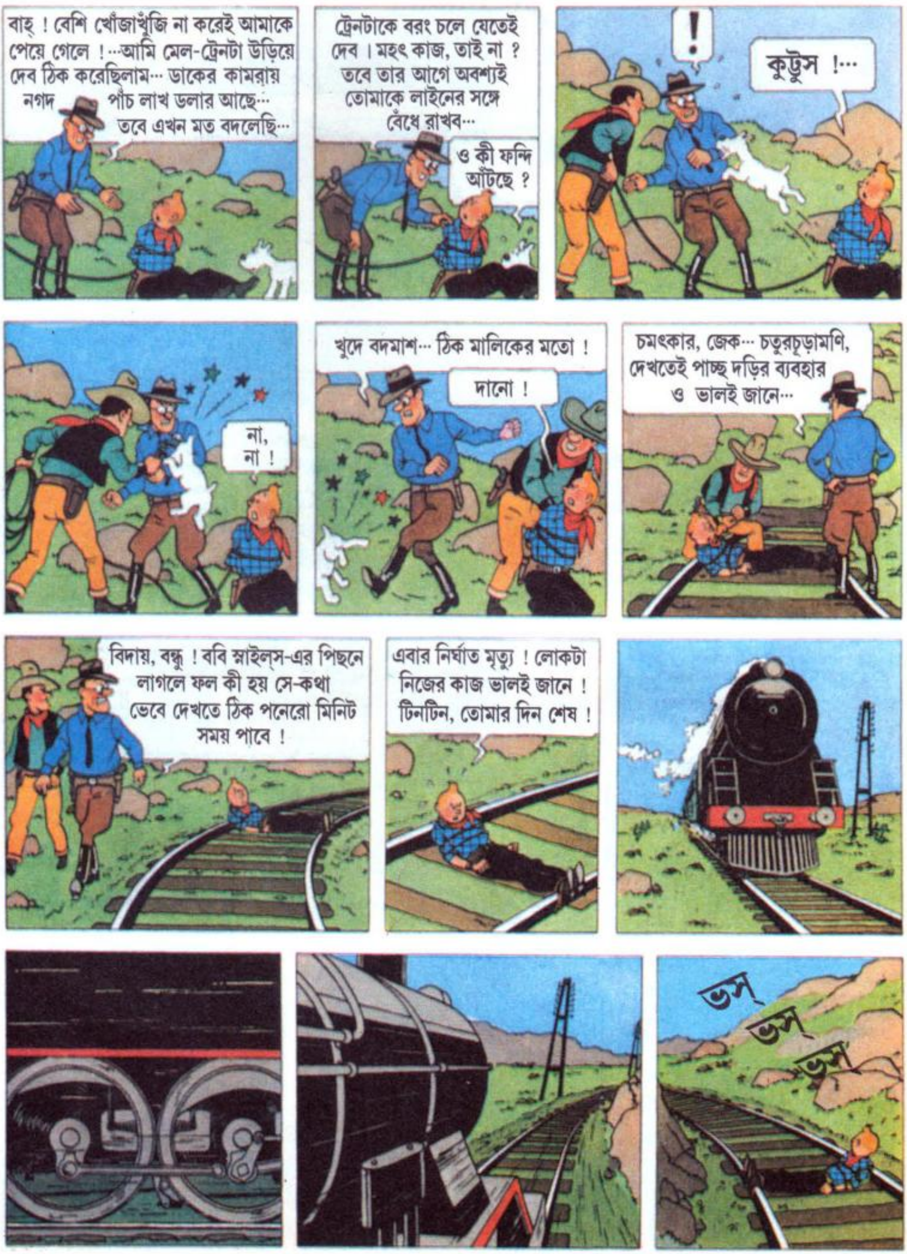

বাহ্ ! বেশি খোঁজাখুঁজি না করেই আমাকে পেয়ে গেলে !…আমি মেল-ট্রেনটা উড়িয়ে দেব ঠিক করেছিলাম… ডাকের কামরায় নগদ পাঁচ লাখ ডলার আছে… তবে এখন মত বদলেছি…
ট্রেনটাকে বরং চলে যেতেই দেব। মহৎ কাজ, তাই না ? তবে তার আগে অবশ্যই তোমাকে লাইনের সঙ্গে বেঁধে রাখব…
ও কী ফন্দি আঁটছে ?
!
কুট্টুস !…
না, না !
খুদে বদমাশ… ঠিক মালিকের মতো !
দানো !
চমৎকার, জেক… চতুরচূড়ামণি, দেখতেই পাচ্ছ দড়ির ব্যবহার ও ভালই জানে…
বিদায়, বন্ধু ! ববি স্মাইল্‌স-এর পিছনে লাগলে ফল কী হয় সে-কথা ভেবে দেখতে ঠিক পনেরো মিনিট সময় পাবে !
এবার নির্ঘাত মৃত্যু ! লোকটা নিজের কাজ ভালই জানে ! টিনটিন, তোমার দিন শেষ !
ভস্ ভস্ ভস্

আমেরিকায় টিনটিন

বিপদ
কী হল ?··· কেউ শিকল টেনেছে···
হ্যাঁ, আমি !··· দেখলাম একটা পুমা একটা হরিণকে আক্রমণ করছে । আমেরিকার জন্তু-প্রেমিক সমিতির সদস্য হিসেবে দাবি করছি এক্ষুনি এর প্রতিকার করতে হবে !
কী ? ! এই জন্য আপনি মেল-ট্রেন থামিয়েছেন ?! পঞ্চাশ ডলার জরিমানা !
ফুররর
আমি নিশ্চয় বাঁশির শব্দ শুনেছি ··· তা হলে আমি মরিনি···
বাঁচাও !
আবার কী হল ? কে যেন চেঁচাল···
কী সর্বনাশ ! তুমি ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও !
তা আর বলতে ! আপনি গাড়ি না থামালে আমি এতক্ষণ পরলোকে পৌঁছে যেতাম !
পরদিন সকালে···
এবার খবরটা পড়া যাক··· নিশ্চয় এতক্ষণ ওর লাশ পাওয়া গেছে···
বিস্ময়কর পরিত্রাণ ! গুণ্ডাদলের খুনিকে ধোঁকা দিল বিখ্যাত বালক-রিপোর্টার আমাদের রেল-প্রতিনিধি প্রেরিত
সর্বনাশ ! আবার প্রথম থেকে শুরু !

ব্যাটম্যান
ব্যাটম্যান ! হুঁশিয়ার ! ওরা আসল কার্তুজ ব্যবহার করছে ! উহুহ !
এক রেল কম্পানির শতবর্ষপূর্তিতে নকল ডাকাতির অভিনয়ে ব্যাটম্যান আর রবিন সত্যি ডাকাতের পাল্লায় পড়ল । ডাকাতরা এক প্রাক্তন অভিনেতা আর তার চেলা !
প্যাকি ! জলদি ! রুপো !
রবিন ! উহ্‌ !
দমাস
হতভম্ব দর্শকরা কিছু বুঝবার আগেই হ্যামলেট আর প্যাকি রুপো নিয়ে হাওয়া !
সর্বনাশ ! ডাকাতিটা সত্যি !
চলো, আমাদের গাড়ি ওদের সহজেই ধরে ফেলবে !
দ্রুত পাহাড়ের বাঁক ঘুরে গাড়ি ডাকাতদের প্রায় ধরে ফেলল !
ওদের ধরে ফেলেছি ! তৈরি হও !
কোথায় পালাবে ? এ কী··· এরা তো নকল ডাকাত !
হ্যাঁ ! আসল ডাকাতরা বাঁকের মুখে এসে মোটরবাইকে চড়েছে ! ওই যে ওরা পালাচ্ছে !
এদিকে···
উহ্‌ ! মাথা গেল ! রবিন জখম, ওকে দেখতে হবে !
থাক, গুলি চামড়ায় লেগেছে ! শুধু একটু ব্যথা হবে ! রবিন, এবার উঠে বোসো !
উহ্‌ ! আমার মাথাটা ধরল ! ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে মনে হচ্ছে !
সেই রাতে, পশ্চিমের এক হোটেলে···
'ঝানু ডাকাতের হাতে ব্যাটম্যান নাকাল !···' আমাদের ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছে !
'ব্যাটম্যানের কৃতিত্বে ১৮৪৪-এর রেল-ডাকাতির পুনরাবৃত্তি···' আমরা হাস্যাস্পদ !"
হা ! হা ! প্যাকি, আমার অভিনয় সফল ! সব কাগজে আমার প্রশস্তি !
হ্যাঁ, গুরু ! দারুণ অভিনয় ! চলো, এবার টাকা নিয়ে কেটে পড়ি !
কেটে পড়ব ? অভিনেতা কখনও কখনও সফল নাটক বন্ধ করে না ! পরবর্তী অভিনয়ের পরদা উঠবে !
হ্যাঁ··· তবে এবার আমাদের মঞ্চ হবে আধুনিক এক মেল-ট্রেন !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বিজ্ঞানীদের এক-একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার পৃথিবীকে করেছে সমৃদ্ধ, মানুষের জীবনকে করেছে সুন্দর। কেউ আবিষ্কার করেছেন রঞ্জনরশ্মি, কেউ জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক, আবার কেউ বা আবিষ্কার করেছেন রিভলভার, কেউ বৈদ্যুতিক বাল্ব। এবারে এরকম কয়েকজন বিজ্ঞানীর ছবি দেওয়া হল। ছবি দেখে বলতে হবে বিজ্ঞানীদের নাম।

গ..

চ..

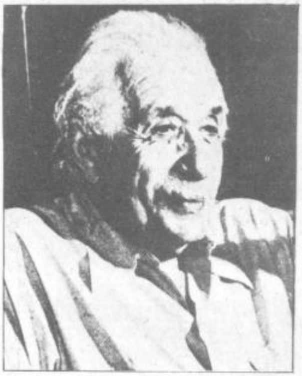

ক..

ঘ..

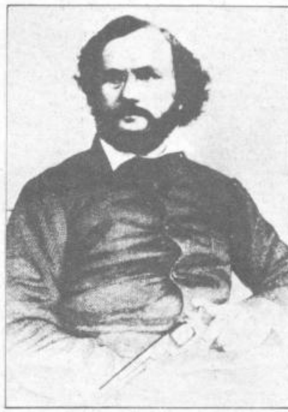

ছ..

খ..

ঙ..

গত সংখ্যায় ছিল কয়েকটি স্তম্ভ ও মিনারের ছবি। (ক) দিল্লির কুতবমিনার। (খ) চিতোরের জয়স্তম্ভ। (গ) লুম্বিনির অশোকস্তম্ভ। (ঘ) কলকাতার শহিদমিনার। (ঙ) হায়দরাবাদের চারমিনার। (চ) বৈশালীর সিংহস্তম্ভ। (ছ) তাঞ্জোরের স্তম্ভ।

রত্নাকর

ছোটদের জন্য নানা স্বাদের কয়েকটি বই

পুণ্যলতা চক্রবর্তীর

খুব ছোট্টদের মনের মতো

ছোট্ট ছোট্ট গল্প

ছবি ॥ সত্যজিৎ রায় দাম ১৫·০০

খুব ছোট্ট যারা, সবে যারা অক্ষর চিনেছে, যাদের গল্পের খিদে অনন্ত—ঠিক তাদের উপযোগী গল্পের বই বেশী নেই। সেই অভাবই মেটাবে এই অসাধারণ গ্রন্থ।

ছোটদের জন্য লেখা কঠিন, ছোট্টদের জন্য কঠিনতর। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা এবং সুকুমার রায়ের সহোদরা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর রক্তের মধ্যেই রয়েছে ছোটদের বশ করবার এক ঐতিহ্যের বীজ। তাই বুঝি তিনি এমন কঠিনতর কাজ এমন নিপুণভাবে নিষ্পন্ন করতে পেরেছেন।

এ-বইয়ের গল্পগুলি ছোট্ট, সহজ, সরস, স্বাদু। তাদের জন্য লেখা, যারা সবে পড়তে শিখেছে, এমনভাবে লেখা যাতে তারা আরও ভালোভাবে পড়তে শেখে। ছোটদের নিজস্ব জগতের অধিবাসীরাই এ-বইয়ের একেকটি গল্পে নানা চরিত্র-রূপে এসেছে। হাঁস, মুরগী, কুকুর, বেড়াল, কাঠবেড়ালী, ব্যাঙ, ইঁদুরছানা, হরিণ, টিয়া—এমন সব্বাইকে নিয়ে দুরন্ত সব গল্প। সেইসঙ্গে রয়েছে চোখ-জুড়োনো ছবি, সত্যজিৎ রায়ের আঁকা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

স্মরণীয় ছড়া-সংকলন

মিষ্টি কথায় বিষ্টিতে নয়

দাম ২০·০০

শব্দের পিঠে বরাবরই এক দৃপ্ত সওয়ার শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এবার তাঁর বিজয়-অভিযান ছোটদের কানের রাজ্যে, তাদের প্রাণের রাজ্যে। চলার দমকে জেগেছে চমক, উড়েছে অর্থ-ধ্বনির ধুলো, সেই ধুলো-ওড়ানো রঙীন পথ বেয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় চলেছেন ছড়ার ভূখণ্ড জয় করতে করতে। তাঁর স্মরণীয় সত্তরটি ছড়া নিয়ে এই সংকলন। কখনও লৌকিক ছড়ার গড়নে নতুন সৃষ্টি, কখনও নতুন গড়নে অলৌকিককে ধরার চেষ্টা। অপ্রত্যাশিত মিলের চারুতা, অপ্রচলিত ছন্দের কারুতা। তেমনই বিস্ময়কর সব বিষয়। সহজ, গভীর, মজাদার চিত্রময়। সংহত, শ্রুতিসুখকর ও স্মৃতিধার্য এইসব ছড়ার সঙ্গে আরেক বিস্ময়কর সংযোজন—অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের পাতা-জোড়া-জোড় লিনোকাট ছবি। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনায়, অভাবনীয়ের সঙ্গে অসামান্যের সম্মিলনে দ্বিগুণ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই বই। প্রচ্ছদ : অরুণ চট্টোপাধ্যায়।

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কৌতূহল-মেটানো গ্রন্থ

ধূমকেতু-রহস্য ও হ্যালি

দাম ১২·০০

ছিয়াত্তর বছর পরে হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব নিয়ে সারা বিশ্ব যখন তুমুলভাবে আলোড়িত, ঠিক সেই সময় এগিয়ে এলেন এমন-এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, সংশ্লিষ্ট বিষয় যাঁর করতলধৃত আমলকী। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে সারা ভারতের অদ্বিতীয় কেন্দ্রর—যে কেন্দ্র সমগ্র বিশ্বের আটটি কেন্দ্রর অন্যতম—অধিকর্তা অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন এই ধূমকেতুকে কেন্দ্র করে যত জিজ্ঞাসা এবং প্রাসঙ্গিক যত কৌতূহল—সব কিছুরই বিজ্ঞানসম্মত জবাব তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। ধূমকেতুকে যে অমঙ্গল ও দুর্ঘটনার অগ্রদূত বলে মনে করেন অনেকে, তার পিছনে কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কিনা, একদিকে তা নিয়ে যেমন, অন্যদিকে, দুর্লভ এই ধূমকেতুকে —সারা জীবনে একবারই যাকে দেখার সুযোগ আসে মানুষের—এবার কীভাবে খালি চোখে সবথেকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করা সম্ভব, কীভাবে ক্যামেরায় ধরে রাখা যাবে এই বিরল অভিজ্ঞতাকে, তা নিয়েও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বিস্তারিত আলোচনা এ-গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। ধূমকেতুর কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি ও রেখাচিত্র এ-বইয়ের আলাদা আকর্ষণ।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

কুইজ

নিল ও' ব্রায়েন

মোটরবিহীন গ্লাইডার

গ্লাইডার হল মোটরবিহীন আকাশযান। বাতাসের চেয়ে ভারী এই ধরনের আকাশযানই সাফল্যের সঙ্গে প্রথমে উড়েছিল। নানা ধরনের গ্লাইডার নিয়ে আকাশে ওড়ার চেষ্টা অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু অটো লিলিয়েন্থালই প্রথম গ্লাইডার পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে উড়তে পেরেছিলেন। জার্মানিতে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৬ সালের মাঝখানের কয়েকটি বছর তিনি গ্লাইডার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। ডানার মাঝখানে শরীর রেখে তিনি বাতাসের বিরুদ্ধে পাহাড়ের ধারে দৌড়ে যেতেন। তারপর বাতাসে লাফ দিয়ে ঢালু পাহাড়ের নীচে আস্তে-আস্তে গিয়ে নামতেন। এভাবে ওড়ার সময় তিনি তাঁর পা ও শরীর দিয়ে ভারসাম্য রাখতেন। অনুরূপভাবে, ইংল্যান্ডে পার্সি পিলচার গ্লাইডার নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে কিছুটা উড়ে গিয়ে মাটিতে নামতে পারতেন। এ সেই ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৯ সালের কথা। ১৮৯৬-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অক্টেভ সানুন ও তাঁর সহকারীরাও এই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। লিলিয়েন্থাল থেকে শুরু করে এঁরা সবাই পাখির ওড়ার কৌশলটাই অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন। কারণ, এঁরা লক্ষ করেছিলেন বড় বড় পাখি ডানা মেলে দিয়ে সহজেই আকাশে উড়তে পারে। প্রথম দীর্ঘক্ষণ আকাশে ওড়ার ইতিহাস রচনা করেছিলেন অরভিল রাইট। তারিখ ২৪ অক্টোবর, ১৯১১। তিনি ও তাঁর ভাই উইলবার এর আট বছর আগে এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছিলেন। আর এটা করার সময়, ১৯০০ থেকে ১৯০৩ সালে, গ্লাইডিংয়ের বিষয়ে তিনি বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি তাঁর এরোপ্লেনের মতো গ্লাইডারকেও নিয়ন্ত্রণে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলিনার উপকূলে মিনিট-দশেক উড়তে পেরেছিলেন। এর পরের ১০ বছর এরোপ্লেন তৈরির দিকেই এত মনোযোগ দেওয়া হল যে, গ্লাইডার নিয়ে পাখির মতো আকাশে ওড়ার কথাই মানুষ প্রায় ভুলে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েকজন জার্মান আবার গ্লাইডার নিয়ে আকাশে ওড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, এরোপ্লেনে আকাশে ওড়ার ব্যাপারে তখন কিছু বিধিনিষেধ ছিল। এই জার্মানরা বেশ সফলও হয়েছিলেন। ১৯২২ সালের ২৪ অগস্ট এফ· এইচ· হেন্টজেন গ্লাইডার নিয়ে তিন ঘণ্টা আকাশে থেকে মধ্য জার্মানির ওয়াশারকুপ পাহাড়ে নিজের ওড়ার জায়গার কাছেই সাফল্যের সঙ্গে অবতরণ করেন।

গ্লাইডারের ওড়ার কিছু কারণ আছে। পাহাড়ের ওপরে যেখানে বাতাস ধাক্কা খেয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়, সেখানে গ্লাইডার ওড়ানো সম্ভব। চারপাশের বাতাসে প্রতিটি গ্লাইডারই নীচের দিকে নামতে থাকে। এই অবস্থায় বাতাস ঊর্ধ্বমুখী হলে গ্লাইডার আর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে না। এখন শুধু পাহাড়ের ঢালু গায়েই গ্লাইডার ওড়ানো হয় না। রোদ ঝলমলে দিনে উত্তপ্ত মাটি থেকে বাতাস ওপরের দিকে উঠতে থাকে। পাখির মতো গ্লাইডারও এর কাছাকাছি থেকে ঘুরপাক খেয়ে ওপরে উঠতে পারে। ১৯৪২ সালে একজন জার্মান এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৭ হাজার ফুট ওপরে গ্লাইডার পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। এরোপ্লেনের মতোই রাডার, এলিভেটর ইত্যাদির কলাকৌশলে ওড়ে গ্লাইডার। এরোপ্লেনের পেছনে গ্লাইডারকে বেঁধে যদি একসময় আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে সে অনেক উঁচুতে উড়তে পারে।

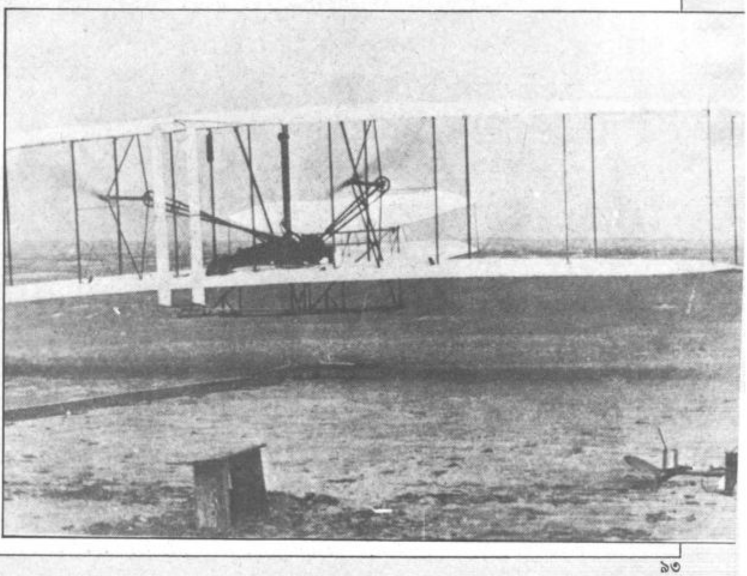

প্রশ্ন

কুইজ

(১) কাম্বোডিয়ার নতুন নাম কী ? **সেখ আবদুর রব**, বর্ধমান।
(২) স্টেফি গ্রাফের পুরো নাম কী ? **অঙ্কুর ঘোষ**, হিন্দু স্কুল।
(৩) বর্তমানে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশের সংখ্যা কত ? **দেবজয় বসু**, নৈহাটি।
(৪) টেস্ট-ক্রিকেটে বেশিবার শূন্য রান করেছেন কে ? **রথীন্দ্রনাথ দে**, কোন্নগর।
(৫) ক্রিকেটার চেতন শর্মা কোন রাজ্যের হয়ে খেলেন ? **অলিককুমার সাঁই**, মেমারি।

(৬) কোন প্রাণী ডিম পাড়ে, কিন্তু বাচ্চাকে স্তন্য পান করায় ? **শান্তনু সরকার**, সুরুল।
(৭) ভারতের কোন টেস্ট-ক্রিকেটার টেস্টে দু'হাজারের বেশি রান করলেও সেঞ্চুরির মুখ দেখেননি ? **আজিজুর রহমান**, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন।
(৮) 'হাজার চুরাশির মা' কার লেখা ? **পান্না সরকার**, দক্ষিণেশ্বর।

(৯) 1984 গ্রন্থটি কবে লেখা ? **চঞ্চল ব্যানার্জি**, বাঁকুড়া।
(১০) বিশ্ব পর্যটন দিবস হিসেবে কোন দিনটিকে ধরা হয় ? **জয়ব্রত কোনার**, মেদিনীপুর।
(১১) পাকিস্তানের স্বাধীনতাদিবস কোন তারিখে ? **দেবর্ষি দাস**, তেজপুর।
(১২) ইউনেস্কোর সদর দফতর কোথায় ? **সুদীপ্ত সেন**, জলপাইগুড়ি।
(১৩) জিমনাস্ট নাদিয়া কোমানেচি কোন দেশের নাগরিক ? **স্নিগ্ধা শেঠ**, চন্দননগর।
(১৪) মানবদেহে ক'টি হাড় আছে ? **সুপ্রিয় কর্মকার**, কলকাতা-২৮।
(১৫) ১৯৯৪ সালের কমনওয়েলথ গেম্‌স কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ? **সেখ আব্দুর রব**, বর্ধমান।
(১৬) টি সি সি বি-র পুরোটা কী ? **সুদীপ চৌধুরী**, মালদহ।
(১৭) স্পেনের রাজধানীর নাম কী ? **সৌগত সেন**, দুর্গাপুর।

(১৮) পিকাডেলি সার্কাস কোথায় অবস্থিত ? **স্বজনসৃজন মুখোপাধ্যায়**, কলকাতা-২।
(১৯) প্রয়াত ফুটবল কোচ বাঘা সোমের পুরো নাম কী ? **সৌমেশ মণ্ডল**, ভোগপুর।
(২০) চেস্টারফিল্ড, নেলসন ও চার্চিল-এর মধ্যে মিল কোথায় ? **আপু সোম**, কলকাতা-৪৫।
(২১) অনিলা দেবী ছিল কার ছদ্মনাম ? **পর্ণা বসু**, শিলিগুড়ি।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) লখনউ।
(২) দেশপ্রাণ আজাদ
(৩) ফ্র্যাঙ্ক মর্টিমোর ম্যাগলিন ওরেল।
(৪) নারায়ণ সান্যাল।
(৫) আব্রাহাম লিঙ্কন।
(৬) অশোককুমার।
(৭) ১৯৩৮-'৩৯ সালে ডারবানে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ।
(৮) কপিলদেব।
(৯) সত্যেন্দ্রনাথ বসু। গ্রুপটির নাম বোসন।
(১০) চাল।

আব্রাহাম লিঙ্কন

অশোককুমার

(১১) পথের পাঁচালী।
(১২) প্যারিসের ল্যুভর জাদুঘরে।
(১৩) আমেরিকায়।
(১৪) National Film Development Corporation.

কপিলদেব

প্যারিসের ল্যুভর জাদুঘর

(১৫) গুজরাতের গির অরণ্যে।
(১৬) কাঞ্চনজঙ্ঘা।
(১৭) সফরনামা।
(১৮) ভোস্টক-১।
(১৯) হনসু।
(২০) বিশ্বামিত্র।

কুইজ

বিষয় : বড়দিন

(১) সেন্ট নিকোলাসের আদলে কোন চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে ?
(২) পশ্চিমের দেশগুলির শিশুরা বড়দিনের আগে কী টাঙিয়ে রাখে ? কেন ?
(৩) বিশ্বের শিশুদের জন্য সান্তা ক্লজ-এর খেলনা তৈরির কারখানাটি কোথায় ?
(৪) এরা কারা : দাশের, প্রান্সের, ড্যান্সার, ভিক্সেন, কমেট, কিউপিড, ডোনার ও ব্লিত্‌জেন ?
(৫) ১৮৪৩ সালে জে·সি·হর্সলে এমন একটি জিনিসের নকশা করেছিলেন যা বড়দিনের সময় এখনও জনপ্রিয় ? জিনিসটি কী ?
(৬) কোন দেশে 'ক্রিসমাস ট্রি'-র উদ্ভব ?
(৭) ইংল্যান্ডে কে এই ক্রিসমাস ট্রি প্রথম প্রবর্তন করেন ?
(৮) বেথেলহেমে যিশুর জন্মের যে মডেল দেখা যায়, তাতে Christmas Crib থাকে। কে এটি প্রবর্তন করেন ?
(৯) কাদের বলা হত 'মেজাই' ?
(১০) শিশু-যিশুর কাছে মেজাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কে ?
(১১) ক্রিসমাসকে সংক্ষেপে 'X Mas' বলা হয় কেন ?
(১২) ক্রিসমাসকে বড়দিন বলার কারণ কী ?
(১৩) কলকাতার আর্মানিরা ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালন করেন না। কোন তারিখে তাঁরা বড়দিন পালন করেন ?
(১৪) খ্যাতনাম্নী এক গোয়েন্দা-গল্প লেখিকা প্রতি বছর বড়দিনে একটি করে উপন্যাস প্রকাশ করতেন। কে তিনি ?
(১৫) 'Witch balls' কী ?
(১৬) প্রতি বছর নরওয়ের লোকেরা বেশ বড় একটা ক্রিসমাস ট্রি ইংল্যান্ডের লোকদের উপহার পাঠান। লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে সেটা সাজানো থাকে। কেন ওই উপহার পাঠানো হয় ?
(১৭) বড়দিনের পর দিনটি Boxing Day হিসেবে পরিচিত। কেন ?
(১৮) Boxing Day-তে কলকাতার লোকেরা পিকনিকের জন্য সচরাচর কোথায় যান ?
(১৯) ২৮ ডিসেম্বর হল 'Holy Innocent'-দের দিন। এই দিনটির তাৎপর্য কী ?
(২০) বড়দিনের সাজসজ্জা কোন তারিখে খুলে ফেলা হয় ?

বড়দিনের কেনাকাটা

যিশুর জন্ম

সান্তা ক্লজ

উত্তর : (১) সান্তা ক্লজ। (২) শিশুরা মোজা টাঙিয়ে রাখে। তাদের ধারণা, সান্তা ক্লজ ওই মোজায় তাদের জন্য উপহার রেখে যাবেন। (৩) উত্তর মেরুতে। (৪) বলগা হরিণ, সান্তা ক্লজের স্লেজগাড়ি যারা টেনে নিয়ে যায়। (৫) ক্রিসমাস কার্ড। (৬) জার্মানি। (৭) রানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট, যিনি ছিলেন জার্মান। (৮) আসিসি-র সেন্ট ফ্রান্সিস। (৯) প্রাচ্যের তিন জ্ঞানী ব্যক্তি, যাঁরা শিশু যিশুর জন্য উপহার এনেছিলেন। (১০) একটি তারা। (১১) গ্রিক Khristos-এর Chi কথাটার আদ্যক্ষর। Khristos = Christ। (১২) বড় উৎসব বলেই যে বড়দিন বলা হয় তা নয়। ২১ ডিসেম্বর থেকেই দিন বড় হতে শুরু করে। (১৩) ৬ জানুয়ারি। (১৪) আগাথা ক্রিস্টি। (১৫) ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর জন্য রঙিন কাচের বল। (১৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন সাহায্য করেছিল বলে নরওয়ের মানুষ তাঁদের কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে এই উপহার পাঠান। (১৭) প্রাচীন কালে গির্জায় গরিবদের জন্য রাখা দানপাত্রটি এই দিন খোলা হত। পরে এই দিনটিতে ভৃত্যদের বড়দিনের বখশিশ দেওয়ার প্রথা চালু হয়। (১৮) চিড়িয়াখানায়। (১৯) শিশু যিশুর খোঁজে রাজা হেরোড বহু শিশুকে হত্যা করেছিলেন। তাঁকে জানানো হয়েছিল, বেথেলহেমে একজন বড় রাজার জন্ম হয়েছে। (২০) ৬ জানুয়ারি।

ধাঁধা

ছোটকার বিস্তর বিচিত্র শখের একটা হল, দেখতে সুন্দর যেসব নিমন্ত্রণের চিঠি, সেগুলো জমানো । একটু অভিনব ডিজাইনের কার্ড হলেই সে-কার্ড চলে যায় ছোট্কার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় । অবশ্য এর জন্য অপেক্ষা করতে হয় । সচরাচর বিয়ের চিঠির চেহারা হয় নিতান্ত মামুলি । দোকানে ডিজাইন-করা যেসব কার্ড বিক্রি হয়, তার উপরেই সহজ হরফে ছাপানো অসাধারণত্ব আনতে গেলে চাই শিল্পী-মন । খরচখরচার প্রশ্নও অবশ্য থাকে । ক'জন আর দু' দিক সামলাতে পারেন ।
এবারে নাকি নভেম্বরেই যাবতীয় বিয়ের দিন । ডিসেম্বরে তারিখ ছিল না । আর তাই নভেম্বরের গোড়া থেকেই আমাদের বাড়িতে সমানে আসতে লেগেছিল নেমন্তন্নের চিঠি । গত রবিবার সেইসব চিঠি থেকেই পছন্দসই কার্ড আলাদা করে বেছে রেখেছিল ছোট্কা । আমিও বসে ছিলাম পাশে ।
বেশির ভাগ কার্ডই বাতিল হল ।

দুটো কার্ড আলাদা করে আমার হাতে তুলে দিল ছোট্কা । তার একটি তুলোট কাগজে ছাপা, পুরনো আমলের হলুদ রঙের প্রজাপতি আর উড়ন্ত পরির ছবি, হাতে-লেখা থেকে ব্লক করা চিঠি । আর একটি হঠাৎ দেখলে মনে হয়, নক্‌শিকাঁথা । তেমনই ফোঁড়-তালা ডিজাইন, মধ্যে ছাপার হরফই ব্লক-করা । এই কার্ডটিতে বিয়ের কনের নামটিও চোখ টেনে নেয় । ইভলিন । যোধপুর পার্কের উদয়ের সঙ্গে ইভলিনের শুভ পরিণয় । ইভলিন নামটা শুনিনি, ছোট্কাকে মানে কী জিজ্ঞেস করতে যাব, এমন সময় ছোট্কা প্রায় অন্তর্যামীর মতোই বলে উঠল, "আগে ধাঁধা, পরে মানে । লিখে নাও সাবধানে ।" কী আর করা, ধাঁধাটাই লিখে নিলাম ।

প্রথম ধাঁধা ॥ অশোক, অলোক, গৌতম—এই তিন বন্ধুর একসঙ্গে নেমন্তন্ন একটা বিয়েতে । অশোক আর অলোক গিয়ে তিনজনের হয়ে একসঙ্গে উপহার কিনে এনেছে দোকান থেকে । দোকানে অশোক দিয়েছে নিজের পকেট থেকে ষাট টাকা, অলোক পঁয়তাল্লিশ টাকা । পরের দিন গৌতম যখন জানতে চাইল তাকে কত টাকা চাঁদা দিতে হবে, অশোক বলল, "পঁয়ত্রিশ টাকা দাও ।" গৌতম দিয়ে দিল । এখন বলো তো, গৌতমের এই পঁয়ত্রিশ টাকা কীভাবে ভাগ হবে অশোক ও অলোকের মধ্যে ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ সাগর আছে ঢেউ নেই, নদী আছে জল নেই, পাহাড় আছে গাছ-পাথর নেই, কোথায় দেখেছ এমন ব্যাপার ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ এমন একটা ছয় অক্ষরের ইংরেজি শব্দ বলতে পারো, যার মধ্যে একটিও ভাওয়েল নেই ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৮৪ বছর । (২) বাংলা অভিধানে । (৩) বিচারপতি ।

সত্যসন্ধ

কত কথা

আকাশপ্রদীপ শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট ক'টি শব্দ পাওয়া যেতে পারে ?
২ । এবারে তিনটে ছেলে-ঠকানো গোছের প্রশ্ন দেওয়া যাক । চটপট উত্তর দিতে হবে কিন্তু !

(ক) হাতে-হাতে কোন্ হাতি ?
(খ) সুযোগসন্ধানীরা কোন্ তাল খোঁজে ?
(গ) কোন্ তাস খেলতে হয় না, সে নিজেই খেলে ?
৩ । এমন একটা মাছের নাম বলতে পারো, উলটো দিক থেকে দেখলে (বা বললে) যে পর্বতাভিযানে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেয় ?

উত্তর : ১ । আকাশ, কাশ, প্রদীপ, দীপ—মোট চারটি শব্দ । ২ । (ক) হাতাহাতি । (খ) ফাঁকতাল । (গ) বাতাস । ৩ । পারশে । উলটে নিলে শেরপা ।

কথক

মজার খেলা

এ খেলার জন্য চাই আটটা পোড়া দেশলাইকাঠি, কিংবা একই সংখ্যক টুথপিক । কাঠিগুলো দিয়ে নীচের ছবির মতন একটা মাছ তৈরি করতে হবে টেবিলের উপর :

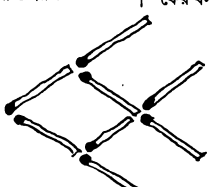

খাওয়া না যাক, দেখে অন্তত মাছ বলে মনে হচ্ছে, তাই না ? সে যাক । এখন বলি, কী করতে হবে ।
ছবিতে দ্যাখো, মাছের মুখটা বাঁ দিকে ফেরানো । এটাকে ডান-দিকমুখী করতে হবে । তিনটে কাঠি ইচ্ছেমতো তুলে ফের বসাতে পারবে । আর কাঠি সরিয়েই মাছটার মুখ বাঁ দিক থেকে যাবে ডান দিকে ।
বন্ধুদের নিশ্চয়ই সমস্যাটা দেবে, কিন্তু তার আগে তো নিজেকে সমাধান করতে হবে । সেটা কি পেরেছ ?
না পেরে থাকলে নীচে দেখে নাও, কীভাবে কী করতে হবে ।

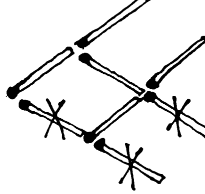

'X' চিহ্ন-দেওয়া কাঠিগুলো সরবে । তারপর কীভাবে বসবে, দেখে নাও—

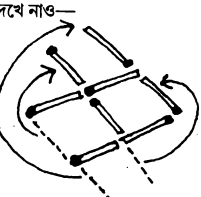

এবার দ্যাখো, মাছটা কেমন ডান দিকে ফেরানো !
দারুণ মজার, দারুণ বুদ্ধির খেলা । তাই না ?

মজারু

ধাঁধানো ছবি

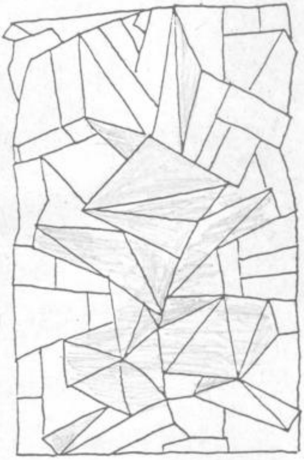

এবারে রং করার পালা এই মজার ছবিতে। এখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কী আছে ছবিটির মধ্যে। না, আগেভাগে বলব না। ছবির মধ্যে যে ত্রিভুজগুলো আছে, সেগুলো রং দিয়ে ভরিয়ে ফ্যালো। তারপর দ্যাখোই না কী ছবি খুঁজে পাও!

চিত্রক

ট্যানগ্রাম

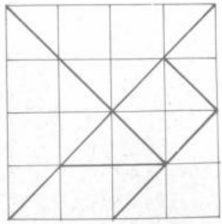

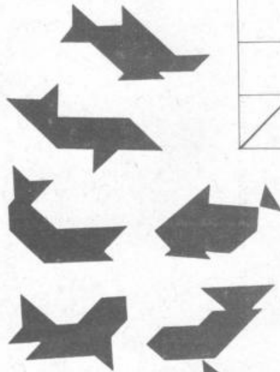

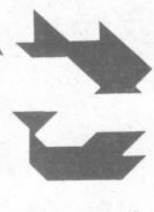

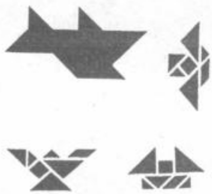

এবার ট্যানগ্রামে যে ছবিগুলি দেখানো হল, তোমরা এই ধরনের কিছু-কিছু ছবি আগেও তৈরি করেছ। এখন ট্যানগ্রামের সাতটা টুকরো দিয়ে এই ছবিগুলি তৈরি করতে পারো কি না চেষ্টা করে দ্যাখো। আগামী সংখ্যায় এর সমাধান থাকবে।

প্রবীর

হাসিখুশি

“ভজু, টাকার টানাটানি যাচ্ছে। এ-মাসে তোর মাইনে হয়তো দিতে পারব না।

“আজ্ঞে, গতমাসেও তো একই কথা বলেছিলেন, কর্তাবাবু।”
“হ্যাঁ, বলেছিলাম। আমি এককথার মানুষ। কথার খেলাপ করি না।”

রুমকি : আচ্ছা মামণি, পরিরা স্বর্গে কী কাজ করে?
মা : সারাদিন তারা বীণা বাজিয়ে নাচগান করে।
রুমকি : সে কী মামণি, স্বর্গে রেডিও বা টিভি নেই?

রানা : আমার সাঙ্ঘাতিক দাঁত ব্যথা করছে।
বাবু : আমার যদি ওরকম হত, তা হলে আমি এক টানে আমার ব্যথাওয়ালা দাঁতটা তুলে ফেলে দিতাম।
রানা : তোমার ওরকম হলে আমিও তাই করতাম।

আঁকিবুকি

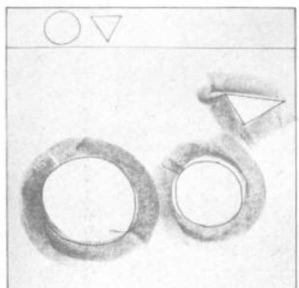

ভেবে দ্যাখো

বৃত্ত এবং ত্রিভুজ দিয়ে এবার আমরা আঁকব জীবজন্তুর ছবি। দুটি বৃত্ত এবং একটি ত্রিভুজ দিয়ে আমি কল্পনায় ধরতে চেষ্টা করেছি একটি প্রাণীকে। তোমরা ভেবে দ্যাখো তো আমার কল্পনাকে ধরতে পারো কি না!

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

একসঙ্গে অনেক নাটক

ছোটদের নাটক নাচ গান ছড়া
ধীরেন্দ্রলাল ধর
কিশোর ভারতী, কলকাতা-৭৩
৪০ টাকা

যে ক'জন শিশুসাহিত্যিকের লেখা আমাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিত, ধীরেন্দ্রলাল ধর তাঁদের মধ্যে একজন। বিশেষ করে তাঁর অ্যাডভেঞ্চার এবং রূপকথার গল্প পেলে প্রায় নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে যেতাম। তাঁর লেখা 'কামানের মুখে নানকিং'-এর রোমাঞ্চকর স্মৃতি তো আজও অম্লান।

এ ছাড়া তাঁর আর এক ধরনের লেখা আমাদের তীব্র আকর্ষণ করত, সেটা তাঁর দেশাত্মবোধক এবং ঐতিহাসিক রচনা। ইতিহাসের বীর, এবং দেশ ও সমাজ গঠনে যেসব মনীষী আত্মত্যাগ করে গিয়েছেন তাঁদের জীবনী বা স্বাদেশিকতার ঘটনার ভিত্তিতে লেখা রচনা আমাদের দেশাত্মবোধে রীতিমত উদ্বুদ্ধ করত।

পাঁচ থেকে পনেরো বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা ২৯টি নাটকের সঙ্কলন 'ছোটদের নাটক নাচ গান ছড়া'। বস্তুতপক্ষে, এ যেন একসঙ্গে অনেক পাওয়া। ৫৪৪ পৃষ্ঠার এই সঙ্কলনে একসঙ্গে রূপকথা, রূপক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, কৌতুকনাট্য, জীবননাট্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে নাটক—ভাবাই যায় না। একমাত্র দুঃখ দু'-চারটি সেই রক্তহিম করা যুদ্ধ বা অ্যাডভেঞ্চারের নমুনা এই সঙ্কলনে নেই। থাকলে আহ্লাদে আটখানা হতেন পাঠক। তবু এই সঙ্কলনে যা আছে, তাও পাঠককুলের মন ভরাবার পক্ষে যথেষ্টই।

কাব্যে লেখা রূপকথার নাটকের ছ'টির মধ্যে কোন্‌টা যে আমাকে রূপকথার কল্পলোকে নিয়ে গিয়েছে মুহূর্তে তা যেমন টেরই পাইনি, তেমনি ছড়ায় কাব্যে লেখা রূপক কাহিনী 'বন্ধন মুক্তি' ও 'শিশিরমালা' আমায় ফিরিয়ে দিয়েছে আমার সুন্দর কৈশোর। রাজা-রানি, ডাইনি-রাক্ষসি, রাজপুত্র-রাজকন্যা, পরি, নিদমহলের রাজকন্যার ঠাকুরমা, নীল পরি-লাল পরি, চাঁদের বুড়ি, দৈত্য-দানো, কোটাল, রাক্ষস-খোক্কস, রাখাল ছেলে, এরা তো আমাদের শৈশবের স্বপ্ন দেখার সঙ্গী।

'অঙ্কুর', 'জলের ধারা', 'বুকে যার আগুন' প্রকৃতিবিজ্ঞানভিত্তিক লেখায় মাটি জল হাওয়া রোদে বীজ থেকে গাছের বিকাশ, সূর্যের তাপে সাগরের জল থেকে বাষ্প এবং বৃষ্টি, আগ্নেয়গিরির জন্মকথা জানার রোমাঞ্চ, তাও আবার নাটকীয় ছন্দে। তেমনি কাব্যে, নাট্যে, ছন্দে কৌতুক নাটক, রামমোহন, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দশজন মনীষীর জীবনের টুকরো-টুকরো ঘটনা নিয়ে নাটক, যা মানসিক ও চারিত্রিক পরিমণ্ডল গঠনের সহায়ক; এবং সেই সঙ্গে 'অসি বাজে ঝনঝন', 'সিদ্ধার্থ' ও 'জয়দেব'-এর মতো তিনটি ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। গানে, সংলাপে ও রোমাঞ্চে এই তিনটি নাটকই মঞ্চস্থ করে জ্ঞান এবং আনন্দ পাওয়া যাবে। বিশেষ করে প্রথম নাটকটি তো রীতিমত রোমাঞ্চকর। সংগ্রহযোগ্য একটি সঙ্কলন কিশোর কিশোরীরা হাতে পেলে রোমাঞ্চিতই হবে। প্রচ্ছদটিও সুন্দর। সামান্য কিছু ছাপার ভুল থাকলেও বইটি ছোটদের ভাল লাগবে।

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে সাহিত্যে

স্পেনের প্রথিতযশা সাহিত্যিক ক্যামিনো হোসে সেলা এ-বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও চিত্রনাট্যকার। ভ্রমণ কাহিনীও লেখেন। অথচ ৭৩ বছরের যুবক সেলার মোট বইয়ের সংখ্যা সত্তর ছুঁয়েছে। পর-পর ছ' বছর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর অবশেষে এবার নোবেল জয় করলেন তিনি। তাঁর আগে স্পেনে আরও চারজন নোবেল-লরিয়েট হয়েছেন। ১৯১৬ সালের ১১ মে স্পেনের প্যাড্রেন শহরে সেলার জন্ম। পিতা ক্যামিলো কাজ করতেন শুল্ক বিভাগে। লেখালেখিতে মনোযোগ ছিল তাঁর। ১৯৩৩ সালে মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্র বিভাগে ভর্তি হন সেলা। ইতিমধ্যে স্পেনে বেজে উঠল গৃহযুদ্ধের দামামা। পড়াশোনা শিকেয় তুলে গৃহযুদ্ধে তাঁকে যোগ দিতে হল। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে পড়লেন দর্শন ও আইন। যুদ্ধ তাঁকে করে দিল এলোমেলো। নানা পেশায় জড়িয়ে পড়তে থাকলেন তিনি একের পর এক। বস্তুত, যুদ্ধ এবং জীবিকার অভিজ্ঞতার চাপে

তাঁকে শেষ পর্যন্ত আসতেই হল সাহিত্যের বিস্তৃত আঙিনায়। একইসঙ্গে গভীর এবং ঝরঝরে তাঁর রচনাশৈলী স্পেনীয় সাহিত্যে প্রথম থেকেই সংবর্ধিত হল দারুণভাবে। চরিত্র সৃষ্টি, গল্পের টান তথা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রাণবায়ু। প্রবন্ধে তাঁর যৌক্তিক-পরম্পরা পাঠককে নতুনতর চিন্তার দিকে টেনে নিয়ে যায়। কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী বা চিত্রনাট্যেও সেলার একাধিপত্য কেবল স্পেনেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেরও এক অসামান্য সংযোজন। নোবেল পুরস্কারের আগে তিনি দেশী কিংবা আন্তর্জাতিক তেমন কোনও নামী পুরস্কার না-পেলেও তাঁর নোবেল-বিজয় মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে করে তুলেছে পৃথিবীর সাহিত্য-রসিকদের মধ্যমণি।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

অন্যরকম গল্প

মনের পাখি বনের পাখি
রতন চট্টোপাধ্যায়
শিলালিপি
কলকাতা-৭০০০০৯
১০ টাকা

রতন চট্টোপাধযায়ের 'মনের পাখি বনের পাখি' ছোট গল্পের সঙ্কলন। কয়েকটি গল্প অবশ্যই সুনির্বাচিত। তার মধ্যে 'বাঁধন' গল্পটি যে কোনও পাঠকের ভাল লাগবে। অতি আদরের লুসির হারিয়ে যাওয়া, মৌটুসির চোখ অপারেশনের পর দৃষ্টি ফিরে পাওয়া, এবং সঙ্গে-সঙ্গে লুসির নাটকীয়ভাবে ফিরে আসা ও আব্বাসের প্রত্যাশিত চরিত্র নিয়ে লেখক এখানে যে মায়াজাল বিস্তার করেছেন, তাতে 'বাঁধন' প্রকৃত অর্থেই পরিচ্ছন্ন ও শিল্পগুণসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে। 'মনের পাখি বনের পাখি' ও 'মরণখেলা' গল্প দুটিও লেখক নিছক গল্পকে ভেঙে ফেলে অন্য যে গল্প শোনাতে চেয়েছেন, সেদিক থেকে তিনি সার্থক।

সমীর ঘোষ

মুখে ফুটে ওঠে চরিত্র,
দেখলেই বোঝা যায়

এদের পেছনে রয়েছে এইচ্ এম টির অভিজাত
টেক্‌নলজি এবং বিক্রীর পর সেরা। সবচেয়ে সেরা,
অন্যদের থেকে আলাদা, চরিত্র বলে।

hmt
QUARTZ

everest/S89/485 BEN

সাবান মেখে স্নানের পর আপনাকে কি
বয়সের চেয়ে বেশি দেখায় ?
স্নানের পর আপনার ত্বক
কোমল তরুণ লাবণ্যে ঝল্‌মল্‌ করে তুলুন।
অনেক সাবান দেখতে ভালো, কিন্তু আপনার ত্বকের পক্ষে খুব খারাপ। পরিষ্কার করতে গিয়ে ত্বক ক'রে তোলে রুক্ষ (প্রতিবার স্নানের পর মনে হয় ত্বক খসখসে লাগছে, ত্বকে টান ধরেছে)। ত্বক বেশিদিন রুক্ষ খসখসে থাকলে শেষে কুঁচকে যায়, ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে।
আসল কোল্ড ক্রীম-এর গুণে ভরা পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম-এর স্নিগ্ধ পরিচর্য্যায় আপনার ত্বক হবে কোমল, তরুণ লাবণ্যে ঝল্‌মল্‌।
এখন থেকে পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম সাবান মেখে স্নান করুন...দেখুন আপনার ত্বক হয়েছে পরিচ্ছন্ন, সতেজ, চিরনবীন।
"সাবানে-সাবানে এত তফাৎ আমি ভাবতেই পারি নি"
—প্রখ্যাত মডেল অনু আহুজা
পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম সাবান
আসল কোল্ড ক্রীম-এর গুণে ভরা
POND'S
COLD CREAM SOAP
POND'S
O&M 1963